শিকার পর্ব

মহাশ্বেতা দেবী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৭০

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : কৃষ্ণেন্দু চাকী
মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পেজমেকার্স, ২৩বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০২৬ হইতে লেজার কম্পোজ করিয়া অটোটাইপ, ১৫২, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

লোধা আদিবাসীদের
যাদের জীবনে আজও অন্ধকার কাটল না

সূচীপত্র

শিকার পর্ব

এটি কল্পিত কাহিনী। তা সত্ত্বেও যদি কেউ এর মধ্যে তাঁর সঙ্গে মিল খুঁজে পান লেখক দুঃখিত।

॥ ১ ॥

শিকার জেনেছিল, আর তার চলে যাবার, বেরিয়ে যাবার কোনও পথ নেই। যখন বুঝল, তখন শিকারিরা তার দিকে আগ্রহী চোখে তাকিয়ে আছে। শিকার কখনও বাঘ দেখেনি, কিন্তু জঙ্গলে নেকড়ে দেখেছে। নেকড়ের মতই তীব্র ক্ষুধা আর হত্যার উত্তেজনা ছিল শিকারিদের চোখে।

সব তো সমঝ লি, মধু?

মধু নয়, মধু নয়, মধুমন্তী। একজনই তাকে 'মধু' বলার অধিকার পেয়েছে। বোল না, তোমরা বোল না, সব কিছু নোংরা করে দিও না এমন নিঃশেষে।

কী, চুপ করে কেন?

বুঝেছি।

শ্রীমতী শুক্লার মাংসল মুখে চশমার পিছনে চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল। শ্রীমতী শুক্লা, আপনি কেন এমন চড়া মেক-আপ করেন? বিউটি পার্লারে মুখ ফেশিয়াল করেন, হেয়ার সেট করান, 'উর্বশী' গিয়ে? আপনি কি বেশ্যা? বেশ্যারা তো স্বাধীন নয়, ওরা তো বাধ্য থাকে সাজতে, কেননা ওদের খদ্দের আকর্ষণ করতে হয়।

আপনি তো ডকটর শুক্লার স্ত্রী। আপনার তো মেয়ের বয়সই কুড়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি নৃতত্ত্ববিজ্ঞানে প্রধানা। রিসার্চ গাইড করেন। পাটনা দৌড়ন সপ্তাহে সপ্তাহে। ছাত্রদের সঙ্গে, অধ্যাপকদের সঙ্গে ফ্লার্ট করেন কেন?

মধু!

মধুমন্তী বলুন।

মধুমন্তী! রিয়ালি! ফর এ শবর, হোআট এ শেম! সুন্দর! যাক গে। বুঝতে পারছ, কেসটা তোমাকে করতেই হবে।

বুঝেছি।

তুমি সামনে থাকলে অর্জুন মিশ্রকে হারিয়ে দিতে আমার কিছু কষ্ট হবে না।

আপনি ডকটর ভাটের লোক, তাই না?

চুপচাপ। কে বলল তোমাকে?

এ তো সবাই জানে। আর মিশ্র হল ডকটর প্রসাদের লোক। এটা ভাটজির জিলা। এখানে কন্ট্রোল উনি রাখবেন। সে জন্যেই অর্জুন মিশ্রকে সরাতে হবে। আমি হলাম....।

কাঁটা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব।

এর চেয়ে লাগসই কথা বলনি তুমি কখনও। কাঁটাই মনে করেছ, বুঝতে দাওনি। তোমাদের শিকারের নিয়ম এত আলাদা! আমি বুঝি নি।

চুপ করে থাকছ কেন?

আমি, মধুমন্তী উঠে দাঁড়ালাম। ঝাপটা মেরে লম্বা বেণীটা ঘাড় ঘুরিয়ে পিঠে ফেললাম। হ্যাঁ, আমার চুল খুব কালো, খুব লম্বা, খুব ঘন। আমার গায়ের রং কালো, আমার চুল কালো, আমার চোখ কালো, গালের হাড় উঁচু, ঠোঁট মোটা, দাঁত ঝকঝকে, আমার কোমর সরু, বুক ভারি, কাঁধ চওড়া। তোমরা শিকারিরা চিরদিন আমাকে দেখেছ আর জ্বলে গেছ।

আমি যাচ্ছি।

তুমি কেস করলে, আ! একটা শবর মেয়ে, রিয়ালি শবর! একটা ইনসিগনিফিক্যান্ট ট্রাইবের মেয়ে....একজন ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে....

গিরজা বাজপেয়ীজি শুকনো গলায় বললেন, ঠিক-সে বলুন মিসেস শুক্লা। অর্জুন তো ওকে আগেই অপমান করেছে। ঔর গরমেন তা নিয়ে কমিশনও বসিয়েছে। আপনি চান ও এখন, 'কমিশন কেস রিপোর্ট দিচ্ছে না' বলে আদালতে কেস করুক।

যান। বাজপেয়ীজি! আপনি বহোত তামাশা করেন। একটা শবর মেয়েকে কোর্টে উঠালে....

তামাশা বাড়বে? না আপনি অর্জুনকে ডুবাতে সুবিধা পাবেন?

হোয়াট ডু ইউ মীন? মধুমন্তী রাজিই হচ্ছিল না। কত করে রাজি করালাম....আপনি কী?

আমি চারমাস বাদে রিটায়ার করছি, আমি ভাট আর প্রসাদের লোক নই, আমার কোনও ধান্দা নেই।

মধু!

আপনি....আমাকে....মধুমন্তী বলবেন....

ও....মধুমন্তী, তাহলে....

শবর মেয়ে বুঝেছে।

বুঝবেই তো। তোমরা তো লাকি....

হ্যাঁ। সীমান্ত জেলা পশ্চিমবঙ্গে লোধা শবর আর খেড়িয়া শবর এখন 'বিমুক্ত' জাতি। এক সময়ে তারা 'অপরাধ-প্রবণ' জাতি ছিল। আর এ জেলাতে এক সময়ে যখন জঙ্গল কাটা পড়ল, আমরা জমিহীন হয়ে গেলাম, তখন থেকে বনের কাঠ নিলে আমরা 'চোর', বিনা দোষে মার খেতে নারাজ হয়ে বুখে দাঁড়ালে আমরা ডাকাত, নইলে অর্জুন বলতে পারত, চোর-ডাকু-দাঙ্গাবাজ-লুঠেরার জাত?

মেয়েছেলেটা আবার কী বলছে!

খুব লাকি তোমরা। পশ্চিমবাংলা তো....

আমি যাচ্ছি।

এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে মেয়েটা। অন্য শিকারিরাও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। গায়ে হাত দিও না আমার, আমার জন্যে কিছু রাখো।

আমি পিছিয়ে গেলাম। চারটে আংটি পরা মোটা থলথলে হাতটা বাতাসে।

এখন গলা হিসহিসে।

ভকিল খুব দুঁদে। টাকা আমরা তুলে দিচ্ছি প্রথমটা। তুমি চাকরি করো, পরে....

আমার চোখের সামনে থেকে ওরা দূরে সরে যেতে থাকল। অনেক, অনেক দূরে।

কিছু না বলে আমি বেরিয়ে এলাম।

কে যেন বলল, সোমবার দেখা হচ্ছে। আমি করিডোর দিয়ে হেঁটে চললাম। টানা বারান্দা, বড়ো বড়ো ঘর। বিহারে এখন অনেক, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়। এ জেলাতেও। আর যেহেতু আদিবাসী ছেলেমেয়ে কাছাকাছি জেলায় বিস্তর, সেহেতু নৃতত্ত্ববিজ্ঞান এখানে পড়ানো হয়। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানও তো চাই, নইলে ঝড়তিপড়তি গাইডের পায়ে তেল-মারা ডকটরেটগুলো যাবে কোথায়?

আমি, আমি কেন পড়তে এসেছিলাম। বিলডিং দেখে বাবা বলেছিল, এ পারো! জঙ্গল নেই কি রে? এ তো দেখি অনেক বড়ো জঙ্গল! বাপ রে! এখানে মানুষ হারিয়ে যায়।

না, আমি ছাত্রী হতে আসিনি। চাকরি নিয়ে এসেছিলাম, বাবাকে টাউন দেখাচ্ছিলাম। এটা সত্যিই জঙ্গল বাবা! প্রকৃতির দান যে জঙ্গল, তাতে অনেক করুণা থাকে। বাঘ তাড়া করলে গাছে উঠতে পারো, জলে ঝাঁপাতে পারো। মানুষের তৈরি জঙ্গলের থেকে পালাবার পথ থাকে না। ইঁট কাঠের জঙ্গলের বাইরেও এরা মনোরাজ্যে যে জঙ্গল রেখেছে, সেখান থেকে বেরোবার কোনও পথ নেই। ডকটর ভাট, শ্রীমতী শুক্লার গুরু, ওঁকে উৎসাহ দিয়েছেন, তুমি শুধু আমার দেখানো পথে এগিয়ে যাও।

ডকটর ভাট প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে আমাদের এই সাওলিয়া জেলার শবররা, মেদিনীপুরের লোধা শবর। আর পুরুলিয়ার খেড়িয়া শরবদের মতোই অপরাধপ্রবণ।

অবশ্যই ওঁর আসল কাজ ছিল, 'বিমুক্ত উপজাতি' যে সত্যিই 'ক্রিমিনাল' তা প্রমাণ করা। সে জন্য তাদের ভালাইয়ের জন্য উনি সাওলিয়ার সদর এই সালপুরা আর নওগোরার মাঝামাঝি 'মুক্তিগ্রাম' করেছেন। সেখানে 'শবর' নাম ভাঙিয়ে রুপি-ডলার-ক্রোনার-মার্ক পান লাখে লাখে। মুক্তিগ্রামে শবররা মাটি কোপায়, চাষ করে। তারা ক্লাস এইটে উঠলেই ডকটর ভাট ঘোষণা করে দেন যে, চুরি করেছে, চোর, আর বের করে দেন তাকে।

তিনি কতবার বিদেশে গেছেন জানি না। এখন মুক্তিগ্রামের কাছে বিশাল বাড়ি বানিয়ে বসে আছেন। বাড়ির সঙ্গে গেস্ট হাউস। সেখানে শুধু বিদেশী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা আসেন, থাকেন। ডলারে টাকা দেন, পাউন্ডে। ভাটের দাসত্ব স্বীকার করলে মানুষ ডকটরেট হয়, তাঁর সুপারিশে বিদেশ যায়।

আমরা শবররা, ওঁকে ঘৃণা করি। ওঁর মতো শত্রু শবরদের নেই। আদিবাসী জমি নিয়ে ওঁর মুক্তিগ্রাম। আর এ রাজ্যে, এ দেশে আদিবাসী বিচার পাবে? পাবে না।

শ্রীমতী শুক্লা, ডকটর ভাটের অনুগত শিষ্যা। এক সময়ে উনি ফিলডে গেলে ওঁর দাতন, গামছা বইতেন। শোনা যায়, নানাভাবে তোষামোদ করে করেই শ্রীমতী

শুক্লা ওপরে উঠেছেন।

ডকটর ভাট আর ডকটর প্রসাদের বয়সে অনেক তফাত। রিসার্চ ও সিদ্ধান্ত হল : শবররা সংখ্যায় এতই কম যে আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু সংক্রান্ত সব আচারই অপবিত্র বা ইমপিওর। আদিবাসী চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য তাদের হারিয়ে গেছে। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁর একদা গুরু ও অধুনা শত্রু ডকটর ভাটের সঙ্গে তিনি একমত যে, আমরা রীতিমত অপরাধপ্রবণ।

অর্জুন মিশ্র ওঁর শিষ্য।

তফাৎ দুই গুরুতে অনেক।

ভাট দাঁতন করেন ও নিমের আয়ুর্বেদীয় এবং ভেষজ গুণাগুণ বোঝান। শোনা যায়, তাঁর জীবনের শেষ কাজ হবে নৃতত্ত্ব নয় সাহিত্য। তিনি কবিতায় 'নিম সংহিতা' লিখবেন।

ডকটর প্রসাদ টুথব্রাশে দাঁত মাজেন, ইংরিজিতেই কথা বলেন, ভাট বলেন না। শিষ্যদের মধ্যে তফাৎ? জানি না। তবে ফিলডে গেলে অর্জুন মিশ্র মাঠে বসতে পারে না। শ্রীমতী শুক্লা লোটা নিয়ে চলে যায়।

আমি ফিলডে যাইনি। তবে মনিলা সিন্‌হা নাকি ওর জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছে। আর রীতা কাপুর ওকে করিডোরে চড় মেরেছিল। আমি ভর্তি হলাম, তাতে তপশিলি ছাত্ররা খুব খুশি হয়। ভানু কুমার বলেছিল, দিদি! ওই প্রফেসার বহোৎ হারামি।

ভানুদের সঙ্গেও দেখা হল না। আমার সপ্তরথী ওরা কয়জন।

ওরা না চেঁচালে দলিত সংগঠন দৌড়ে আসত না। আর কমিশনও বসত না।

আজ দেখা হলে ভানুকে বলে যেতাম, মহাভারত নিয়ে লেখা শেষ হয়নি ভানু, কেননা শিকার পর্ব লেখা হয়নি। উচ্চজাতি কী ভাবে নিম্নবর্গকে শিকার করে, তাই লেখা হয়নি।

তারপর আমি চমকে উঠলাম।

কি, হেঁটেই যাবেন ম্যাডাম।

ভানুর ছোটো ভাই, জগৎ।

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দিলাম, কোনও জবাব না দিয়ে হেঁটে চললাম।

আনন্দ হয়েছিল। আনন্দ হয়েছিল সালপুরা এসে। জেলা সদরে কর্মস্থল। যেন মস্ত সৌভাগ্য।

আমার চোখে সবই সুন্দর লেগেছিল তখন। এখানেই নাকি ছিল সুরথগড়। কে ছিল সুরথ রাজা? গড়টা কোথায়?

কেউ জানত না। যেখানে গড় ছিল, সেখানেই এখন সরকারি অফিস পাড়া। সবাই বলে 'কোর্ট'। ম্যাজিস্ট্রেটের আপিস, কোর্ট, সদর থানা। পি ডবলিউ ডি আপিস। চিলড্রেন্‌স পার্ক দেখে আমার বড়ো দুঃখ হয়েছিল। রেলিং ভাঙাচোরা, ফুলের গাছ নেই, বেড়ার গাছও মরা-মরা।

আর কি অভিভূত হয়েছিলাম এস পি, এস টি, গার্লস হস্টেল দেখে। এতবড়ো দোতলা বাড়ি। এমন উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। এমন লোহার গেট, এই বাড়িটা থাকবে আমার তত্ত্বাবধানে। মনে হয়েছিল আমি ধন্য, আমার জীবন ধন্য। সদর টাউনে কাজ করব, বীরবল শাস্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় যে টাউনে ? এই বীরবল শাস্ত্রীর নাম আমরা স্কুলের বইতে পেয়েছি। তিনি নাকি দানে কর্ণ, সততায় যুধিষ্ঠির, পুণ্যকর্মে হরিশচন্দ্র ছিলেন। কলেজ করে দিয়েছিলেন, পরে সেই কলেজই হল বিশ্ববিদ্যালয়।

শহরে একটা সহশিক্ষা কলেজ আছে। চারটে হাইস্কুল, একটা মেয়েদের কলেজও হবে।

মধুমন্তী শবরের বুক সেদিন খুব ভরে উঠেছিল। আজ আমি হস্টেলে ঢুকলাম। এখনি কি আমি অনেক দূরে চলে গেছি ? যেন লেন্‌স দিয়ে দেখতে পাচ্ছি হস্টেলটা, নিমগাছটা। আর কুয়োটা। কুয়ো একটা ভেতরেও আছে। তাতে পাম্প বসিয়ে হস্টেলের ট্যাঙ্কে জল তোলা হয়। জল রেশন করে মেপে খরচ করতে হয়। আমি তো শীত গ্রীষ্ম স্নান করে নিয়েছি অতীব প্রত্যূষে।

এখন বর্ষাকাল। বৃষ্টিও হচ্ছে বেশ। কুয়োতেও জল আছে। ঘরে ঢুকে যাবার আগে অফিসে ঢুকলাম। গঙ্গা ছেত্রী চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছে।

ওকে ডাকলাম না, চলে গেলাম নিজের ঘরে।

'অন্দর আনা মানা হ্যায়' লেখা বোর্ডটা কড়ায় বেঁধে দিয়ে দরজা বন্ধ করলাম।

কেই বা আসবে ? হস্টেলের মেয়েরা তো অধিকাংশই বাড়ি চলে গেছে। যাবে না কেন ?

এম এল এ মারা গেছেন। কলেজ ছুটি, স্কুল ছুটি আজ। কাল সাওলিয়াতে সবচেয়ে পূজিতা দেবী নাগলক্ষ্মীর পূজা। মন্ত্রীরাও পূজা দিতে আসেন। দেবী কত প্রতাপশালিনী এ থেকেই বোঝা যায়। আগে নাকি মেলা বসত। এখন সিনেমা হয় মন্দিরপ্রাঙ্গণে। পরশু পনেরোই আগস্ট, ষোলই রবিবার।

এবার পতাকা উঠবে ঠিকই। তবে নাগলক্ষ্মী ও ভারতমাতার প্রোগ্রামে ঠোকাঠুকি বরাবরই বাধে। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আর সদর থানায় পতাকা উঠবে জানি।

এই প্রথম মোহনপুরা যাব বলে অফিসে ছুটি নিতে গেলাম না।

যাব, কাল যাব বিজু। এখন সন্ধ্যা, বাস পাব না, ট্রেনও পাব না।

আলমারির চাবি ?

একটা বিজুর কাছে, একটা আমার কাছে।

বিছানায় পাতা খাদি গ্রামোদ্যোগের ছাপা বেডকভার, খুব শখ করে কিনেছিলাম। টেবিলে বিজু আর আমার ছবি। খুব শখ করে বাঁধিয়েছিলাম। বাবা, দাদা, ভাবী আর ভাইঝির ছবি—সবাই আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে স্টুডিওতে।

আলমারি না খুলেও বলে দিতে পারি কোন্ তাকে কী রেখেছি। চাকরিতে ঢোকার পর কী উৎসাহ হয়েছিল আমার। একটা একটা করে কত নাইলনের শাড়ি কিনেছি, ফোলডিং ছাতা।

বিজু বলে, সুতি পরতে ভুলে গেলে?

ভুলব কেন? ঘরে পরি। কাজের সময়ে সুতি পরা তো বিলাসিতা।

কিন্তু বিজুর বন্ধু গোপাল আর আমার বন্ধু রেওতীর স্বামী কিশোরের সঙ্গে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে যখন বিয়ে করলাম তখন বিজুর কিনে দেয়া সুতির বাঁধনি ছাপ শাড়িটাই পরেছিলাম। লাল, হলুদ, সবুজ মেলানো শাড়ি।

কিশোর বলে, মধুমন্তীর সাহসটা আমি এত তারিফ করি। রেওতী লাল শাড়ি পরবে? বলে, কালো রঙে লাল মানায় না।

আমি বললাম, ইশ্‌। আমরা, এস সি এস টি মেয়ে পুরুষ তো সবাই কালো। লাল, হলুদ, এসব রং চিরকাল পরেছি, এখনও পরব।

কিশোর বলল, ওহি তো প্রবলেম বাহিন। রেওতী এখন ফর্সা হতে চায়।

গোপাল আমাদের মধ্যে ইন্টেলেকচুয়াল। ওই একটু ইংরিজি ম্যাগাজিন ওলটায় আর জ্ঞান দেয় নানারকম। ও বলল, কা গজব! সায়েবগুলো কালো হবার জন্যে এ দেশে আসে। আর আমাদের লোকরা সাদা হবার জন্যে মরে।

গোপাল পর্যটন বিভাগে টাইপিস্ট। ওর পদবি কেরকেটা। ও মুণ্ডা আদিবাসী, রাঁচি জেলায় বাড়ি।

গোপালের বউ ইন্দ্রা গোমলায় ব্লক আপিসে কাজ করে। ইন্দ্রাও স্বামীর মতো হাসিখুশি।

কিশোর বিজুর মতোই রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ করে। ওরা বাল্মীকি, হরিজন। রেওতী মোহনপুরায় হরিজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ায়। কিশোরই বিজুকে ওদের টোলিতে ঘর যোগাড় করে দিয়েছে।

রেজেস্ট্রির পর আমরা হোটেলে খেলাম। কিশোর বলল, এটা কি বিয়ে হল? কাগজে সই করে বর আর বউ চলে যাবে দু'ঠিকানায়?

বিজু বলল, বউ যে ইউনিক কেস ভাই!

তোমার বউ ইউনিক কিসে ভাই!

আমরা সবাই সরকারি চাকরি করি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারে। মধু রাজ্যসরকারে। ভারতবর্ষে মধু একমাত্র মেয়ে, যার কাজ আটঘণ্টা নয়, আর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে একদিনও ছুটি মেলে না।

কিশোর বলল, হ্যাঁ। বন্ধুয়া মজদুর। ও বনডেড লেবার সিসটেম আছে না, বিহারে?

আমি আর বিজু এ-ওর দিকে তাকালাম।

বিজু বলল, জানি ভাই। আমার বাবা ছিল বন্ধুয়া।

তাই নাকি!

নিশ্চয়। বারো মাস মনিবের ঘরে খাটত।

তারপর?

মুক্তি পেয়ে গেলেন।

কী করে ?

মরে গিয়ে। আর পাছে মনিব ধরে নিয়ে যায় সেই ভয়ে আমি, মা আর বোন পালালাম ধুনার থেকে মহুলা।

আর থেকে গেলে ?

নিশ্চয়। করেসের জমিতে থাকতাম, লেবার খাটত মা। তারপর....ধীরে ধীরে....

আমি বললাম, চলো এবার।

কিশোর বলল, আসল শাদিটা তোলা থাকল বিজু।

মোহনপুরায় স্কুলবাড়ি ভাড়া করব। রীতিমত ফাংশান হবে। বউ থাকবে বসে। আর বর আসবে ট্যাক্সি চেপে। বহোৎ ধুম মচাব।

দেখ, কবে হয় !

আমি বললাম, ইশ ! বিয়ে হবে মহুলায়। আমাদের বাড়ি। তোমরা সবাই যাবে।

তবে তাই হবে।

গোপাল হঠাৎ বলল, পালিয়ে যাও।

কোথায় ?

যেখানে ইচ্ছে। টুরিস গাইড এনে দেব। না পালালে মধুমন্তী ছুটি পাবে না।

আমি বললাম, এম. এস. সি. হতে দাও। অনেক উপরে উঠে যাব।

বিজু কী করবে ? কম শিক্ষিত স্বামী ?

বিজু বলল, পালাব।

আমি বললাম, যাবে কোথায় ? যেখানে যাও ধরে আনব তোমাকে। আমাদের পরিচয় কুড়ি বছরের।

ভালোবাসা ন'বছরের।

সেদিন আমরা দুজনে দুজনকে দুটো খাতা দিলাম। কথা হল, রোজ আমরা ডায়েরি লিখব, রোজ। মাঝে মাঝে এ-ওর খাতা পড়ব। বুড়ো বয়সে সে খাতা পড়তে কত মজা লাগবে।

আমরা তো জানতাম। দুঃখের দিন যাচ্ছে, কিন্তু সামনে আছে সুখের দিন।

স্বপ্ন, স্বপ্ন, কত স্বপ্ন আমাদের। মহুলা এখন বড়ো হয়ে যাচ্ছে। ট্রেনও যায়। বাস তো অনেক। রাঁচি, ডালটনগঞ্জ, হাজারীবাগ, কতদিকে বাস যায় মহুলাজোর থেকে।

মহুলায় এখন হাইস্কুল, ব্যাঙ্ক, পোস্টাপিস, হাসপাতাল। ওখানে একটু জমি কিনব। ছোট্ট একটা বাড়ি হবে। একটুকরো বাগান থাকবে। একটা কি দুটো সন্তান, আমরা সুখে থাকব।

আমার বাবার ঘরটা অবশ্য মহুলা প্রপারে নয়, রেমু টোলিতে। চাষের জমিও বাইদা বাগায়। আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে আছি। নয়া মহুলা যদি বাস রাস্তার দিকে এগিয়ে যায় তো আমরা কী করব ?

॥ ২ ॥

সেদিন স্বপ্ন দেখতে দেখতে হস্টেলে ফিরেছিলাম।

আর আজ? আজ আমি কী স্বপ্ন দেখব বিজু, কী স্বপ্ন? আজ তেরই অগাস্ট। চোদ্দই তোমার কাছে যাব। ষোলই যাব মহুলা।

রাঁচিতে ইলা বরাইককে জানানোই হল না। ইলা দিদি তো জানেন, এত দিনে একবারও আসেনি, এবার আসবে মধুমন্তী আর বিজু।

মহুলা যাব, বাড়ি। যদি মহুলা ছেড়ে না বেরোতাম?

বাবা ইদানীং খুব বলছিল।

আমি পারোর বিয়ে দেখে যাব না?

দাদা যতবার বলতে গেছে, বিয়ে ওদের কোর্টে হয়ে গেছে বাবা। বাবা রেগে গেছে।

বিয়ে অমন হলেই হল? সমাজের রীতকরণে বিয়ে হবে, তাই তো বিয়ে। পারো আমাদের সমাজের গর্ব একটা। দুজনে গোলমেলে কাজ করে। সমাজে পরিচয় আছে একটা আমার।

বাবা আর দাদার কাছে আমি 'পারো' থেকে গেলাম। মধুমন্তী নাম তো ইলাদিদি দিল।

দাদার নাম ছিল হরা শবর। মহুলা নদীতে বাঁধ যখন তৈরি হচ্ছে, মা, দাদা, দুই দিদি লেবার খাটতে যেত। আমাকে নিয়ে থাকত ছোটদিদি। দাদা মাথায় পাথরের চৌকা বইত। দাদার বয়স তখন পনেরোই হবে। ঠিকাদারের লেবার সবাই। দেবে তো মাথা পিছু দুটো টাকা, সেও মাকে। দাদা আর দিদিদের দিত পাঁচ সিকা। সেও কি সহজে দিত? তিন চার দিন বাদে দিত।

দাদা মাথায় পাথর বইত। দাদা দেখতে খুব সুন্দর ছিল, আমাদের শবর ছেলেরা যেমন হয়। আমি তো শবরদের চেয়ে, বরাইকের চেয়ে, মুণ্ডাদের চেয়ে সুন্দর কাউকে দেখি না।

দাদাকে পাথর বইতে দেখে ঠিকাদার বলেছিল, এ হরা! আর তু গিরধারী বন্‌ গয়া। সেই নামটা দাদারও বোধহয় পছন্দ হয়। তাই নিজের নাম গিরধর করে নেয়।

আমার বাবার নাম বনো।

আমার মায়ের নাম হরা কেমা।

আমার বড়দিদির নাম ঝারো।

আমার মেজদিদির নাম কারো।

আমার ছোটদিদির নাম কোয়েল।

আমার নাম পারো।

কিন্তু যখন তামবনী স্কুলে পড়তে গেলাম, ইলা বরাইক বললেন, কোয়েল সুন্দর

নাম, একটা নদীর নাম। কারো একটা নদীর নাম। তোমার নাম আমি দিলাম মধুমন্তী।

কোয়েল আর কারো নামে নদী আছে তা তো জানতাম না। যখন তামবনী মিডল স্কুলে পড়তে যাই তখন জানতাম যে 'দুনিয়া' বা 'পৃথিবী' এগুলো শব্দ মাত্র। 'দেশ' বলতেও মাস্টাররা যে শেখায় সব ভুল। দেশ বা দুনিয়া মানে মহুলার রেমুটোলি থেকে তামবনী। ডুংরি পাহাড়, ফীনতোয়া মহুলা নালা। পলাশ আর বুনো জাম, কুল, আমলকীর বন। এই হল পৃথিবীর সীমানা।

তামবনী ইস্কুলে কেন শেখাল! দুনিয়া অনেক বড়ো।

কেন মনে উচ্চাশার বীজ রোহিন করলেন ইলা দিদি?

ঝারো এখনো পাথর ভাঙে।

কারো আর কারোর বর কবে চলে গেছে টাটা, লেবার খাটতে।

কোয়েল বাইদাবাগাতেই থাকে। ওর বর ওখানে পশুচিকিৎসক। রাঁচি থেকে শর্ট কোর্স ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। কোয়েল পলাশের লাক্ষা সংগ্রহ করে। কোয়েলই সব চেয়ে বেশি আসে বাবার কাছে।

আমার বাবা নিরক্ষর।

আমার মা নিরক্ষর ছিল।

আমার দুই দিদি নিরক্ষর।

আমার ছোটদিদি বড়োটোলা প্রাথমিক স্কুলে তিন ক্লাস পড়েছিল।

আমার দাদা পাঁচ ক্লাসে উঠেছিল। পড়া ছেড়ে দেয়। অনেক পরে নাইট স্কুলে গিয়ে পড়ল কিছুটা। তারপর বই কাগজ পেলেই পড়ে দাদা। মহুলা তো এখন অন্যরকম হয়ে গেছে।

আমার ভাবী ঝুমি চার ক্লাস পাশ।

ওর মেয়ে এখনও বড্ড ছোটো। ওর নামও দেন ইলাদিদি। দিয়াকে দাদা অনেক দূর পড়াবে, ওর অনেক স্বপ্ন।

আজ তের তারিখ। ষোল তারিখ আমি আর বিজু যাব মহুলা রেমুটোলি। দাদা বলেছে, বিয়ে বাড়ি থেকে হবে। বাবা তাই চায়। রেমুটোলির শবর সমাজ তাই চায়।

পাহাড় শবর আমাদের সমাজে সব চেয়ে সম্মানিত মানুষ। সব চেয়ে বুড়োও বটে। সে বলেছে, পারোর বিয়েতে খাসি দেব আমি। গান গাইবে মেয়েরা, আমার মা নেই, মামা নেই। বিজু দাদাকে কাপড় দেবে। ধুতি আর কে পরে এখন? বিজু একটা জিনের প্যান্ট দেবে। বিজু আমাকে বলেছে, তুমি ভাবীকে আর দিদিদের কাপড় কিনে দেবে।

নিশ্চয় দেব।

কোথায় কিনবে?

মোহনপুরা থেকে।

এমনি করে সব কথা হয়ে গেছে।

দরজায় টোকা দিল কেউ।

দরজা খুললাম।

সুমতি কুমার। থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। ভালোমানুষ, নিরীহ, বড্ড রোগা আর ছোটোখাট। আমাদের হস্টেলে কিছু নন্-এস সি, এস টি মেয়েও থাকে। বরাবরই থাকে। আগে বেশি থাকত। এখন কম সংখ্যায় থাকে। এখন থাকার নিয়ম নেই কাগজপত্রে। কিন্তু এ রাজ্যে নিয়মের ধার ধারে কে?

পাশে পশ্চিমবঙ্গকে দেখ, সেখানে আদিবাসীর ওপর কোনও অত্যাচার নেই, হরিজন ও দলিতরা সেখানে মানুষের সম্মান পায়। কোনও এস সি এস টি মেয়ে হস্টেলে জেনারেল কাস্ট! ভাবা যায় না।

এই হস্টেলের দায়িত্ব যখন নিলাম, বয়স মোটে বাইশ। দেখি হস্টেলে একশো তিরিশটা সিটের একশোটাতেই থাকে জেনারেল কাস্ট।

কিচেনে তারা আলাদা বসে খায়, হল্লা করে, রাতের শো-তে সিনেমা দেখতে যায়, ক্যাসেট চালিয়ে নাচে।

অনেক, অনেক কথা।

কিন্তু সুমতি কী বলছে?

কী, সুমতি?

ম্যাডাম, আপনি খেতে যাননি?

আজ খাব না সুমতি।

ও করুণ চোখে চেয়ে থাকল। তারপর বলল, আমি একটু শোনপাপড়ি দিয়ে গেলাম ম্যাডাম, খাবেন। মা বলে, রাতে উপবাসী থাকা খুব খারাপ।

কাকে বলছ সুমতি? যাকে বলছ সে 'উপোস' শব্দের মানে জানে। কিন্তু সে যে এখন অনেক দূরে চলে গেছে, কে খাবে শোনপাপড়ি!

বললাম, রেখে যাও, খাব। তুমি বাড়ি যাওনি?

না ম্যাডাম, দেয়ালিতে যাব।

যাও, শুয়ে পড়ো।

হ্যাঁ, ম্যাডাম। আপনি খাবেন তো?

তুমি দিয়েছ, খাব না? হস্টেল খুব খালি আজকে সুমতি, তোমরা দরজা জানলা বন্ধ করে সাবধানে থেকো।

আমরা এগারো জন আছি, সবাই হলঘরে থাকব রাতে। না হলে ভয় করবে।

ভয় নেই সুমতি। এখন সব জানলায় গ্রিল আছে, নেট আছে তারের। একটা আলো জেলে রেখো।

ম্যাডাম, আপনি একা থাকেন, ভূতের ভয় করে না আপনার?

না সুমতি। আমি তোমাদের ম্যাডাম, আমার কি ভয় করলে চলে? তা ছাড়া এখানে আমি একা থাকি গরমের ছুটিতে। ভূত কোথায়? ভূতকে ভয় নেই সুমতি। মানুষকেই ভয়।

গঙ্গা ম্যাডাম, সরবতীয়া, ওরাও আমাদের ঘরে শোবে আজ।

কেন ?

সবাই ভয় পাচ্ছে।

কিসের ?

নাগলছমী পূজার আগে অনেক ভূতপ্রেত আসে ম্যাডাম, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

আমার হিংসে হল সুমতিকে। কত সরল আছে জীবন ওর ! কেমন সহজ বিশ্বাস ! আমি তো ভূতপ্রেত বিশ্বাস করবার সময়ও পাইনি জীবনে।

কিছু হবে না। মন্দিরের কত কাছে হস্টেল !

আর গঙ্গা ম্যাডাম তো রোজ পূজা করেন। পরসাদ দেন সকলকে। এখানে কিছু হবে না কখনও।

আপনার সাহস আছে।....তবে যাই ম্যাডাম ?

যাও। গঙ্গা ম্যাডামকে একটু পাঠিয়ে দাও।

গঙ্গা ছেত্রী বিরক্ত মুখে পা টেনে টেনে ঢুকল। মোটা, ভারি শরীর। মানায় না, তবু সালোয়ার কামিজ পরে। মুখে চড়া মেক-আপ। গায়ে কস্ট্যুম জুয়েলারি, হস্টেলের স্টোরের চাবি আমার কাছে থাকার ফলে ওর একটা বড়ো রোজগার চলে গেছে। আমার করার নেই কিছু। এস সি এস টি ওয়েলফেয়ার অফিসার দয়াল শর্মা ওর পৃষ্ঠপোষক।

মেট্রন গঙ্গা ছেত্রী, রান্না করে জগন্নাথ মিশির, মালীর নাম বিশা জোংকো। বাসন মাজে, জল তোলে, ঘর সাফ করে দুজন আহীর মেয়ে। এস টি অফিসার শর্মা, স্পেশাল অফিসার বিষন প্রসাদ। সেখানেও ক্লাস ফোর স্টাফ ব্রাহ্মণ। কোথাও এস সি বা এস টি নেই। অফিসে উচ্চবর্ণ অফিসাররা কি হরিজন বা আদিবাসী বা দলিতের হাতে চা বা জল খাবে ? না হস্টেলে জেনারেল কাস্টের মেয়েরা বা গঙ্গা ছেত্রী খাবে যে কোন জাতের হাতে ? ব্রাহ্মণ রেঁধে দিলে সবাই খাবে। এক সময়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ব্রাহ্মণ রাঁধবে শুধু জেনারেল কাস্টের জন্যে, তপশিলি ও আদিবাসী মেয়েরা নিজেরা রেঁধে নেবে। আমি তা হতে দিইনি।

মেয়েদের বাথরুম জঘন্য ছিল। নতুন বাথরুম করিয়েছি ছয়টা। পুরনো চারটে মেরামত করিয়েছি।

নতুন কুয়ো করিয়েছি, নতুন পাম্প বসিয়েছি, নতুন ট্যাঙ্ক।

প্রত্যেকটার জন্যে দাম দিতে হয়েছে।

কিছু বলবেন ?

হ্যাঁ। তিনদিনের স্টোর বের করে নিন।

আপনি কি থাকছেন না ?

বের করে নিন।

সোমবার এসে যাবেন ?

তাড়াতাড়ি করুন।

হস্টেলের টাকা ব্যাঙ্কে রাখি। পাসবই, চেকবই, সব দয়াল শর্মার আপিসে দিতে হবে সোমবার। খামে ভরে রেখেছি, কাল চিত্রাকে দিয়ে দেব।

চিত্রা মেয়েটা ভালো। ওর বাবা সরকারি ডাক্তার, দয়াল শর্মার সঙ্গে দোস্তি আছে।

চিত্রা দিয়ে দেবে।

কাজটা ইরেগুলার হল, হোক গে। সব বেনিয়ম শিকারিরাই করবে? মধুমন্তীর কথা ভাবব, না পারোর কথা? আজ রাতে ঘুম তো আসবে না। কত রাত জেগে কেটে যায়। আজ তো জেগে থাকতেই হবে।

আমাকে যারা ভালোবাসে, ভানু, জগৎ, চিত্রা, শামসের, এমন আরও কত সহপাঠীরা—তাদেরই জানানো গেল না। ওরা ছিল বলেই তো বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে পেরেছিলাম।

বই আমি এনে দেব দিদি!

দলপত সব নোট এনে দেবে।

কাম দিদি! ডু স্মাইল! আমরা তোমার আপন লোক, দলিত সংগঠনের ছাত্র শাখা! উই মাস্ট স্ট্যান্ড টুগেদার। আমরা তোমার সঙ্গে আছি।

তোমাদের কথা পরে ভাবব ভানু, এখনও নয়, এখনও নয়। জেনারেল কাস্টের অনেক ছেলেমেয়েও তো আমার বন্ধু থেকেছে। সুমিত্রা, রণবীর বা রণ, বিক্রম (কিন্তু ডিকি নয়), মণি। ইয়েস মধুমন্তী, উই আর প্রাউড অফ ইউ।

ওরা অন্যরকম ছিল। অন্য আন্দোলন করত। কোনও সাহেব ধর্মগুরুর ভক্ত। কোনও মানুষের পদবি থাকবে না, ফলে জাত থাকবে না, সারা দুনিয়াতে জাতি একটা, মানব জাতি। আর সমাজ বলতে মানব সমাজ। রণ্-এর বাবা দিল্লিতে কেউকেটা লোক। ছেলেকে মুঠোয় রাখতে পারেননি। বিক্রম এসেছিল কলকাতা থেকে। সুমিত্রা ও মণি এসেছিল পাটনা থেকে। সুমিত্রার বাবা পাঞ্জাবী, মা গুজরাটী। মণির মা ও বাবা সর্বোদয় মিশনের লোক।

ওরা আমাদের অধ্যাপকদের চেয়ে ভালো ইংরেজি বলত। একেবারে অন্যরকম চালচলন ছিল, কেন ওরা সালপুরায় পড়তে এসেছিল জানি না।

ওরা হাসত। বলত, হোয়াই নট?

আর এল যেমন, চলেও গেল একদিন। স্বপ্ন দেখত ওরা। জাত-গোত্র-পদবিহীন মানব সমাজের। নিজেরাও পদবি ব্যবহার করত না।

আজ যদি তারা থাকত!

মধুমন্তীর কথাই ভেবে যায়। পারো, পারো, পারোর কথা ভাবা যাক।

আমরা শবর। বাবা বলত, আমাদের বসবাস ছিল জঙ্গলে। পাহাড়ি খাড়িয়াদের মতোই রহন-সহন, চালচলন। বাবা বলত, এক সময় সব ছিল জঙ্গলে ঢাকা। পাহাড়ি খাড়িয়ারা, আমরা, সব বনের শিকার, ফল, মধু, পাতা, কন্দ, মূল খেয়ে বাঁচতাম।

ধুনা, মধু, কাঠ, পাতা বিকতাম।

সে অনেক, অনেক বছর আগে।

তখন মানভূমও বিহারে। খাড়িয়া বা খেড়িয়াদের বসতি মানভূমে। এরা আমাদের জাতভাই। খেড়িয়া শবর। এই খেড়িয়া শবররা 'ক্রিমিনাল ট্রাইব' বলে ঘোষিত হয়। পরে এরা হল ডিনোটিফায়েড।

সে জন্যেই অর্জুন মিশ্র বলত, শবর মানেই ক্রিমিনাল। পশ্চিমবঙ্গে লোধা শবর আর খেড়িয়া শবর যদি ক্রিমিনাল হয়ে থাকে, শবর মাত্রেই ক্রিমিনাল, ছোটো জাত। আদিবাসী আর জাত কি সমার্থক শব্দ!

আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে বড়ো আছে, ছোটো আছে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞান পড়েছে, অর্জুন মিশ্র কিছুই জানত না কেন তাই ভাবি।

সালপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ববিজ্ঞান পড়ানো হবে সিদ্ধান্ত হতেই কাল হল।

রণ্ বলত, কী সব নমুনা। নতুন ইউনিভার্সিটি হলেই ঝড়তিপড়তি সব চালান করে দেয়।

আমি একটু হাসতাম।

তুমি জান না?

কি বলতাম? ওরা যেমন অধ্যাপকদের বিষয়ে বলতে পারত। কিছু জানে না, এ ওয়াশ আউট....

আমি একটু হাসতাম।

মণি বলত, কেন মধুমন্তীকে জ্বালাচ্ছো? ওকে পড়তেই হবে। পড়তে হবে, পাশ করতে হবে।

বিক্রম অলস গলায় বলত, কেন?

মণি বলত, ও ওর ট্রাইবের প্রথম গ্রাজুয়েট মেয়ে। এম এস সি করলে ও চাকরিতে অনেক বেটার চান্‌স পাবে।

আমি বলতাম, মিছেই ভাবছ তোমরা। আমার ইংরেজি যেমন কাঁচা, বইয়ের অর্ধেক বুঝিই না।

সুমিত্রা বলত, বুঝিয়ে দেব।

ওরা আমাকে খুব সাহায্য করত। আর যেসব বই লাইব্রেরি ছাড়া কোথাও নেই, তেমন ছ'সাতটা বই আমাকে দিয়েছিল।

ওরা তো থাকলই না, চলে গেল।

থাকলে হয়তো একটু জোর পেতাম। সালাপুরাতে সুমিত্রা থাকত ডক্টর মহাবীরের বাড়িতে। উনি তো একটা ঘরের ফ্ল্যাট বরাবর ভাড়া দেন।

রণ্, বিক্রম আর মণি থাকত মুরারি হোটেলের সংলগ্ন গেস্ট হাউসে। সন্ধ্যায় সবাই সুমিত্রার ঘরে আসত। ইংরেজিতে ধর্মসংগীত গাইত। তারপর ছেলেরা চলে যেত।

কত কথা সে জানতে চাইত!

তোমার আর বিজুর ভালোবাসার কথা বলো।

তোমার গ্রামের কথা বলো।

তোমাদের বিধবারা আবার বিয়ে করতে পারে, কী ভালো!

ডিভোর্স করে আবার বিয়ে করে, তাই না?

পণপ্রথাই নেই, কী ভালো!

তোমার ছোটোবেলার কথা বলো।

একবার তোমাদের গ্রামে গিয়ে থাকব।

বলতাম, বাহা পরবে এসো বা সহরায় পরবে।

যাব। যাব। নিশ্চয় যাব।

তোমরা সবাই এসো।

যাব মধুমন্তী! কী সুন্দর নাম! কিন্তু বড্ড বড়ো নাম।

ও নাম তো ছিল না।

পেছনে তাকালে যে মেয়েটাকে দেখতে পাই, যার গায়ে তার দাদার গেঞ্জি, হাটে কেনা একটা প্যান্ট, ছেঁড়া বই আর ফাটা স্লেট নিয়ে যে ছোড়দির সঙ্গে ইস্কুল যাচ্ছে আর আমলকী কুড়িয়ে নিচ্ছে, তার রুক্ষ চুলগুলো টেনে দিদি বলছে, এ পারো! দের মত্ কর্।

কিন্তু আমলকীগুলো কুড়িয়ে না নিলে পারো খাবে কী?

পেটভরে দু'বেলা খেতে কেমন লাগে, তাই তো জানত না পারো, তার দিদিরা, দাদা, মা আর বাবা।

আমার জন্মের সময়ে আমার বাবার মা, দাদ্‌হি বেঁচে ছিল। আমার এতো ছোটোবেলায় দাদ্‌হি মরে গেছে যে আমার কিছু মনে নেই। সবাই গেছে রোডের কাজে। ওরা তিনদিন আসেনা, ঠেকেদার একটা পয়সা দেয়নি।

তোরা খাসনি তবে?

কিছু ছিল না সে সময়ে। আমি আর কারো খিদেয় কাঁদছি, কোয়েল ঘুমিয়ে গেছে।

মা ছটফট করছিল।

তারপর?

দাদ্‌হি খুব বুঝত সব। সে বলল, পেটে দানাপানি নেই, বাচ্চা হবে কী করে? চাপ দিলেই শ্বাস আটকে যাবে।

দাদ্‌হি বেরোল পাড়ায়। কে কাকে ধার দেয়। এটা তো শবরটোলি। শেষে রেমুটোলার এক মুসলিম, লোকটা কুত্রজরা। ও ফলের মৌসুমে রাঁচি-পালামৌ বর্ডারে পেয়ারা, আতা পাইকারি রেটে কিনতে যেত। আমরা ওকে কুত্রজরাই বলতাম।

দাদ্‌হি তার কাছ থেকেই চারটি ছাতু চেয়ে আনল। সেটা জলে গোলাল। নুন মেশালো। মাকে খাওয়াতে তো মা মেয়েদের দিকে দেখাচ্ছে।

দাদ্‌হি মাকে বকছে।

কিন্তু সবাই এক ঢোক এক ঢোক খেল। দাদ্‌হিও খেল।

আর আমি হলাম।

আমি হয়েছি তা দেখে কারো গেল আগের দিনের তোলা পলাশপাতার আঁটি নিয়ে হাটে বেচতে। আমাদের ওদিকে শালগাছ তত নেই। পলাশ আর পলাশ। পলাশের পাতার ঠোঙায় খাবার জিনিসপত্র বিক্রি হোত।

কারো গেল নয়াটোলি। সে তো পাঁচ-ছয় মাইল পথ হবে। পলাশপাতা বেচে ও আধকিলো আটা, একটু লঙ্কা কিনে আনে। সবাই গরমজলে আটার ঘাটো তৈরি করে তাই খেল।

তাই তো খেতাম আমরা। আটা থেকে রুটি হয় সে তো অনেক পরে জেনেছি।

আমার জন্মের পর দিন দাদা ফিরল চার টাকা আর এক সের মকাইদানা নিয়ে। বাবা এল না। দাদা বলেছিল, বাবা পাথর ভাঙতে চলে গেছে। আমার জন্মের সময়ে দাই আসেনি। দাদ্‌হি নাড়ি কেটেছিল। দাদ্‌হি দাদা আর দুই দিদিকে প্রসব করায়। কোয়েল হয় গিয়েছিল জঙ্গলেই, মা যখন মৌয়া কুড়াতে যায়। তখন মাকি শবর নাড়ি কেটেছিল।

ন'দিনের দিন জন্মাশৌচ কাটল। দাদ্‌হি মঞ্জলা থেকে জল এনে রোদে রেখেছিল। সেই জলে আমি স্নান করলাম। মা নখ কেটে গায়ে জল ছেটাল। মহুলা নালায় স্নান করতে গেল।

খুবই অবাক কথা, সেদিনই বাবা এক বোঝা গেঁটে কচু পাঁচ সের ভুট্টাদানা আর চার টাকা নিয়ে চলে এল বাড়ি। বলল, এবার পাথর কাটতে অনেক দূরে যাব। তা ভাবলাম, একবার দেখে যাই।

সেদিন দাদাও একটা শজারু মেরে ঘরে ফিরল। দিনটা কী আশ্চর্য, পারো কতবার বলে আজও।

আমরা সবাই ঘাটো, কচুর তরকারি খেলাম মাংস দিয়ে। মা বলল, আমার এই মেয়েটা খুব পয়মন্ত বলতে হবে।

মা! তুমি তো জানতে পারছ না তোমার মেয়ে কতো পয়মন্ত।

আমাদের সমাজেও নাম দেবার নিয়ম পাহাড়ি খেড়িয়া সমাজেরই মতো। এক বছর হলে নাম দেয়া হয়। সেদিন মাটির বাসনে দু'দানা আতপ চাল ভাসানো হয়। একটি শিশুর জন্য, অন্যটি কোনও পূর্বপুরুষদের নাম করে। চাল ভাসিয়ে মায়ের কুলের, বাবার কুলের পূর্বপুরুষদের নাম করে চলতে হয়। প্রথম চালটা যখন দ্বিতীয় চালটাকে ছোঁবে সে সময়ে যার নাম করা হল শিশুর নাম তার নামেই হবে।

দাদা আর ঝারো অবধি নিয়ম মানা গিয়েছিল। তারপর তো আর মানা হয়নি। বাবাই আমাকে দেখে বলল, ঝারো, কারো, কোয়েল, এটা পারো।

তো পারোই রয়ে গেলাম আমি। বন থেকে হাসিল করা আমাদের যে জমি, সে তো তখন পাথুরে খটখটে।

নয়ামহুলা ক্যানেল হবার পর সে জমিতে চাষ হচ্ছে। মা দেখে গেল না সে জমির ধান, ভুট্টা মাড়োয়ায় সংসার চলে যায়। দেখে গেল না বাবা আর দাদার রক্ত জল করা পরিশ্রমে এখন আমাদের ঘরের চালে টালি, দেয়াল আর মেঝে ইটে মাটিতে গাঁথা, তার গায়ে চুনকাম। মা শুধু দুঃখ দেখে গেছে।

দাদ্হি শুধু দুঃখ দেখে গেছে।

আমি যখন খুব ছোটো, তখন দাদ্হি মরে যায়।

তখনও বাবা বাড়ি নেই। দাদাই লোক ডেকে দাদ্হিকে নিয়ে যায়।

রেমুটোলিতেই আছে আমাদের সমাধি ক্ষেত্র। একেক শবর পরিবারের সমাধি একেক জায়গায়।

খাওয়া জুটবে কি না, আজ আমরা খেতে পাব কি না, এছাড়া আমাদের অন্য শবর পরিবারগুলোর কোনও চিন্তা ছিল না।

বনে যাও, লতাপাতা, কাঁদা মূল, ফল যা পারো আনো। কাজে যাও, যা পার আনো। ফসলের সময়ে দৌড়োও মহুলার মাহাতো, গোয়ালাদের ক্ষেতে। ফসল কেটে নেবার পর ক্ষেতের ঝরা ফসল তো কুড়াতে মানা নেই।

অনেক পরে যখন লেখাপড়া শিখছি, অন্য রকম জীবন দেখছি, তখন আমার কী অবাক লাগত।

ইলা বারাইকের বাড়ি খুব আসতেন মেরিকুজুর। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী সরকারি অফিসার। ছেলেমেয়ে পড়ছে কনভেন্টে।

মেয়ে সন্তানসম্ভবিতা হয়ে মায়ের কাছে এল। তখন যা যা শুনতাম, সব যেন একেকটা অন্য গ্রহের খবর, যার কিছু জানি না।

প্রত্যেকদিন দুধ, ফল, ডিম খেতে হয় মেয়েকে। না খেলে ওর দেহে শক্তি থাকবে কেন?

আমার মা, ভাদো শবরের বউ এক বেলাও না খেয়ে উপোসি পেটেই সন্তান প্রসব করত।

বাচ্চা হবার পর তার ঘর এত সাফ রাখতে হয়, এত ন্যাপি, তোয়ালে, বেবি জনসন পাউডার, নরম বুরুশ—এত কিছু লাগে?

আমি তো জানি, মায়ের কাপড়ের কোণা ছিঁড়ে আমাকে জড়িয়ে রাখত। এই যে আমার ঘর, এই যে আমার এতো শাড়ি, মাথার তেল, গায়ের সাবান, ফর্সা বিছানা, মা দেখলে কী বলত?

হয়তো বলত, তুই আমার পারো নোস্, তুই অন্য কেউ।

মা জানত না, আমরা কেউ জানতাম না আমরাও পরিষ্কার ঘরে থাকতে পারি, ভালো জামাকাপড় পরতে পারি, দু-বেলা খেতে পারি, অনেক জলে স্নান করতে পারি।

আমি কি ভাবতে পারতাম যে লাইব্রেরিতে দাঁড়িয়ে ওলটাব হপম্যানের 'এনসাইক্লোপিডিয়া মুণ্ডারিকা' কিংবা রিস্লির 'দি ট্রাইবস অ্যাণ্ড কাস্টস অব বেঙ্গল'?

অনেক, অনেক পথ হেঁটেছে পারো। তবে সে মধুমন্তী শবর হয়েছে। শবর কোনওদিন 'ক্রিমিনাল ট্রাইব' ছিল কিনা জানি না। কিন্তু মহুলার চাষীবাসী, দোকানী, গোয়ালা সব আমাদের বড়ো হীন চোখে দেখত। কোথাও কিছু চুরি হলে নয়াটোলা থানা থেকে পুলিশ এসে শবর ছেলেদের ধরে নিয়ে যেত।

• সবাই বলত, ওদের ধরো। ন্যাংটা ফকির, খেতে পায় না। ওরা ছাড়া কে চুরি করবে?

আমরা শবর ছেলেমেয়েরা জানতাম, আমাদের ওদের কাছাকাছি যাওয়া বারণ।

মা, দাদ্হি, অন্য শবর মেয়েদের কাছে তীরধনুক থাকত। মাকি শবর ছিল তীর চালাতে খুব পটু। গ্রামে তো যখন-তখন পুলিশ ঢুকত। তখন মেয়েরা তীর চালাত, পুরুষরা বনে পালাত। এ আমি শুনেছি। মারদাঙ্গা করতেও শবররা পটু ছিল। সে সব দেখিনি, শুনেছি।

ক্রমে হাওয়া পালটে গেল। বিহারীলাল নামে একজন সমাজসুধারক এলেন মহুলাতে। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, সবাই তাঁকে মানত। গেরুয়া খাদির লুঙ্গি কুর্তা পরতেন, সাইকেলে ঘুরতেন। খুব বকতেন সকলকে, যাও যাও, ছেলেমেয়ে ইস্কুলে পাঠাও। রাঁচিতে মুণ্ডারা লেখাপড়া শিখে এগোচ্ছে। ছেলেমেয়ে সব পড়ছে। তোমরা কেন এমন জংলিভূত হয়ে বসে আছ? সরকারি ইস্কুল, আদিবাসীদের পয়সাও লাগবে না। বিহারীলালজি বলতেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে। ছুঁয়াছুতি, জাতিভেদ আর নেই। নির্ভয়ে ছেলেমেয়ে পাঠাও।

দাদাদের ব্যাচই প্রথম ব্যাচ। ওদের নিয়ে গিয়ে বিহারীলালজিই স্কুলে ভর্তি করে দেন। শবর ছেলেরা আগে যায়। পরে গেল মেয়েরা। বাবা বলল, যারা খেতে পায় না, তারা পড়ে কি করবে?

না পড়লে ভুখানাংগা থেকে যাবে।

পড়লে কি খেতে পাবে?

আরে, তখন কাজ তো করতে পারবে। শোন ভাদো, হম্ ন ঝুট বোলে তোরাকা। তু কা সমঝল হম্ ধান্দাবাজ হ্যায়?

নায় নায়। তু চাই আদমি।

আমরা শবররা, কোল, ভীল, মুণ্ডারা, বাবুদের সব কথার জবাবে বলি না না, তুমি তো ভালো। কিন্তু সেটা সব সময়ে মনের কথা হয় না। যেন একটা মুখোশ পরে কথা বলি। কেন বলি? তার মানে কি আমরা বুদ্ধু, গাঁওয়ার, অনুন্নত, বোকা? পশ্চাৎপদ? মিউজিয়াম পিস? দেখ দেখ, ফুড গ্যাদারার দেখ, দেখ দেখ হান্টার দেখ, দেখ দেখ সার্কাস দেখ, বোকাগুলো কেমন সিধু-কানু বিরসা নিয়ে চেঁচাচ্ছে। দেখ দেখ, ঝাড়খণ্ড চাইছে। সার্কাস দেখ, সার্কাস!

হ্যাঁ, মূলস্রোতের মানুষরা, দিকুরাই তো আমাদের সার্কাসের জন্তু করে ছেড়েছে।

সে হয়তো অনেক আগে ঘটেছে। বাবা তো জন্ম থেকেই দেখছে সে ন্যাংটা ফকির। কে জানে কবে সেসব ঘটেছিল।

কিন্তু আদিবাসীর মনের অতলে কোথাও দিকু সম্পর্কে অবিশ্বাস থেকেই যায়। আদিবাসীরা সে দিকুকে চিনতে পারে যে শত্রু। যে দিকু ভালাই করতে আসে বন্ধু সেজে, তাকে সন্দেহ করে।

মুখে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, কেঁও নহী। কায়ন?

কিন্তু বিশ্বাস পায় না।

সরকারকেই কি বিশ্বাস পায়?

সরকার জল দেবে, জমি দেবে, ঘর দেবে, স্কুল দেবে, হাসপাতাল দেবে, কাজ দেবে বলে? সরকার ভোট চায়।

বহোত চেঁচায়। নয়া আদমি তুমকো কুছ ন দিয়া। লেকিন হম্ এইসান খতরনাক নেহি। হম্ তুমকো দুখ সমঝতা হ্যায়। মুঝে বোট দো ঔর...

আমরা ভোট দিয়ে দিই।

ভোট দিয়ে বসে থাকি না। জানি রাস্তা হবে না, জল পাব না, জমি কেড়ে নেবে। ইস্কুলে যাবার সুযোগ পাব না, সব জানি।

আর পত্রকার এলে সুন্দর ও আন্তরিক হেসে বলতে পারি, আমাদের অসপাতাল? ওইখানে হবার কথা ছিল। ইস্কুলে? সব ছেলেমেয়ে পড়বে তো খাটবে কারা? তোমরা তো পাথর কাটবে না, মাটি কাটবে না, ক্ষেতী বগর কাজ করবে না?

কখনও রেগে বলি না।

আমাদের তো তোমাদের কাছে কোনও প্রত্যাশাই নেই।

কিন্তু আমার বাবা, ভাদো শবর, তাকে বিহারীলালজি বুঝিয়ে বুঝিয়ে ছাড়ল।

মা কিছু বলল না। শুনল, সকলের ইস্কুলে যাওয়া উচিত।

ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, কায় ন? এ তো ভালো কথা!

বাবাকে বল, তুই কি ঘরে থাকবি?

কী করে?

তাই বল্।

মা ঝারো আর কারোকে নিয়ে বলোয়া আর হাঁসলি নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। কাঠ কাটবে, পাতা কাটবে, পাতার আঁটি বাঁধবে, কাঠের বোঝা। সব মেয়েরা যাবে। আর গান গাইবে।

জঙ্গল! দূরে যেও না!
জঙ্গল! কাছে থাকো
জঙ্গল! তোমায় পূজা দেবো
জঙ্গল! তুমি কাছে থাকো।

তারপর কাঠের বোঝা, পাতার আঁটি নিয়ে নয়াটোলি যাবে মাইল মাইল হেঁটে। সেখানে ওগুলো বেচবে। কিনবে মকাইদানা, নুন, তেল, লঙ্কা। আমি তখন খুব ছোটো। আমাকে ঘরে রেখে কোয়েল আর ওর সমবয়সীরা দৌড়াবে জঙ্গলে। যদি বের পায়, নইলে বট ফল। আমরা তো সব খাই।

সন্ধেবেলা দু'বোনে পথ চেয়ে বসে থাকব। দাদা ইস্কুলের পর বিহারীলালজির কুয়োর জল তুলে ওঁর সবজিবাগানে দেবে। ওঁর গোরু, ছাগল ঘুরে তুলবে। তারপর খানিকটা ছাতু পলাশপাতায় মুড়ে আনবে। এমন সময়েই বিজু আর ওর মা আমাদের গ্রামে এল। ওর মা আমার মার সঙ্গে কাজ করত, বিজু ইস্কুলে যেত।

• ওর মা বলত, বিজুর বাবা টিপসই দিয়ে বন্ধুয়া হয়ে গিয়েছিল। আমার ছেলে লেখাপড়া শিখবে, আর টিপসই দেবে না।

আমার দাদা খুব পড়ছিল, খুব পড়ছিল। জংলি ফল খেতে খেতে ইস্কুলে যেত। বাবুই ঘাসের চাটাইয়ে বসে পড়ত। বিহারীলালজি বলতেন, এ ছেলেটা গোটা জাতকে টেনে উঠাবে।

কিন্তু দাদা তো একটানা পড়তে পায়নি।

এই সময়েই নয়ামহুলা ক্যানেলের কাজ শুরু হল। ক্যানেলের কাজে শবর, কোড়া, মাহালি, মুণ্ডা, সাঁওতাল কত দূর দূর থেকে এসে পড়ল। সবাই কিন্তু ঠিকাদারের লেবার।

মা, দাদা, দুই দিদি চলে গেল কাজে। ওরা বেরিয়ে যেত কাকভোরে বাস্যাম খেয়ে। বাস্যাম তো আগের দিনের বাসি ভাত নয়, মঝকাই ঘাটো থাকত। ওরা একটু একটু খেয়ে যেত। আমি আর কোয়েলও তখনি খেয়ে নিতাম। বেলা হলে যদি টক হয়ে যায়, ফেনিয়ে ওঠে! মা-দের ফিরতে ফিরতে সন্ধে কেন, রাত হয়ে যেত—আটটা কি নটা। সে অনেক রাত। আমার খুব মনে পড়ে একদিনের কথা।

ঠিকাদার হপ্তা দিত। রোজ মজুরি দিত না। চারজনের মজুরি যা হতো, তাতেই হপ্তা চালাতে হতো ছ-জনের।

সেদিন আমরা সকাল থেকে অবাক হয়ে বৃষ্টি দেখছি। এমন বৃষ্টি তো আমাদের ওখানে সচরাচর পড়ে না। যেমন জল, তেমন ঝড়। মাকি শবর ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে আর বলছে, নামা, নামা, জল নামা! ছাতু পুটকা খুব খাব। আমি আর কোয়েল গুটিসুটি বসে আছি। মা, দিদিরা আর দাদা কাঁপতে কাঁপতে ফিরল, তখন কি বিকেল? সকলের হাত খালি। জলঝড়ে কাজও হয়নি, ঠিকাদার আসেওনি, হপ্তাও দেয়নি। তখন মা বলল, কোয়েল, পারোকে নিয়ে যা লালার দোকানে। তোরা ছোটো, তোদের মুখ দেখে দয়া করে যদি কিছু মকাইদানা, চাই ছাতু আর লঙ্কা ধার দেয়।

দাদা ক্যানাল থেকে মাঝে মাঝে চটের বোরা আনত। দু'বোনে দুটো চট ঢাকা দিয়ে গেলাম ভিজতে ভিজতে। রেমুটোলা আর মহুলার মাঝামাঝি লালার দোকান। সব অন্ধকার, পাথরে পা বাজছে। কোয়েল আমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

লালা ধার তো দিলই না, উপরন্তু বলল, পুরাদস্তুর জানোয়ার সব। যা পাবে, মদ খেয়ে ওড়াবে। আর ধার চাইবে। বাচ্চাগুলোকে জলঝড়ে ঠেলে দিয়ে নিজেরা মদ খাচ্ছে।

দোষের মধ্যে কোয়েল বলল, মা তো মদ খায় না।

খায় না? কী করে ক্যানালে? রাত করে ফেরে কেন? যা যা! দূর হ!

কাঁদতে কাঁদতেই ফিরেছিলাম। সে রাতে আমরা কেউ খাইনি।

কাকভোরে মা বেরিয়ে গেল। জল তখন নরম পড়ছে। এত এত পাতা নিয়ে এল। আমরা দেখছি মা কী করে।

আমাদের বাসন বলতে একটা লোহার কড়াই। মা তাতে পাতা সেদ্ধ করে একটা ঘ্যাঁট করল। তাতে লবণ দিল, ক'টা ইমলি পাতা। বলল, খা!

দাদা বলল, মা, পাতা খাব?

কেন খাবি না? পাহাড়িয়ারা বারো মাস খায়। তারা কি মরে গেছে?

তুই খাবি না?

আমিও খাব।

আমরা সবাই তাই খেলাম। মা বলল, কাজে চল।

ক্যানালে সেদিন সব আদিবাসী লেবার উপোসে জরজর। ঠিকাদার আসতেই মা আগে, পরে সবাই চেঁচাতে শুরু করল, হপ্তা দাও, হপ্তা দাও, আগে হপ্তা। পরে কাজ।

কাজ কর আগে!

হপ্তা নইলে কাজ নেই।

তোরা কি এস্‌টাইক করবি?

হপ্তা দাও।

অতো চেঁচামেচি শুনে ইঞ্জিনিয়ার চলে এল।

কী হয়েছে?

মা বলল, হজৌর। আমরা কাল হপ্তা পাইনি। বাচ্চারা ভুখা। আমরা ভুখা। হপ্তা চেয়েছি আমরা। হপ্তা মজুরি না দিলে কাজ করব কি ভুখা পেটে?

ঠিকাদারকে বলল ইঞ্জিনিয়ার, কত লেবার?

চারশো পঁচাত্তর।

বাচ্চাদের নিয়ে?

হ্যাঁ সার।

কেউ হপ্তা পায়নি?

না না.... আমি তো আসিনি।

আগে হপ্তা দিন।

হ্যাঁ হুজুর।

লেবার ট্রাব্‌ল ডেকে আনবেন না। আনলে তো ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার দুজনেরই ঝামেলা হোত।

এসব আমি অনেক পরে বুঝেছি, বাইরে বেরোলাম যখন তখন। বিজুর বন্ধু ছিল রেলওয়েতে একটি বিহারী ছেলে, সে জনবাদী ট্রেড ইউনিয়ান করত। সে বলত, চারশো পঁচাত্তর জন পূর্ণবয়স্ক লেবারের জন্যে ওখানে সরকারি রেটে মজুরি আসছিল।

কত টাকা?

তখন? মাথা পিছু টাকা দশেক তো হবে। তার মানে ডেইলি চার হাজার

সাতশো পঞ্চাশ আসছে।

বাপ রে, কত ঠকাত?

অর্ধেক লেবারই বাচ্চা। তাদের দিত পাঁচ সিকা। বড়োদের আড়াই টাকা। আর ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার সবাই মিলে কত কামাত ভাবো।

• বলো না—আমার সয় না।

এখনই বা কি বদলিয়েছে? ভারত জুড়ে যত কাজ, সব আদিবাসী হরিজন লেবার, সব ঠেকেদারের লেবার। সবাই লেবারকে ঠকায়, সবাই বেআইনে বাচ্চাদের দিয়ে খাটায়।

সত্যিই বদলায়নি। কিছুই বদলায়নি। দীপক তো বলত, তোমরা ওদের সঙ্গে পারবে কী করে? ওরা চিরকাল সবরকম সুবিধা ভোগ করে আসছে, শোষণ করে অভ্যস্ত, সবরকম কলাকৌশল জানে। আদিবাসী কখনও ওদের সঙ্গে পারে?

কাগজে তো দেখি বাচ্চা লেবার নিয়ে আইন...

সব ধাপ্পা।

বলেই দীপক গান ধরত, যে গানটা ও শুনেছিল ওর মামার কাছে। ওর মামা পুরনো দিনের কম্‌নিস ছিলেন। পরে সব ছেড়ে দিয়ে প্রেস করেছিলেন। দীপকের বাবা মারা যান অকালে। বিধবা বোন আর ছেলেদের উনিই মানুষ করেন। দীপকের ভাষায় 'অমানুষ করেন'।

দীপকের দাদারা ব্যাঙ্কে ঢোকে।

দীপকের বোন কলেজে পড়ায়। স্বামীও প্রফেসার।

দীপকের মা বড়ো ছেলের কাছে থাকেন।

দীপকের মামা তাঁর পৈত্রিক জমিজমা এদের পেছনেই খরচ করেন, অথচ থাকতেন দীপকের কাছে, রেলের ছোটো কোয়ার্টারে। সেখানেই মারা যান।

দীপক বিয়ে করেনি। অন্য রাজনীতি করত। অন্য ট্রেড ইউনিয়ান। বিজুর, আমার সঙ্গে ওর দেখা হোত মোহনপুরাতেই। তবে সব সময়ে নয়। ও বলত, আমি পলিটিস করি। তোমাদের সঙ্গে বেশি আসা-যাওয়া করলে বিজুর বিপদ হবে। বিজুর তো চাকরিটা দরকার। ও বিজুকে আর আমাকে ওর মামার কাছে শেখা গানটা শোনাত।

কেক্‌রা কেক্‌রা নাম বাতায়েঁ
দুনিয়া মেঁ সব জুয়াচুরুয়া হো
মালিক লুটে, মহাজন লুটে
ঔর লুটে ভগবানোয়া হো॥

দীপক কত সত্যি কথা বলেছিল!

দীপক বিজুর কাছে বাঁশি শিখত। বিজু খুব সুন্দর বাঁশি বাজায়।

সুন্দর বাঁশি বাজায়, সুন্দর ওর হাতের লেখা। খুব ভালো ড্রয়িং করে ওয়ার্কশপে। নইলে ড্রাফ্‌টসম্যান হতে পারত?

এটা ওটা বানাবে, কলকব্জায় ঝোঁক খুব। আমার এই টেবিল ল্যাম্পটা ও তৈরি করে দিয়েছে। ট্রানজিস্টার তৈরি করতে পারে, রেডিও-টিভি সারাতে পারে।

এজন্যে মোহনপুরা রেলওয়ে ওয়ার্কশপে সবাই ওকে ভালোবাসে।

ও তো বলে, আমাদের সন্তান হলে ও একটা ঠেলাগাড়ি বানাবে, যার পিছনে জায়গা থাকবে। আমরা তরিতরকারি কিনে সেখানে রাখতে পারব।

বলে, আমাদের বাড়ি হবে ওর নকশায়। ও দেখিয়ে দেবে, কত অল্প খরচে, অল্প জায়গায় কেমন সুন্দর বাড়ি বানানো যায়। আসবাব নাকি থাকবে না। টেবিল, খাট সব বাঙ্ক সিস্টেমে হবে, যা দেয়ালে ভাঁজ করে তুলে রাখা যায়।

এরকম বাড়ি বিজু দেখে এসেছে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে, ক্লাইন সায়েবের নিজে হাতে তৈরি বাড়ি।

কিন্তু পারোর কথা বলতে গিয়ে মধুমন্তীর কথা বলি কেন?

কেমন করে যে বড়ো হয়েছি!

বাবা একদিন ফিরে এল, ফেরার পর ঝোঁক হল, সিচাইয়ের জল এসে যাবে, তখন জমিন চাষ করবে।

বাবাও ক্যানেলে কাজ করতে যেত। সে সময়ে মা ঝারোকে স্কুলে পাঠায়, কারোও যায়। মা আর কোয়েল জঙ্গলে যায় পাতা আনতে।

নয়ামহুলও বড়ো হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। মা সেখানেই পাতা বেচে।

আর খানিক লেখাপড়া জানে, বয়সও সতেরো হয়েছে—দাদা তখন সিচাই বিভাগে পিওন হয়ে ঢুকে গেছে। তারপর নাইট স্কুলে পড়ল, ম্যাট্রিক দিল প্রাইভেটে। তবে না দাদা কেরানী হল! অনেক, কষ্ট করেছে দাদা।

সে সময়ে বাবা বিকেলে কাজ থেকে ফিরে জমি থেকে পাথর সরাত। বলত, পারো, একদিন আমাদের জমিতে মকাই হবে, মাড়োয়া, অড়র—তখন তুই খুব খাবি, বুঝলি?

আবা, তু-ই খাবি না?

আমি খাব। সবাই খাবে।

কিন্তু ঘর তো মোটেই একটা। মা যে ছাগলটা পালতে এনেছে বিহারীলালজীর, সেটাও ঘরেই থাকে রাতে।

বৃষ্টি পড়লে ঘর ভিজত।

শীতে ঘরে ঢুকত কনকনে হাওয়া।

বাবা আর মা বাবুই ঘাস-পাতা দিয়ে ঘর ছাইত। শীতে সবাই একেকটা বস্তা চাপা দিয়ে ঘুমোতাম।

বিজু একদিন বলল, চাচা, পারো স্কুলে যাবে না?

বাবা বলল, যাবি?

আমি বললাম, যাব।

বিজু আমাকে আর কোয়েলকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল স্কুলে।

তখন আমরা, শবর ছেলেমেয়েরা দশ-বারোজন স্কুলে যেতাম। দাদার গেঞ্জী, একটা প্যান্ট পরনে। কোয়েলের পরনে প্যান্ট আর গায়ে একটা জামা, যেটা কারো পরতো একসময়ে।

মা হাট থেকে সেইসব জামা প্যান্ট কিনত, যা শহরের লোকরা বাসন বর্তনওয়ালীদের বেচত। তারা সেগুলো গ্রামের হাটে বেচতে আনত। মা ওখান থেকেই কিনত আমাদের জামা প্যান্ট।

ছোটোবেলা একবারই নতুন, শক্তপোক্ত জামা-প্যান্ট-ব্লাউজ-পাজামা-কুর্তা সব শবররা পরলো।

বিহারীলালজি কোনও খাদিভাণ্ডার থেকে অনেক সাদা সাদা খাদির জামা-প্যান্ট এসব আনলেন। সে একেবারে কয়েক মোটরা। বিক্রি হয়নি। ভাঁজে ভাঁজে ধুলো ময়লার দাগ। মহাত্মা গান্ধির জন্মদিনে সেগুলো বিতরণ করলেন।

আমরা পরে বাঁচলাম। মা বহুকাল বাদে একটা নতুন জামা পরলো।

ইসকুলে যেতাম ওই হাটে কেনা পচা-ধচা পোশাক পরে। মাস্টার কী মারত, কী মারত! জংলী জানোয়ার, ইস্কুলে পড়ার শখ! সব বাবু হবে!

মাস্টারের বেতের চোটে কত ছেলেমেয়ে স্কুলে আসত না। জামা ছেঁড়া থাকলে মাস্টার বেত দিয়ে সে ছেঁড়াটা খোঁচা দিয়ে বাড়িয়ে দিত। মাস্টার আর অন্য ছেলেমেয়েরা হাসত।

আমাদের ব্যাচে আমি, কোয়েল আর খাড়ি শেষ অবধি পড়েছি। অন্যেরা মারের চোটে পড়া ছেড়ে দেয়। সকালে বাস্যাম খেয়ে আসি, ঘরে গিয়ে সন্ধ্যাবেলা খাই। এর মধ্যেও ক্লাসে পড়া বলতে পারতাম, অঙ্ক করতে পারতাম।

ঝারো আর কারোর বিয়ে একসঙ্গেই হয়ে যায়। কোয়েল প্রাথমিকের পর আর পড়েনি। বাড়ির কাজ কে করবে।

তাই ভাবি, আমি তো পড়েছি। সেজন্যে বাড়িতে সবাইয়ের কাছে আমি ঋণী।

যদি বাবা বলত, ঘরে থাক্।

আমি থেকে যেতাম।

কিন্তু প্রাইমারি পাশ করার পর আমার জীবন তো বদলে গেল। গেলাম মিডল স্কুলে পড়তে নয়াটোলা। ইস্কুলের বাড়ি ইঁটে তৈরি, একতলা লম্বা বাড়ি। সবাই বেঞ্চে বসে, ক্লাস শুরু হলে আর শেষ হলে ঘণ্টা বাজে।

স্কুলের সামনে বাগান। লোহার গেট দিয়ে ঢুকতে হয়।

খুব পরিষ্কার, খুব।

আমি তো বুঝতে পারিনি, এই স্কুলে আমাকে ঢুকতে দেবে কিনা।

কিছু দূরে ছেলেদের স্কুল। একইরকম বিলডিং তবে অনেক বড়ো।

দাদা বলেছিল, মিশন স্কুল। ছেলেদেরটা হাইস্কুল। মেয়েদেরটা আট ক্লাস আছে, তবে হাই স্কুল হয়ে যাবে।

ওই স্কুলে তখন যাদের দেখলাম, সব কালো কালো মেয়ে। আদিবাসী, হরিজন

মেয়েই বেশি। সকলের পরণে পরিষ্কার জামা, পায়ে জুতো, চুল আঁচড়ে বেণী বাঁধা।

আমার গায়ে হাটুরে জামা, খালি পা। চুল কোনওমতে আঁচড়ে একটা বেণী করা। মনে আছে, কান বিঁধিয়েছিলাম, কানে সুতো বাঁধা ছিল।

ঝারো, কারো, কোয়েল সকলের খাতা থেকে সাদা পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটা খাতা সেলাই করেছি, সেটা আর একটা পেনসিল নিয়ে আমি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলাম।

তুমি ক্লাসে ঢুকবে না?

ইলা বারাইকের পরণে সাদা মলমলের থান, গায়ে সাদা জামা, চুলে উঁচু খোঁপা, পায়ে হাইহীল জুতো। ওঁর মুখে বসন্তের দাগ ছিল! চোখ ছোটো। তবে করুণা আর হাসি—দুয়ে মেশানো চাহনি।

প্রথম দিন আমি এতো কিছু লক্ষ্য করিনি।

কোন্ ক্লাসে যাব?

ভর্তি হয়েছ?

বাবা নাম লিখিয়ে গেছে।

চলো, আপিসে গিয়ে দেখি।

আপিসে একজন মোটা ম্যাডাম বসেছিলেন। পরে শুনেছি তিনি অ্যাসিস্টেন্ট হেডমিস্ট্রেস। আর মিস বারাইক আমাদের নতুন হেডমিস্ট্রেস। মিস বারাইক বি এ বি এড আরও কত কি।

আমার নাম লেখা ছিল।

তোমার নাম পারো শবর?

আমি মাথা নাড়লাম ওপর নিচে।

এতো ভালো মেয়ে—নয়ামহুলা স্কুলে তুমি তো সেকেণ্ড হয়েছ!

আবার মাথা নাড়লাম।

আমি তোমার নাম দিলাম মধুমন্তী।

আমি মাথা নাড়লাম।

তুমি ফাইভ-এ ক্লাসে পড়বে। চলো, তোমার ক্লাস দেখিয়ে দিই।

ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেখানে খাড়ি শবরকে দেখে যেন বাঁচলাম। মিস বারাইক বললেন, তোমার বন্ধু পার্বতী শবর বসে আছে, দেখছ তো?

টীচারকে বললেন, এ মধুমন্তী শবর—পারো নয়। মধুমন্তী—নয়ামহুলা স্কুলে সেকেণ্ড হয়েছে। যাও, বেঞ্চে বস।

পরিষ্কার চেহারার মেয়েরা একটু সরে বসল। আমার খুব লজ্জা করছিল। পরে জানলাম। ওরা স্কুল হস্টেলে থাকে আর সবাই ক্রিশ্চান।

পরদিনই আমরা বি-সেকশনে চালান হলাম। সেখানে আশপাশের স্কুলের মেয়েরা ছিল। তারা ক্রীশ্চান নয়, অত পরিষ্কারও নয়। কিন্তু জাসপুর, ধলগঞ্জ, গোপালপুরার সচ্ছল ঘরের মেয়ে ওরা।

ওরা বাস্যাম খেয়ে আসত না, দুপুরে টিফিন খেত, বাড়িতে মাস্টারনি এসে

পড়াত ওদের।

আমরা বাস্যাম খেয়ে আসতাম। বাবা ও দাদা বাসভাড়ার পয়সা দিলেও এক পিঠের ভাড়া বাঁচাতাম। ওই পয়সা দিয়ে কাগজ কিনতাম!

কিন্তু মিস বারাইক আমাকে, যারা পাস করেছে তাদের পুরনো বই কিনে দিতেন। মাঝে মাঝে খাতা দিতেন।

সব সময়ে বলতেন, আমিও আদিবাসী। আমাদের কষ্ট করেই লেখাপড়া করতে হয়। মনে সাহস রাখো মধুমন্তী। তোমাদের একটা মেয়েও দশ ক্লাস পড়েনি, তুমি পড়ো।

হস্টেলের মেয়েরা তো পড়েছে?

ক্লাস এইট পাশ করলেই অনেকে চলে যাবে।

কী করবে?

ধাত্রীবিদ্যা শিখবে, অথবা নার্সিং-এর ডিপ্লোমা কোর্স-এ ভর্তি হবে।

তারপর?

উনি হাসতেন।

চাকরি করবে।

আমি তো করছি। এলন কেরকেটা, উনিও তো আদিবাসী।

আমরা এমন কেন?

তোমরা তো কোনও সুযোগ পাওনি।

মিস্, আপনিও ক্রিশ্চান?

হ্যাঁ মধুমন্তী, আমি মিশনেই মানুষ।

পরে শুনেছি, কোনও এক আকালের সময়ে ওঁকে মিশনের দরজায় নামিয়ে দিয়ে চলে যায় বাপ-মা। সেটা আদিবাসীর এলাকার মিশন। তখন ওঁর বয়স চার। নাম ছিল লুড়ি বারাইক। মিশনে নাম হল এলা বারাইক। উনি পরে নিজের নামকে 'ইলা' করে নেন।

সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেব, টেস্ট হয়ে গেছে, মায়ের ভীষণ অসুখ হল। ততদিনে কোয়েলের বিয়ে হয়ে গেছে, দাদাও বিয়ে করেনি, মায়ের অসুখে আমার পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

মাকে নয়াটোলিতে ডাক্তার দেখাল দাদা। হয় ডাক্তার বুঝতে পারেনি, নয় মায়ের জটিল কোনও রোগ হয়ে থাকবে। ডাক্তার বলে দিল, সালপুরা কী মোহনপুরা হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে দাও।

মা বলল, কোথাও যাব না, আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।

বিজু ততক্ষণে ম্যাট্রিক পাস করে নিয়েছে, মোহনপুরে রেলওয়ে ওয়ার্কশপে ঢুকে গেছে। সে বলল, নিয়ে যাব চাচিকে? ভর্তি করে দেব?

মা বলল, আমি যাব না।

না ভর্তি হও, চলো দেখিয়ে আনি।

তবে পারো সঙ্গে চলুক।

তখনও কোয়ার্টার পায়নি বিজু। বস্তিতে ঘর ভাড়া করে থাকে। সে বস্তিতে রেলওয়ে ওয়ার্কশপের লোকই ছিল বেশি। বাবাও যেতে চাইল। আমরা সবাই গেলাম বাড়িতে মাকি শবরকে রেখে।

বিপদে-আপদে রেমুটোলিতে মাকি ছিল একজন। যার ভরসা সবাই করত। কারও সন্তানপ্রসবের ব্যথা উঠলে মাকি, কারও রোগভোগে মাকি। বিজু পাশ করল বা দাদা চাকরি পেল বা আমি ক্লাসে উঠলাম—আনন্দ জানাতে ওই ছুটে আসত।

শবর ঘরে ছেলেরা বিয়ে করে বাপ-মা নিয়ে খুব থাকে না। মাকির ছেলেরাও সরে গিয়েছিল। ওর ঘর বলে টান ছিল না।

দাদা চাকরি করল, আমাদের রহনসহন একটু অন্যরকম হয়ে গেল, তাতেই একসঙ্গে থাকা।

এখন অবশ্য অনেকে থাকছে, ছোটোখাট চাকরি অনেকে করছে। বিয়ে করেই ঘর বেঁধে নিলাম। তেমন জমিও মেলে না আর।

যা হোক, বিজুর সে ঘরই আমার কাছে শহর। আর মা-বাবা শুধু বলে, এতো চাপাচাপি? এতো গোলমাল? বাবা! শাকও কিনে খাস? থাকিস কী করে?

হাসপাতালে ডাক্তার বলে দিল, ক্যানসার।

ক্যানসারের যে চিকিৎসা নেই, তা তো জানা কথা। থাকলেও গিরিধর শবর তার মাকে চিকিৎসা করাতে পারে না।

মা দাদা আর বিজুর মুখ দেখেই বুঝল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, আমাকে রেমুটোলি নিয়ে চল। কবিরাজ আছে। গাছ-লতাপাতার ওষুধ খাব। সে ওষুধ খেয়েও তো অনেক লোক সেরে যায়। যায় না?

অনেক লোক সেরে যায়, অনেক লোক মরে যায়। মিশনে ডাক্তার বসতে শুরু করার আগে তো ওষুধ পেতাম না আমরা।

ইলা ম্যাডাম রাগ করল খুব।

আমি তো তাকে রাঁচি হাসপাতালে ভর্তি করতে পারতাম। চিকিৎসা হত।

আমি শুধু বললাম, মা ঘরে আসতে চাইল।

না, আমার মা বাঁচেনি। রেমুটোলিতে যে ছিল ভাদো শবরের বউ—পাঁচটা সন্তানের মা।

যে একাই ছেলেমেয়ে মানুষ করে তুলল। পাথর ভেঙেছে, কাঠ কেটেছে, পাতার বিড়া বেঁধেছে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জলে ভিজেছে, রোদে পুড়েছে, শীতে কেঁপেছে।

সুখ কাকে বলে বলতে মায়ের ধারণা ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। ঘরে এক বোরা মকাইদানা থাকে, চাল দিয়ে জল পড়ে না, লবণ আর মরিচ থাকে, ছেলেমেয়ের গায়ে পুরনো হোক, গোটা জামা থাকে, ওদের বাবা যেন ঘরে থাকে। এসব সুখ তো মা জেনে গেল না।

বিজুর ঘর দেখে বলেছিল, টিউকল ঝাঁকালেই পানি, কুয়াতে বালতি ডোবালেই জল? ইস্টোভে চাপালেই রান্না? বিজু, তু আমীর বন্ গেইল। সেই মা আমার রেমুটোলি ফিরেই মরে গেল। তেল হলুদ মাখিয়ে দাদারা মাকে গোর দিতে নিয়ে গেল। আমরা চার বোন বসে আছি, গোর দিয়ে ওরা ফিরে এল বিকেলে।

• তিনদিনের দিন নিমপাতা সিজিয়ে ভাত খাব, নিমপাতা আনতে গেছি, বিজু বলল, কোথা যাস?

নিমপাতা ভাঙতে।

পরীক্ষায় খুব চোট এসে গেল।

আর পরীক্ষা! দিতে কি পারব?

পারতেই হবে।

বললেই হয়! ঘরের কাজ?

শবর জাত থেকে একটা মেয়ে উঠুক।

হয় না বিজু।

হতে হবে।

কেন?

আমার জন্যে, আমি তোকে ভালোবাসি মধু।

তুই পাশ করেছিস। রেলে কাজ করিস। অনেক মেয়ে পাবি।

আর একটা মধু পাব না।

অবাক, অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ও সস্নেহে আমার কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিল। বলল, অনেকদিন ভালোবাসি—যা ঘর যা।

আমি বুঝলাম, আমিও ওকে ভালোবাসি নিশ্চয়। এতদিন ধরে আলাপ জানাশোনা—ভালোবাসা জন্মেছিল নিশ্চয়।

পরীক্ষা দিবি তো?

চেষ্টা করব।

আমি মানে-বই, নোটবই দেব।

দিস।

বিজুর কথা ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে গেল। সারারাত জেগে কেটে গেল। উঠে পড়েছিল মধুমন্তী। হস্টেলে কেউ ওঠার আগে বাথরুমে গেল স্নান করল। আলমারিটা খুলল।

না, সব গোছানো আছে।

শবরদের প্রথম মেয়ে যে গ্র্যাজুয়েট হল। সেও তো গিয়েছিল ১৯৮৮ সালে দিল্লিতে, ছিল ভারত সরকারের অতিথি হয়ে।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কতজনের কাছ থেকে কতরকম উপহার পেয়েছিল মধু,

সম্মানফলক। সরকারি ব্যবস্থায় ঘুরেছিল জয়পুর, আগ্রা, মথুরা।

সব জায়গা থেকে চিঠি লিখত বিজুকে।

সেগুলোও তো বিজু এখানেই রেখেছে।

সব গোছাতে হবে।

সব গুছিয়ে ঘর বন্ধ করে মধুমন্তী শবর বেরিয়ে এসেছিল। মুখ চোখ খুব শান্ত ছিল। এখন তো কোনও প্রশ্ন নেই, দ্বিধা নেই, মধুমন্তী জানে তাকে কী করতে হবে।

॥ ৩ ॥

১৪-৮-৯২।

আজ পৌঁছলাম মোহনপুরা। দেড়ঘণ্টার তো পথ। বাসে আসতে কতটুকু সময় বা লাগে! দয়াল শর্মা কী বলবে?

অফিসকে না জানিয়ে স্টেশন লীভ করা মস্তবড়ো অন্যায়। আফটার অল, তুমি সুপার...

কী হত যদি মধুমন্তী শবরকে খাড়ুররা ব্লকে সোশ্যাল ওয়ার্কার করে রেখে দিত?

ইলা ম্যাডামের কথা মনে পড়ছে কেন? যাবার কথা তো তাঁর কাছেও।

আমাকে ডাকবে তো? না ক্রিশ্চান বলে দূরে সরিয়ে রাখবে?

মা নেই, আপনিই তো করাবেন সব।

তোমার দাদার বিয়ে দেখিনি। বউ আনতে গিয়েছিলাম। একটা শবর বিয়ে দেখার বড়ো শখ।

এবার দেখবেন।

বিজু সব অনুষ্ঠান করবে?

আমি তো চাই, আমার খুব শখ।

সত্যি, বিয়েতে কত নিয়ম!

মেয়েরা তীরের ফলা দিয়ে জলে সীমানা দিয়ে দেবে।

সেই জলে স্নান করব।

গাছ বিয়েটা কী?

ওর বিয়ে শালগাছের সঙ্গে, আমার বিয়ে পলাশগাছের সঙ্গে। এ তো হতেই হবে।

কেন?

গাছের মতো যেন সফল সুন্দর প্রাণবন্ত হয় জীবন।

নতুন প্রাণের সৃষ্টি করে।

কয়টি সন্তান চাই?

একটি—বড়ো জোর দুটি।

তোমরা তো পাঁচজন। না, এখন ছোটো পরিবারই ভালো।

মধুমন্তী। এডুকেশন....

এডুকেশন, মধুমন্তী! শ্রীমতী শুক্লাও বলত।

এডুকেশনের কথা যারা ভাবতে পারে না ম্যাডাম? ম্যাডাম আপনি শৈশব থেকে মিশনে। শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। সুযোগ পেলে আদিবাসীও উপরে উঠতে পারে।

আর আজ শিক্ষার দরকার অস্বীকার করবে কে?

গরিব আদিবাসী ও অন্য আদিবাসী গরিবরা পরিবার-পরিকল্পনা করেন না।

শ্রীমতী শুক্লা, আপনারা অর্ধভুক্ত উলঙ্গ ন্যাকড়াকানি পরা শিশুপাল দেখে শিউরে ওঠেন।

বিস্ফোরণ, জনসংখ্যায় বিস্ফোরণ! ভারতবর্ষের কী হবে?

একটা ভারতবর্ষ একটি সুন্দর শিশু কোলে মারুতি চেপে টিভি মডেল মা-বাবা একুশ শতকে ঢুকবে মেন গেট দিয়ে।

আর একটা ভারতবর্ষ? জমিহীন শিক্ষাবঞ্চিত অপুষ্টি ও কুসংস্কারের শিকার, ধনী দেশগুলোর ভারত ভিভিসেকশন সেন্টারের গিনিপিগের দল কেমন করে যাবে?

আমাদের পেছনে রেখে তোমরা যাবে?

মাটি চষবে কে?

হাইরাইজ বানাবে কারা?

মাটি চষে ফসল তুলে দিয়ে আসবে তোমাদের জন্য?

পাথর ভেঙে রাস্তা বানিয়ে দিয়ে পথ ছেড়ে নেমে যাবে পাশের মাঠে?

হাইরাইজ বানিয়ে দিয়ে ফিরে যাবে ঝোপড়িতে।

দেশটাকে তোমাদের জন্যে রাখার তো দরকার টাস্ক ফোর্স। আমাদের ঘরে একটি শিশু জন্মালে সে টাস্ক ফোর্স আসবে কোথা থেকে?

আমরা পাঁচজন আর বাবা-মা। কে কাঠ আনত, কে পাতা কেটে বিড়া বাঁধত, কে জল আনত, কে ক্ষের্ত গুঁড়াত, কে পাথর ভাঙত—তবে তো দিন চলত।

না, ইলা ম্যাডামকে ডাকতে হবে। মা কি বলত, যারা অনেক বিয়ে দেখে তাদের বিয়ে হয়েও যায়। হয়তো ইলা ম্যাডামেরও হবে। আগে মনে হত, কেমন করে হবে, উনি তো বুড়ো!

এখন জানি, এখন আমার বয়স সাতাশ, ওঁর বয়স বিয়াল্লিশ হবে।

এ বয়সেও বিয়ে করে মেয়েরা। কলেজে পড়ত আমার সঙ্গে রমলা মুণ্ডা। ওর দিদি সুবিলা ছিল নার্স। অনেকদিন চাকরি করল। মা-বাবা-ভাই-বোন সকলকে দেখল। ভাইবোনদের বিয়ে হল। ছেলে মেয়ে হল কারও। তারপর বিয়াল্লিশ না তেতাল্লিশে উনি বিয়ে করলেন একজনকে, সে বয়সে কিছু ছোটো। এন সি ডি সিতে অফিসার। ভালোই আছেন। চাকরি ছাড়েননি।

রাঁচিতে মুণ্ডা মেয়েরা কত এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে ক্রিশ্চানরা। আমরা শবররা তো অনেক পিছনে, অনেক পিছিয়ে আছি।

মধুমন্তী দিদি?

চমকে উঠলাম আমাদের এস টি অপিসের পিওন ভানো কুরকু।

কে, ভানো?

ঘর যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আমিও যাচ্ছি। ছুটি মিলে না, মিলে না, তা আমার মেয়ে হয়েছে, ঘর যাব না?

নিশ্চয় যাবে।

যদি তিন গাড়িয়া যান, আমার ঘরে যাবেন?

যাব ভানো, নিশ্চয় যাব।

মোহনপুরা এসে গেল।

এক সময়ে এই রেলওয়ে স্টেশন নাকি খুব সুন্দর ছিল। সব অ্যাংলো ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্টাফ। গাছ বাগান ছোটো ছোটো সুন্দর সুন্দর বাড়ি। টাউনে সার্কাস আসত, স্পোর্টস হত, কী সুন্দর ছিল।

এখন তো বড়ো জংশন। পুরনো মোহনপুরাকে হটিয়ে দিয়েছে নতুন শহর। পুরনো সুন্দর যা, তাকে গ্রাস করে নতুন কিছু গড়ে ওঠে, সময়ের দাবিতে। কিন্তু নতুন বড়োলোকদের রংচঙে সব বড়ো বড়ো মকান।

দোকান দোকান, বাজার বাজার। নর্দমা-উপছানো দুর্গন্ধ ময়লা জল, বাস স্টপে মলমূত্র উপছে পড়ছে পাবলিক সনডাশ থেকে, আর তার রাস্তাগুলো কী হিংস্র! অটো, মোটর সাইকেল, সাইকেল, মোটর, বাস, সাইকেল রিকশা—যেন চলমান এক একটা মেশিনের জঙ্গল।

আর ক্যাসেটে গান!

মোহনপুরা নেমে অটো নিলাম। গান্ধী পল্লীতে বিজুর কোয়ার্টার। এ কোয়ার্টারগুলো পরে তৈরি।

নতুন নতুন গন্ধ এখনও আছে। সামনে টিন-ঢাকা বারান্দা, বারান্দা রেলিঙে ঘেরা। বারান্দার দরজায় তালা, খুললাম। বিজু বেশি সাবধান, বারান্দা জালে ঘিরেছে।

আরে ভাবী যে?

রীতা। যমুনাজির মেয়ে। ভারি ছটফটে মেয়ে, বিজু ওর ভাইয়া, আমি ওর ভাবী।

রীতা, ভাল আছিস?

খুব। 'জো জিতা ওহি সিকন্দর' দেখেছ?

কখন দেখব?

চলো ভাবী, রবিবার।

ইস্! রবিবার মহুলা যাচ্ছি আমরা।

জানি জানি। এবার ফাংশান হবে বিয়ের।

হবেই তো।

তখন আমি যাব, আমি তো ননদ!

আর আমি ?

যমুনাজি বেরিয়ে এলেন।

আপনি তো মৌসি। মা-মৌসিকে বাদ দিয়ে কোনও শুভ কাজ হয় ?

চা করে আনি ?

না না। স্নান করে একটু জিরোই।

বিজু এসে খাবে। ডিউটি তো চারটে পর্যন্ত। সত্যি, মাথায় সিঁদুর হাতে চুড়ি না হলে মানায় ?

আমি হাসলাম।

কী আনন্দ যে করব !

আমি ঘরের তালা খুললাম। চাবি দুজনের কাছেই থাকে। একটাই বড়ো ঘর। সঙ্গে একটা ছোট রান্নাঘর। বাইরে কুয়োতলায় সার সার স্নানের ঘর, সার সার পায়খানা। যার যার বালতি দড়ি তার তার ঘরে।

বিজু দুখানা ঘরের কোয়ার্টার পাবে, পায়নি। মার অসুখের সময়ে যে ঘরে থাকত তার চেয়ে এ ঘর অনেক বড়ো। তবে এ দিকটায় জলের সমস্যা। টিউবওয়েল চলে না। একটাই টিউবওয়েল। তা থেকে পানীয় আর রান্নার জল নেয়া হয়। বাকি কাজ সব কুয়োর জলে।

ঘরে বড়োসড়ো চৌকি। বইয়ের শেল্ফ। টেবিল চেয়ার, টেবিল ফ্যান, টেবিল ল্যাম্প। একটা আলমারি—নেহাৎ ছোটো, সেও কাঠের।

টেবিলে কী লিখে গেছে বিজু।

'মধু চা করে নিও, বিস্কুট আর কলা আছে। বাজার করা আছে। তুমি বিশ্রাম করো, আমি এসে যাব।'

কে চা করে ? আলমারি খুলে জামাকাপড় নিলাম, সাবান। ইস, আমার জামা কাপড়েই আলমারি ভয়ে গেছে ! যাবেই তো। দোকানে যে কাপড়টাই চোখে লাগে, সেটা বিজু এ মাসে না হোক ও মাসে কিনবেই।

তোমার তো কাপড় দরকার। কতজনের সঙ্গে মেশো, কত জায়গায় যাও, ইউনিভার্সিটি—বাপ রে !

তোমার পড়াশোনা অনেক, পরীক্ষাটা দাও না।

কম শিক্ষিত স্বামী নিয়ে লজ্জা হচ্ছে ?

ভীষণ। মনে হচ্ছে....

কী ?

এ রকম স্বামী যদি সব মেয়ে পেত !

পেত না পেত না। একটা বিজু একটা মধুর জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল।

মধুকে মধু করল কে ?

নিজেই তৈরি হল।

ইশ্ !

ভাবতে ভাবতে বড়ো বালতি আর মগ নিলাম। কুয়োর জল তুলে স্নান করলাম। স্নান করে সুতির শাড়ি পরে বাঁচলাম। নাইলন পরেই কাজ চালাই। কিন্তু সুতির মতো আরাম কিসে আছে?

মাথা মুছে চুল আঁচড়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়, টেবিল ফ্যান খুলে।

আসবে না, ঘুম আসবে না। মাথার মধ্যে ইঞ্জিন চলছে যেন।

তারপরেও পরীক্ষা দিলাম, পাশও করলাম সেকেন্ডে ডিভিশনে। খুব নামডাক হল। নয়ামহুলা ভেঙে দেখতে এল আমায়। মা কি বলল, দেখ! পারো পথ দেখাচ্ছে। এবার তোরাও লেখাপড়া করবি।

ইলা ম্যাডাম আমাকে একটা হাতঘড়ি দিলেন। স্কুলের হেডমিস্ট্রেস দিলেন একটা ইংরিজি-হিন্দি ডিকশনারি। বললেন, আরও পড়ো।

বিজু এনে হাজির করল ব্লক অফিসারকে। আমি তখন কুড়োল দিয়ে কাঠ চিরছি।

কোথায় তোমার ম্যাট্রিকুলেট শবর মেয়ে?

ওই যে!

ও তো কাঠ কাটছে।

বাঃ, কাঠ না কাটলে রাঁধবে কী জ্বেলে?

ব্লকবাবু তো বিস্মিত। বলে, আমরা খুব গর্বিত। ব্লকের সুনাম হয়েছে খুব। এখন কী করবে?

কী আর, পড়বে!

তা পড়ুক। আর নামটাও লিখিয়ে আসুক এক্‌সচেঞ্জে। কাজ পেয়ে যেতে পারে।

ভাগ্যে দাদার বিয়ে হল। ভাবীও ছয় ক্লাস পড়েছে।

সে সময় ভাবী না এলে আমাকে পড়া ছেড়েই দিতে হত।

খুব কষ্ট করে পড়েছিলাম উচ্চ মাধ্যমিক। বাসে যেতাম, বাসে আসতাম। ঘরে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যেত।

আমি আদিবাসী, পড়ার খরচ লাগত না। কিন্তু বই কেনা যে কী কষ্ট!

ততদিনে আমাদের জমিতে চাষ হচ্ছে। দাদাও কাজ করছে। অভাব একটু কমেছিল।

একদিন বিজুর মা বলল, কেন পড়ে পড়ে দেহ নষ্ট করছিস?

বলল, বিজু তো আর কাউকে চায় না। বিয়ে কর।

তারপর?

কষ্ট দুঃখ করে চলেই যাবে।

কষ্ট দুঃখ তো এখনও করছি মাসি!

বিজুর মার চেহারা দেখে আমার মনে হত কালো পাথরে খোদাই কোনও দুঃখিনীর মূর্তি যেন।

কঠিন মুখ, মুখে অনেক রেখা। শক্ত শরীর কিন্তু পরিশ্রমে হাতের চেটো আর আঙুল কাটা-কাটা।

দুঃখ কষ্ট তোদের সময়ে এক রকম....

হ্যাঁ, খুব কষ্ট পেয়েছ।

বিজুর বাপ ছিল বন্ধুয়া মজদুর। মনিবের জন্যে খেটে খেটে সে মরে গেল। বিজুকে নিয়ে পালালাম।

তারপর পাথর ভেঙেছি, কাঠ বেচেছি...

শবর জীবনই তো তাই মাসি।

তুই তো সে জীবন মেনে নিবি না। বড়ো ভয় করে পারো, দিকুরা কি তোকে উঠতে দেবে?

আমি উঠবই। জগৎকেও দেখাব। আর শবরদেরও দেখাব যে আমরা লেখাপড়া করতে পারি। মানুষের মতো বাঁচতে পারি। আদিবাসীর জন্যে দিল্লি থেকে কত কত টাকা দেয় জান?

কাকে দেয়?

গোরমেনকে।

যাঃ! তা কি হতে পারে?

অনেক টাকা মাসি! আমাদের জন্যে জল আর সিচাই কুয়া হবে.... ইস্কুল.... অসপাতাল...থাকার ঘর।

কাকে দেয়?

কী করে বুঝাই.....

বুঝাতে হবে না। সব জায়গায় দিকুরা... বাবুরা..... কে কাকে কী দেবে পারো? বিজু যখন কাজ পেল, নয়ামহুলায় কে বলেনি, আদিবাসী শবর। সেও রেলে কাজ পেয়ে গেল। তোর দাদা যখন কাজ পেল, তোর বাবাকে 'অফিসারের বাপ' বলছে। তুই বুঝিস না, একটা শবর মেয়ে একটা পাশ দিল, এতেই আমার ভয় করে।

ভয় করে মাসি?

ভয়ে করে। তোর জন্যে, বিজুর জন্যে, গিরধরের জন্যে। আমরা ভুখা, নাঙ্গা, মেহনতী থাকি তো বাঁচতে দেবে। কিন্তু একটু ভালো থাকলে ভাববে ওদের সমান হতে চাইছি। লেখাপড়া যত শিখিস, এরা বলবে অছুৎ!

চাকরি করবি!

মাসি, একটা শবর মেয়ে না দাঁড়ালে শবরসমাজ কোনওদিন বুঝবে না যে তারাও পারে পড়তে, কাজ করতে, মানুষের মতো বাঁচতে।

মাসি আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। নিশ্বাস ফেলল, মাথা নাড়ল। বলল, জঙ্গল চলে গেল! জঙ্গল যদি থাকত! জঙ্গল আমাদের লুকিয়ে রাখত। জঙ্গল যে নেই!

আজ বুঝি মাসি মিছে কথা বলেনি। ও সব বুঝেছিল। নইলে বলত কেন, বিয়ে করে টাউনে থাকবি, এখানে আসবি না। টাউনে নানা জাত কাজ করে। জাতপাতের হিংসে কম হবে।

মাসি! আমি তো চেয়েছিলাম নয়ামহুলায় ছোট্ট একটা সুন্দর বাড়ি বানাবে

বিজু। ছিমছাম, পরিষ্কার। দেখবে শবররা, জানবে শবর কুটির মানেই ভাঙা ঘর নয়। শবর ছেলেমেয়ে মানেই জঙ্গলে দৌড়াচ্ছে কাঠপাতা আনতে, নয় বাপ গিয়ে তাদের গাইচরি করে বাঁধা দিয়ে আসছে সম্পন্ন লোকের ঘরে। তা নয়। বিজু আর পারো যদি পারে, আমরাও পারব। আমি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলাম। নাম তো লেখানো আছে। কাজ তো পাই না, ভাবলাম শবর ছেলেমেয়েদের জন্যে পাঠশালা খুলব।

পড়তে আসবে কে?

ঘরে তো বসে থাকতে পারি না। তখন বাবার সঙ্গে মাঠে কাজ করতে যেতাম। মাটির ঢেলা ভাঙতে রোপাই করতে আগাছা নিড়াতে কী ভালো লাগত। মনে কেবল হতাশা জাগত, চাকরি কি পাব না? এমন পিছিয়ে পড়া এক আদিবাসী গোষ্ঠীর মেয়ে, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বেকার বসে থাকব উনিশশো বিরাশি সালেও? আঠারো বছর বাদে নতুন শতাব্দী আসবে, তখনও আমরা লুপ্ত অরণ্যের সন্ধানে ফিরব গায়ে-মাথায় ধুলো মেখে? পাথরই ভাঙব, কাঠই বেচব, পাতার বিড়াই বাঁধব আর বেচব? এমন সময়েই ইলা ম্যাডামের চিঠি পেলাম, চলেও গেলাম রাঁচি।

রাঁচি আমাকে অবাক করে দিল। মুণ্ডা আদিবাসী মেয়েরা ছেলেরা চাকরি করে। মেয়েরা সাইকেলে আসে যায়।

ইলা ম্যাডাম আমাকে খুব ভরসা দিলেন। নিয়ে গেলেন এক অফিসারের কাছে।

আদিবাসী, হোক সে ওঁরাও। আদিবাসী এমন বড়ো অফিসার হয়? তার সাজানো ঘর থাকে? এ তো জানতাম না।

তাঁর নাম লরেন্স মিনজ। ইলা ম্যাডাম বললেন, দেখুন! শবর ট্রাইবের একটা মেয়ে এইচ এস হয়ে বসে আছে, কাজ পায় না।

সত্যি! শবর মেয়ে? বাঃ! খুব ভালো খুব ভালো।

কী করা যায় বলুন তো?

যে অবস্থা চাকরির। ছোটো ট্রাইবগুলো মাথা তুলবে কী করে?

ওকে সাহায্য করুন। একটা শবর মেয়ে দাঁড়ালে ওঁর ট্রাইব একটা আশা পাবে।

কোন জেলা?

সাওলিয়া।

বুঝলাম। বেঙ্গল বর্ডার। তাতেই এখন অ্যানথ্রোপলজিস্টদের মধ্যে একটা.... ডক্টর ভাট আর ডক্টর বাজপেয়ী যেমন! ডক্টর ভাট তো ধরে বসে আছেন যে এরা পুরুলিয়ার খোড়িয়া শবরদেরই স্বগোত্র। ক্রিমিনাল ট্রাইব! এখন ডিনোটিফায়েড!

এরা যে কী চায়!

জার্মানি-আমেরিকা-অন্যান্য বিদেশ যেতে চায়। অ্যান্থ্রোপলজি তো এখন একটা.... এরা নতুন নতুন ইউনিভার্সিটিতে অ্যান্থ্রোপলজি ফিল্ডে ডন! মাফিয়া! টাকা চায়, ক্ষমতা চায়। ট্রাইবাল নাম জুড়ে একটা ইনস্টিটিউট বানাও আর টাকা কামাও, পাওয়ার পলিটিক্স করো।

এ কী করবে?

ঘরে যান। দেখি 'হেরাল্ড' কাগজের সিং আছে কিনা। সে ওকে ইনটারভিউ করুক, বড়ো করে একটা লাইফ স্টোরি করে দিক, সেটা দেখিয়ে কোনও কাজ....

আমার বিশ্বাস হয়নি।

• আমাদের এলাকায় কাগজ আসে শুধু বিহারীলালজির ঘরে। তাও হিন্দি কাগজ। ইলা ম্যাডাম যত্ন নিয়েছিলেন, ইংরিজিটা আমি মোটামুটি সঠিক লিখি। ওঁর উৎসাহে কয়েকটা গল্পের বইও পড়েছি। 'রবিন্‌সন ক্রুসো' পড়তে খুব ভালো লাগত। কিন্তু কাগজে লিখবে আমার নাম? বাপ রে!

ইলা ম্যাডামের বাড়ি যেমন ছিমছাম, খাওয়াদাওয়া সবই খুব ভদ্র সভ্য। ওর বাড়িতেই আমি প্রথম শ্যাম্পু লাগাই চুলে। শাওয়ারে স্নান করি। চামচ দিয়ে পুডিংও প্রথম খাই।

পরে হস্টেলে শ্যাম্পু করেছি। এত চুল আমার, সাবান ঘষতে হাত ব্যথা করে। অভ্যেসও তো বদলে গেছে, ব্রাশে দাঁত মাজি, রোজ সাবান মেখে স্নান করি।

কেশরজিৎ সিং খুব ভালো লোক। কেমন কৌশলে আমার লজ্জা ভাঙিয়ে প্রশ্ন করে আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন সব কথা। ইলা ম্যাডাম বললেন, হেরালড্ খুব বড়ো কাগজ। চারটে শহর থেকে বের হয়। বিহারে এ কাগজে খবর ছড়ায় খুব। দেখাই যাক।

'মধুমন্তী শবর—প্রাইড অফ সাওলিয়া' খবরটার খবর খুব ছড়িয়ে যায়। শবরদের অবস্থা, আমার আশ্চর্য জেদ, অথচ সরকারি ঔদাসীন্যে আমার বেকারত্ব এগুলো খুব ফলাও করে লিখেছিলেন উনি। ওঁর বুদ্ধিতে সে লেখার জেরক্স করে জেলার এস টি ওয়েলফেয়ার অফিসে পাঠাই একটা আবেদন লিখে।

শবররা তো সাওলিয়ার তিনটে ব্লকে থাকে তিনশো দশটা টোলিতে। তো নয়াটোলি ব্লকে আমাকে সোশ্যাল ওয়ার্কারের চাকরি দিল। যেতে হল সালাপুরা। অফিসার ঠিক পুলিশের মতো জেরা জুড়ল, আমি কী করে, কোন্ যোগাযোগে কাগজে খবর বের করলাম? কেন করলাম? সালাপুরায় আবেদন করিনি কেন?

ইলা ম্যাডাম লিখলেন বলে জানলাম যে শবরদের মতো বিশেষ অনুন্নত ট্রাইবের জন্যে সমাজকর্মীর পোস্ট সালাপুরাতেই ছয়টা আছে। সে সব এরা চেপে দেয়। নয়তো অ-আদিবাসী কাউকে, যারা জাল আদিবাসী সার্টিফিকেট বের করে—তাদের দিয়ে দেয়। সোজা কথা, চাকরিও চুরি করে। নয়তো আদিবাসী এলাকায় প্রাইমারি টিচার, ব্লক-কর্মী, স্বাস্থ্য-কর্মী এসব কাজ আমাদের পাবার কথা।

আমার পর এখন শবরদের মধ্যে তো দুটো গ্র্যাজুয়েট। সত্তর না পঁচাত্তর জন দশ ক্লাস পাশ করেছে। সবাই বেকার, কেউ কাজ পায় না। শবররা এক্সচেন্‌জকে টাকাও খাওয়াতে পারবে না। আর চাকরিও পাবে না কোনও দিন।

স্কুলে গেলে শবর ছেলেমেয়েদের এত ঘৃণা করে, এত!

একটা শবর ছেলেকেও আমি মাস্টারের কাজ করতে দেখিনি। শবররা আমি

গ্রামে গেলেই আসে। বলি, স্কুল ছেড়ে দিলি?

পাশ করলেও তো পরের জমিনে কাজ করব। পাথরের চৌকা কাটব। নয় ঠিকাদারের লেবার হয়ে চলে যাব। চাকরি তো পাব না। পড়ে কী হবে?

আমাদের উন্নয়নের জন্যে বিশেষ সেল্ আছে সালাপুরায়। শবর গ্রামের বাইরে টোলিতে, সেল্ সালাপুরায়। শবর, হো, ভূমিজ, চিকবারাইক সব আদিবাসী। আর আদিবাসী অফিসার সব বর্ণহিন্দু, যারা আদিবাসীকে ঘৃণা করে।

শবর এতটুকু একটা ট্রাইব। সালাপুরায় আমরা পনেরো হাজারও হব না। অথচ আমাদের ওপর রিসার্চ করে যাচ্ছে একশো অ্যান্থ্রোপলজিস্ট। ভাট, বাজপেয়ী এরা দূর থেকে কন্ট্রোল করে। ওদের তৈরি করা অ্যানথ্রোপলজিস্টরা, শুক্লা প্রসাদ দ্বিবেদী সিনহা শর্মা ত্রিবেদী, দ্বিবেদী, তারাও বর্ণহিন্দু। তারাও রিসার্চ করে।

রিসার্চ ইনস্টিটিউটও ভাটদের কন্ট্রোলে। আমরা স্ট্যাটিসটিক্স, আমরা অর্ধোলঙ্গ জন্তুর মতোই থাকব না খেয়ে। নইলে এরা কাদের নিয়ে রিসার্চ করবে?

আমি তো অন্য একটা রিসার্চের স্বপ্ন দেখছি। বিজু বলে, কতবার কাগজে 'খবর' হবে?

মোটে তো দুবার হয়েছি। সেই 'হেরাল্ড' কাগজে, আর তারপর 'গ্রাজুয়েট মধুমন্তী শবর!' এম এস সি করি অ্যানথ্রোপলজিতে। নাম চলে যাক দিল্লিতে।

তারপর ডক্টরেট?

হয়তো।

স্বামী যে ড্রাফটসম্যান?

তাতে তোমার কী?

বাঃ, বেশ কথা!

আমাদের ট্রাইবের ওপর জাস্টিস চাই বিজু।

অনেক অনেক লাড়াই করতে হবে।

করবে স—ব করবে।

তুমি না থাকলে আমি পারতাম না।

আমি যদি হিংসে শুরু করি?

কেন?

সিনেমায় যেমন দেখা যায়!

বলো না, ভয় করো।

হিংসে কাকে করব পারো? গর্বেই যে বুক ভরে যায়। জান তো, সাগর চলে আসছে।

আসছে? খুব ভালো।

আমরা তো চেষ্টাটাও করেছি দুজনে। রেলতী শবরকে হস্টেলে রেখেছি, ও দশ ক্লাস পাশ করলে নার্সিং-এ ঢোকাব। নন্দ শবরকে ক্লাস এইটের পর মোটর মেকানিকের কাজ শিখিয়েছি খরচ করে, নন্দ সুন্দর কাজ করছে এখন একটা গ্যারেজে।

আর সাগর! ওর বাবার মতো ও নিজেও বনজ ওষুধ বাকল দিয়ে পশুচিকিৎসা করে। ওকে রাঁচিতে 'আর্থ' প্রতিষ্ঠানে ছ-মাস রাখব। স্টাইপেণ্ড পাবে। প্যারা-ভেটেরিনারি ট্রেনিং নেবে। তারপর নয়াটোলাতে ওকে বসিয়ে দেব।

হাসপাতাল যা মানুষের জন্যেই ডাক্তার নেই। যদিও স্বাস্থ্যকর্মীটি ভালো। পশুর ডাক্তার কোথায় ওখানে? শবরদের না হয় গোরুমোষ নেই। বড়োজোর ছাগল বা মুরগি থাকে। কিন্তু পশুচিকিৎসক তো দরকার গ্রামে, দূরে।

এই সবই কর্মসূচীতে ছিল, আছে বিজু। একটি ছেলে পাশ করলে দৌড়ে গেছি সেখানে। ব্লকে কাজ করার সময়ে বড়ো ভালো ছিলাম। সাইকেলে ঘুরতাম শবর টোলায় টোলায়।

শবররা অবাক অবাক। শবর মেয়ে, সে গোরমেনের কাজ করে? গাছতলায় বসে লেখে গ্রামের কথা?

মানুষ কত?

আওরত মরদ বালবাচ্চা।

কা গোরমেন্‌সে কুছো সাহারা মিলা?

কুয়া আছে।

ডাগদার? স্বাস্থ্যকেন্দ্র?

বাস রোড কিত্তে দূর?

কত শবরটোলিতে ধুলোট বিকেল গড়িয়ে গেছে। নেমেছে সন্ধ্যা। তারপর আগুন জ্বেলে পাথরের গায়ে মকাই আটার লেট্টি চাপড়ে সেঁকেছি ওদের সঙ্গে, খেয়েছি। কত রাত কেটেছে ওদের প্রাঙ্গণে। তারাভরা আকাশ নেমে এসেছে কাছে। কোনও শবরের গলায় শুনছি, তখন জঙ্গল ছিল, ভুখ জানিনি।

বড়ো ভালো ছিলাম।

কিন্তু মনের নিচে উচ্চাশার দংশন। তাই প্রাইভেটে বি এ পরীক্ষা দিলাম, পাশ করলাম।

খবর, আবার আমি খবর।

'শবর ট্রাইবের মধ্যে একমাত্র মেয়ে গ্রাজুয়েট মধুমন্তী শবর।'

কেমন করে চাকরি করে বই যোগাড় করতে না পেরে নোটবই কিনে নিতাম সেকেণ্ডে হ্যাণ্ড, কখনও বিজু, কখনও ইলা ম্যাডাম, কখনও দাদা কোনও বই কিনে দিত... সাগর আর নন্দ অপ্রতিভ হেসে নিয়ে আসত কিছু আচার, কিছু ফল।

পড়ছিস দিদি! তোর তো একটু খাওয়া দরকার। ভালো করে খা।

এবার কাগজে কাগজে আমি খবর!

আদিবাসী কলেয়ান মন্ত্রী বললেন, সব তো আমার চেষ্টায়। খুব কম খাটনির চাকরি দিয়েছি। পড়ুক, ভালো করে পড়ুক।

ডক্টর ভাটকে আমি চর্মচক্ষে দেখিনি। শুনতাম, উনি শবর ট্রাইব বিশেষজ্ঞ। দেখেছি ওঁর প্রাসাদের মতো বাড়ি বাগান। কিন্তু ওখানে শবরদের মুখে আজও শুনি

আমাদের জমি নিল, লেবার নিল, টাকা দেয় সরকার, শবর কোথায় আর ও কোথায়!

শুধু কি সরকার? জার্মানি, আমেরিকা, কত দেশ!

তা ভালো, প্রেসকে বললেন, মধুমন্তী শবর গ্রাজুয়েট হয়েছে শুধু আমার চেষ্টায়।

আমাকে তখন বলতেই হল, আমি ডক্টর ভাটকে জীবনে দেখিনি। চিনি না। ওঁর কাছে আমি কোনও সাহায্য পাইনি।

তখন তো জানি না যে ওই কথাগুলো আমাকে কোনও সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাবে। জানি না যে উনি রাত শিকারির মতো বন্দুক তুলে জেগে থাকবেন। একদিন আমাকে শিকার করবেন।

ছাব্বিশে জানুয়ারি দিল্লিতে গেলাম সে বছর, ছিয়াশি সাল সেটা। সরকারি খরচে গেলাম, থাকলাম। খুব পশ্চাৎপদ ট্রাইবের মেয়ে গ্রাজুয়েট হয়েছে তো। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, আরও কারা দিলেন উপহার, সাইটেশান। আমি ভেবেছিলাম এত আয়োজন আমার জন্যে? পরে শুনেছি যে এটা সরকার করেন, করতে চান, নাম পাঠায় না রাজ্য সরকার।

রাজ্য সরকার অবশ্য আমাকে কোনও স্বীকৃতি দেননি। তবে মধুমন্তী শবরকে ওঁরা দুম করে সাতাশি সালে সালাপুরা আদিবাসী তপশীলী মেয়ে হস্টেলে সুপারের চাকরি করে দিলেন।

এটা তো অর্ডার। সরকারের চাকর, যেখানে পাঠাবে সেখানে যেতে হবে। চাকরির শর্ত শুনে আমার বুক দশ হাত বসে গেল। চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে কোনও ছুটি নেই। হস্টেল থেকে বেরোতে হলে ট্রাইবাল অফিসারের অনুমতি নেবে। আমি বললাম, করব না বিজু। দাদা, কেমন করে এ চাকরি করব?

ততদিনে দাদা মেনে নিয়েছে পারো অন্যরকম, ও স্বতন্ত্র মানুষ। স্বাধীন রোজগার ওর, ওর ভালোমন্দ ওই বোঝে।

বাবা বলত, আমার মেয়ে বি এ, আর বিজু তো তা নয়—এমন জোড় মানাবে?

দাদা বলেছিল, শবর ছেলে বি এ বা এম এ পাবে কোথায়? সে অন্য ট্রাইবে আছে।

ওই একটা বিষয়ে তো বাবা খুব কঠিন। শবর বিয়ে করবে শবরকেই।

চাকরির ব্যাপারে বাবা বা দাদা আমার ওপরেই সিদ্ধান্ত নেবার ভার ছেড়ে দিল।

আমার অভিমান হয়েছিল। কিছু বলিনি মুখে। খেলাম দেলাম, বাসে চেপে চলে গেলাম কোয়ার্টারে। বাবা বলল, এত কী তাড়া তোর? কাল তো ছুটি!

ছুটির দিনেই তো রিপোর্ট লিখি বাবা।

বাবা নিশ্বাস ফেলল।

গোরমেন অফসর পেলাম, আমার পারো হারিয়ে গেল। আমি চলে এলাম। আজ বুঝি, এই যে মনে অভিমান, চোখে জল আসত, এসব আগের পারোর হত

না। মধুমন্তী শবরের হয়। এ রকম অভিমানী হবার সময় কোথায় পায় শবর মেয়ে? ছেলে মরে যায়, মা ক-দিন বাদে পাথর-পাথর মুখে জঙ্গলে যায় কাঠ কাটতে। স্বামী মরে যায়। স্ত্রী ক'দিনে পিঠে কচি ছেলে বেঁধে মাটি কাটতে যায়। মা মরে গেলে সাত বছরের মেয়ে তারপরেও যায় দিকুদের ছাগল চরাতে।

কার ওপর অভিমান করবে? কার কাছে কাঁদবে? বসে বসে শোক করবে কেমন করে?

পেট আছে না? ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধাই তো শবর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আজ বুঝি বাবা দাদা বিজুর মা যে চুপ করে থাকত সেটা ঔদাসীন্য নয়। আমিও তো ওদের চেনাজানা পারো ছিলাম না আর।

আচার ব্যবহার জীবনযাপনে ছিলাম না শবর মেয়ে।

নিশ্চয় দাদার জন্য আমাদের পরিবারে, বিজুর জন্য ওদের পরিবারে, নন্দ শবরের পরিবারে রহন-সহন পালটে ছিল কিছু। সেটা বোঝা যায়। হ্যাঁ বাড়ি সারাবে কুয়া বসাবে বা টিউকল! শস্তার নাইলন বা একটা কেরোসিন স্টোভ, টর্চবাতি কিনবে, জুতো বা চটি পরবে। এ সব অন্য জাতির মানুষদের রহন-সহন দেখে দেখে শেখা।

দেখবে হিন্দি সিনেমা, চুল কাটবে ছেলেরা কায়দা করে। ছোট্ট একটা আদিবাসী গোষ্ঠীকে ঘিরে মূলস্রোতের মানুষরা যত এগিয়ে আসবে, তারা তো আমাদের রহন সহন সংস্কৃতি উৎসব এ সবেও মেশাবে ভেজাল।

আজ বুঝি, আমাকে দাদা, বাবা, বিজুর মা মনে করত 'খুব বদলে গেছে'। আমরা বাল্যবিবাহ করি না। কিন্তু ষোল সতেরোর মধ্যে তো মেয়েরা বিয়ে করে।

বাইশ বছর বয়সেও আমি আইবুড়ো।

মনের মানুষ আছে তবু আইবুড়ো।

চাকরির উন্নতি হবে, জীবনে নিরাপত্তা আসবে, তবে বিয়ে করব, এ ওরা বুঝত না।

ঝোপড়ি আছে কী নেই। কোদাল শাবল খন্তা ধনুক আছে, সেই তো নিরাপত্তা। এর চেয়ে বেশি নিরাপত্তা কে কাকে দেবে? কোন্ শবর মেয়ে চাইবে?

ওরা আমার নন্ শবর চিন্তাধারা বুঝত না। আমি অভিমানে মরে যেতাম। আমি চাইতাম আকাশ থেকে বজ্র ধরে আনব শবরদের জন্যে। আমি একা থাকতে চাই না। ওরা উঠে আসুক এই সরকারি আর রাজনীতিক বধ্যভূমি থেকে। জমি নেই ঘর নেই, পানীয় জল নেই, জীবিকা নেই, লেখাপড়া শিখলেও চাকরি নেই। এ দুঃসহ অবস্থা শেষ হোক।

শুধু আছে সন্ত্রাস, প্রবঞ্চনা, নির্যাতন।

পুলিশ ঢুকল গ্রামে তো শবর পালাল।

আমি যে জগতে পৌঁছেছি, সেখানেও যেন চোখ তুললেও শবর মুণ্ডা ওঁরাও সাঁওতাল হো ভূমিজ খাড়িয়া চিকবারাইক দেখতে পাই, তাই চেয়েছিলাম।

জানতাম না, আমার ওই আকাঙ্ক্ষার জগৎটাও নিয়ন্ত্রণ করছেন ডক্টর বাজপেয়ী, দূর থেকে যাঁরা দূরবীন লাগিয়ে সব দেখছেন। যাঁদের হাতে রিমোট কন্ট্রোল, যাঁরা

থাকবেন নেপথ্যে।

মঞ্চে দেখা যাবে শ্রীমতী শুক্লাকে, যিনি ইনটারভিউ না দিয়েই ডক্টর ভাটের মদতে ডিপার্টমেন্টের মাথা। দেখা যাবে ডক্টর বাজপেয়ীর প্রসাদপুষ্ট অর্জুন শর্মাকে। শুক্লা ও শর্মা করবে শবর শিকার। কেননা ভাট ও বাজপেয়ীর মধ্যে সাওলিয়ার সালাপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা দখলের হাড্ডাহাড্ডি সংঘর্ষ জারি হ্যায়, ওদের এজেন্টদের মধ্যেও। জানতাম না জানতাম না।

জানতাম না।

বিজু বলল, নিয়ে নাও চাকরি। মোহনপুরা কত কাছে বলো? আর ওখানে ইউনিভার্সিটিও আছে। তুমি যদি...

ইলা ম্যাডাম বললেন, পড়ার খুব ইচ্ছে, পারো?

খুব।

কিসে?

অ্যানথ্রোপলজিতে।

রাঁচি আছে পাটনা আছে, রাঁচি তো....

এই নতুন ইউনিভার্সিটিগুলো তো নোংরা পাওয়ার পালিটিক্সের আড্ডা। বিহারে শিক্ষার পরিবেশ এমন...

না ম্যাডাম, আমি পারব।

ঘুমোচ্ছে না, ভাবছ?

এসে গেছ বিজু?

পনেরো মিনিট।

বুঝতে পারিনি।

খেয়েছ কিছু?

খিদে পাচ্ছে।

চমৎকার সামোসা এনেছি। ঝটপট করো তো!

গোপাল, ইন্দ্রা, কিশোর, রেওতী, সবাই সিনেমা হলে আসছে, চলো যাব।

কী ছবি?

নাম তো মনে নেই। সঞ্জীবকুমার নয়টা রোলে, হাসির ছবি।

উঠলাম। চা বানালাম। চা আর সামোসা খেলাম। চুলটা আলগা বেণী করলাম। কাপড় বদলে নিলাম। বিজু বলল, বম্বে চলে যা মধু। সিনেমা কর।

কেন, সেই অরুণ রাইয়ের কী হল? যে শবর ডকুমেন্টারি বানাবে, আমাকে কেন্দ্র করে?

সেও আসবে ফাংশনে। শবর বিয়ের ছবি তুলবে। ভাবা যায়! এবার ফাংশন হবে। সোশ্যাল ম্যারেজ।

সোশ্যাল ম্যারেজ আবার কী? রেজিস্ট্রি বিয়ে কী অ্যান্টিসোশ্যাল ম্যারেজ?

বোঝাও না মাকে, তোমার বাবা দাদা দিদিদের শবরদের।

ইন্দ্রা এল কী করে?

তিন দিন ছুটি না?

সিনেমা হলে গোপাল বলল, আইডিয়া! আইডিয়া।

কী?

আগে রেমুটোলি ম্যারেজ! তারপর মোহনপুরায় মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল সকলের কাছে চাঁদা নিয়ে একটা ট্রাইবাল ম্যারেজ! কাস্টমের কিছু কিছু নিয়ে আমরা, যারা দূরে শহরে থাকব, একটা কমন ট্রাইবাল ম্যারেজ সিস্টেম তৈরি করব।

ইন্দ্রা বলল, বুঝেছি। এখন ছবি দেখি চলো। মধুমন্তী, অনেক টাকা কামাতে চাও?

কেমন করে?

হাজার হাজার! শুধু চুলের তেল-শ্যাম্পু হেনতেনর বিজ্ঞাপন করে।

আমি হেসে বাঁচি না।

আরে ইন্দ্রা, বিজ্ঞাপনে কখনও কালো, গাঁওলি, ট্রাইবাল মেয়ে দেখায়?

ওহি তো!

ইন্দ্রা। কী সুন্দর নাম।

গোপাল হেসে ফেলল, বলল, ওর মায়ের হঠাৎ ব্যথা উঠল, ইঁদারার পাড়ে মেয়ে হয়ে গেল তো নাম দিল ইঁদ্‌রা। সেটাই এখন ইন্দ্রা! চলো চলো, ভেতরে বসি।

কী আনন্দ করে ছবি দেখলাম। মোমফালি খেলাম সবাই। তারপর গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরলাম। ফেরার পথেই বিজু আর আমি রুটি-তড়কা কিনে নিলাম। কে রাঁধবে রাতে? বিজুকে বললাম, কাল মুরগি আনবে, মাছ আনবে, আমার জন্যে ডিম।

এত?

বাঃ, ছুটির দিন না! দিনে মাছ খাবে, রাতে মাংস।

তোকে নিয়ে যে কী করি মধু! শবর মেয়ে মাংস মাছ খাস না!

ডিম তো খাই!

খেয়েদেয়ে শরীর ভালো কর তো?

সেপ্টেম্বরে ফাইনাল পরীক্ষা, বিজু। তারপর নিশ্চিন্ত হব।

হ্যাঁ, সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা, নভেম্বরে ফাংশান। এবার বড়ো কোয়ার্টার না পাই, ঘর ভাড়া করে নেব।

দরকার কী? এমন পড়শী পাব?

একটা ঘরে কী হয়?

একটা ঘরে কষ্ট করে থাকব, টাকা জমাব, বাড়ি করতে হবে না? আমাদের রেওতী, রেওতী শবরকে তো কিছুকাল খরচ দিতে হবে।

থাক ওসব কথা, ঘুম পাচ্ছে তোর।

আমরা শুয়ে পড়লাম। বিজু ঘুমিয়ে গেল, আমিও একটু ঘুমিয়েছিলাম বোধহয়, তারপর ঘুম ভেঙে গেল।

এমন না ঘুমিয়ে কত রাত কাটাব?

॥ ৪ ॥

১৪-৮-৯২।

রাত তিনটে? চারটে? জানি না।

এই রকমই অতন্দ্র কেটেছিল সেই রাত, যেদিন কেশরজিৎ সিং এলেন ইউনিভার্সিটি আর আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, তুমি এখানে?

মিসেস শুক্লা বললেন, চেনেন?

বাঃ! আমিই তো হেরাল্‌ডে প্রথম লিখি ওর ওপর। কেমন আছ মধুমন্তী?

ভালো। আপনি?

এখন আমি আরও বড় কাগজে, টাইম্‌সে। সালাপুর হয়ে দেওরিয়া যাচ্ছি। সেখানে....

হ্যাঁ....

হরিজন কিলিং। বিহারের ট্রাডিশন!

মিসেস শুক্লা ও অন্যরা চুপ। আমি ওঁদের দেখছি।

চলো মধুমন্তী, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করাই। কী পড়ছ?

অ্যানথ্রোপলজি।

মিসেস শুক্লা! আপনারা খুব সৌভাগ্যবান। এই প্রথম একটা শবর মেয়ে এত পড়ছে। স্পেশাল কেয়ার নিচ্ছেন তো? শি ইজ এ স্পেশাল কেস!

হ্যাঁ...নিশ্চয়....

চলো মধুমন্তী।

গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে উনি বললেন, একটা নিউজ তো করে দেব। কিন্তু তোমার চোখে একটা পর্দা কেন? কী লুকিয়ে রাখছ? কী দুঃখ পাচ্ছ?

হায় কেশরজিৎজি! সেদিন যদি বলতে পারতাম, যদি মুখ খুলতাম!

এই দীপা! এই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করো। মধুমন্তী শবর—খুব ভালো মেয়ে।

তুমি তো লিখেছিলে ওর কথা!

দাঁড়াও, তোমার একটা ছবি নিই ওর সঙ্গে, মধুমন্তীর একটা! কী মধুমন্তী, বিয়ে করবে না? কী ভাবছ?

করব স্যার।

কাকে?

গাঁয়ের ছেলে, বিজু শবর।

ভেরি গুড। কিন্তু তুমি বললে না।

আপনার ঠিকানাটা দেবেন?

এই নাও কার্ড।

সার, কখনও সুযোগ পেলে জানাব। এখন কিছু বললে আমায়....

নিশ্বাস ফেললেন উনি। বললেন, কাস্‌ট আর কাস্‌ট! এর নাম বিহার! একটা নন্‌-কংগ্রেস গভরমেন্ট! চলি মধুমন্তী, জানিও। আমরা তোমার ভালো চাই।

হ্যাঁ সার।

অর্জুন শর্মা আর মিসেস শুক্লা তাকিয়ে থাকল। আমি হেঁটে ক্যান্টিনে চলে গেলাম। ভানু, জগৎ, চিত্রা, শমসের, দলপত, অমর, আমার আপনজনেরা চেঁচিয়ে উঠল, দিদি আবার নিউজ হবে!

যাঃ! তোরা যে কী বলিস!

উনি তো দীপা সিং। টিভি-তে ইকোলজি নিয়ে বলেন, খুব বিদুষী।

তা হবেন।

বড়ো জার্নালিস্টের বউ।

চা খাওয়াবি কেউ?

চা খেয়ে, গল্প করে কাটালাম সময়টা।

কী বলতাম আমি কেশরজিৎ সিংকে? বলতে পারিনি। লিখতে বসেছিলাম। মনে মনে ওঁকে মস্ত চিঠি লিখে ফেলি আজ, চোদ্দই আগস্টের রাতে। সেদিনই লিখতে বসেছিলাম রাতে। মাথায় যন্ত্রণা হতে থাকল। ভীষণ যন্ত্রণা। লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি। সেদিন একটা খাতার সব পাতাই অমনি করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে ফুরিয়ে গেল।

মাথার যন্ত্রণা আগেও হত। পরে যখন বেড়ে গেল, মনে পড়ছে চলে গেলাম রাঁচি। ইলা ম্যাডামের কাছে থাকলাম, চোখ দেখালাম, চশমা নিলাম। কিন্তু তারপরেও মাথায় চাপ-চাপ যন্ত্রণা হয়।

যেই মোহনপুরা আসব ঠিক করলাম, সেই যন্ত্রণা চলে গেল। ঠিক করতে দেরি হয়ে গেল বলেই তো এত কষ্ট পেয়েছি। কাল রাতে জেগে ছিলাম, আজ রাতে জেগে আছি, কালও জেগেই থাকব। ডাক্তার বলেছিল, মিস শবর! অত্যন্ত মানসিক চাপে, স্নায়ু-চাপে ব্রেন এমন হয়ে যায় যে ঘুম আসে না। তেমন হলে আপনি খুব নিরাপদ কোনও ঘুমের ওষুধ খাবেন?

আমি বললাম, লিখে দিন।

প্রেসক্রিপশান নিলাম, বাইরে এসেই ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। পারোর কোনও ঘুমের কষ্ট ছিল না। আর খুব দরকার পড়লে মাকি শবর এসে যেত। নয় সাগরের বাবা মইদাল শবর। বাবা তো এখনও তার কাছে ওষুধ আনতে যায়।

আমি জেগে আছি যখন, আপনাকে চিঠি লিখে জানাই। কিন্তু ষোলই যাব রেমুটোলি, আর বাড়িতে নিয়ে যাব বলে কিনব সুজি, বেসন, পাঁপড়। কাল বড়ো ব্যস্ত থাকব, জানেন?

মনে মনেই লিখি। আপনি তো জানতেন না, শবর মেয়েটাকে 'খবর' করে দিলেন। তারপর কী কী হল তার। পথের পর পথ হাঁটতে হাঁটতে সে পৌঁছে গেল বধ্যভূমিতে, যেখান থেকে বেরোবার পথ একটাই। কিন্তু দেখুন না, বড়ো চিঠি লেখার সময় নেই।

বিজু ঘুমোচ্ছে। উপুড় হয়ে ঘুমোয় শিশুদের মতো। কি ঘন আর কোঁকড়া ওর চুল, কী চওড়া কাঁধ, শক্ত হাত, চওড়া বুক।

জানেন, সুপারের চাকরি মানে যে বন্ধুয়া মজদুর হয়ে যাওয়া—তা আমি জানতাম না। এটাও জানতাম না, হস্টেলে আদিবাসী ছাত্রী, স্টাফ, সবাই কী ঘৃণা করে আদিবাসীকে। আদিবাসী আর হরিজন, তাদের কেউ সুপার হবে?

অথচ হস্টেলটা তপশিলি জাতি ও আদিবাসীরই জন্য। আমি তো জানতাম না, নির্যাতন কোথা থেকে শুরু হবে। যে চাকরি, তাতে আমার ওপরওয়ালা আদিবাসী কল্যাণ অফিসার দয়াল শর্মা। 'শর্মা' পদবি, বিহারের ব্রাহ্মণ। বুঝতেই পারছেন, আমাকে ও কী চোখে দেখে।

জানতাম না, এই পদে আর একজনকে ঢোকাবার জন্যে ওর খুব চেষ্টা ছিল। কিন্তু 'প্রথম শবর গ্রাজুয়েট' মধুমন্তী শবরকে এই চাকরি দিয়ে সরকারও হাত ধুয়ে ফেলে দিল, আমি ওর গলায় বিঁধে রইলাম।

ভেবে পাই না, এস সি এস টি মন্ত্রকে আদিবাসীদের কেন নেয় না! সাদা চামড়ার মানুষরা কালো মানুষদের এত ঘেন্না করে!

হস্টেলে ওর গুপ্তচর গঙ্গা ছেত্রী, মেট্রন। আমি বাজারে গেছি, ও রিপোর্ট করল। শর্মা ডেকে পাঠাল।

কোথায় গিয়েছিলে হস্টেল ছেড়ে?

'গিয়েছিলেন' বলবেন।

তুমি সহবত শেখাবে আমাকে?

'আপনি' বলবেন। নইলে আমিও 'তুমি' বলতে বাধ্য হব।

ও ঢোক গিলে বলেছিল, আমার পারমিশান ছাড়া আপনি হস্টেলের বাইরে যেতে পারেন না।

মার্কেটিং-এও নয়?

না।

এখান থেকে শুরু। এরপর মোহনপুরা যেতে পারমিশন, সিনেমা যেতে পারমিশন, আর ফোন করলেই হয় শুনি ও নেই। নয় শুনি, লিখিত আবেদন দিতে হবে।

প্রথম দিনই যুদ্ধ ঘোষিত হয়, যে লড়াই জারিই থেকে গেল।

আমি আসার আগে কোনও সুপার ছিল না। মেট্রনই চালাত। কিন্তু এ কী জাঁতাকলে ফেলল আমায় সরকার? বছরে ছুটির মাসগুলোতে হস্টেল ফাঁকা থাকুক, আমাকে থাকতে হবে।

একবার বাবার পেটে খুব যন্ত্রণা, বুড়ো বয়সে অ্যাপেনডিকস কাটাতে হল।

দাদা আর বাবা একটা রাত ছিল আমার ঘরে, পরদিনই হাসপাতালে নিলাম। মিশন হাসপাতাল ছাড়া তো আদিবাসীর ভরসা নেই!

পরদিনই শর্মা ডেকে পাঠাল।

ঘরে পরপুরুষ নিয়ে রাত কাটাবার জন্যে আপনাকে চাকরি দিয়েছে সরকার?

মুখ সামলে! আমার বাবা আর দাদা এসেছিলেন।

আদিবাসী ঔরতের তো....

আমি পেপারওয়েট মুঠোয় তুলেছিলাম। বলেছিলাম, আমি কাউকে ঢোকাতে হলে দিনদুপুরে সদর দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকাব, আদিবাসী তো!

আপনার মতো মেট্রনের সঙ্গে রাত কাটাতে যাব না।

ভীষণ চেঁচিয়ে বলেছিলাম, জাতের বড়াই করেন, বড়োলোক শ্বশুরকে ভয় পান, মেট্রনের সঙ্গে থাকার জন্যে বাজারে ঘর নিয়েছেন কেন? আপনি লিখিত ভাবে ক্ষমা চাইবেন।

যন্ত্রণাটা কোথায় জানেন? পাঁচ বছর ধরে ওর হাজারটা জুলুম আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে পাটনায় লিখেছি, দৌড়ে গেছি বার বার।

কোনও প্রতিকার পাইনি।

শর্মা আর মেট্রন তো জানে, আমি প্রতিকার পাব না। মেট্রন রিপোর্ট করে চলে, শর্মা পাটনায় জানিয়ে চলে, রিমোট কন্ট্রোল ওদের হাতেও। পাটনায় কত বলেছি, আমার এ চাকরির দরকার নেই। ভারতে কোনও সরকারি কর্মী সারা বছর চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি করে না।

আপনাকে লিখলে কাগজে বেরোত, কিন্তু আমার চাকরির বারোটা বেজে যেত।

সব ছেড়ে দিয়ে মাটি কাটতে চলে যাইনি কেন?

কেন যাইনি কয়লা খাদানে?

পারো পারত, মধুমন্তী পারেনি।

মধুমন্তী শবরদের জন্যে সূর্য ছিঁড়ে আনতে চেয়েছিল।

চাকরি নিয়েই ছিন্নভিন্ন। এই আমি আরও ওপরে ওঠার জেদে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম।

জেদের বশে জানিয়েছিলাম পাটনায়। আমাকে পড়ার সুবিধে দিতে হবে। মেয়েরা কলেজে যায়, সে সময়েই ক্লাস করতে যাব। তারই কপি শর্মাকে পাঠাই।

কেন যেন অনুমতি পেয়ে গেলাম।

এরপর কি শর্মা ও গঙ্গা ও হস্টেল বনাম আমার লড়াই থেমেছে? না। ঠাণ্ডা লড়াই জারিই আছে। এখন অন্য কৌশল লড়াইয়ের। ইউনিভার্সিটির পর ফিরি যখন, প্রত্যহ অ-আদিবাসী ছাত্রীদের অভিযোগ শুনতে হয় শর্মার টেলিফোন মাধ্যমে।

ওদের বাথরুমে জল ছিল না।

ওদের খারাপ আটা খাওয়ানো হচ্ছে।

ওদের বাসনে হরিজন মেয়েদের খেতে দেয়া হয়।

আমি জবাব দিই।

মালীকে বললেই পাম্প চালাত।

আটা কেনে মেট্রন।

হরিজন মেয়েরা নিজেদের বাসন মেজে ঘরে নিয়ে আসে।

রিসিভার নামিয়ে রাখি। আবার তুলবে কে?

ইউনিভার্সিটিতে? প্রথম দিনেই শ্রীমতী শুক্লা বললেন, তোমাদের জন্যে ডক্টর ভাট কত পরিশ্রম করেছেন। তাতেই তুমি পড়তে পেরেছ,—এটা মনে রেখো, কেমন?

ম্যাডাম, ওকে আমি চোখেই দেখিনি।

ও! ঠিক আছে, ক্লাসে যাও।

তখন তো জানি না কিছু। সহপাঠিনী রিমা পাসোয়ান রাঁচিতে পড়ত। যথেষ্ট নাক চোখ কান খোলা মেয়ে। ও বলল, এই! মুটকি ডক্টর ভাটের ক্যান্ডিডেট। জান, কী ভাবে চাকরি পেয়েছে, হেড হয়েছে?

জানতাম না। জানতাম না, আমরা 'লেখাপড়া' শব্দটা থেকে অনেক দূরে থাকতাম, একটু একটু করে কাছে আসছি। 'লেখাপড়া' বিষয়ে শ্রদ্ধাও অনেক। তাই রিমার কথা খুব কানে বিঁধেছিল সেদিন।

আর একজন আছে, অর্জুন শর্মা! সে হল ডক্টর বাজপেয়ীর ক্যান্ডিডেট। সে ওই মুটকির অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। মার খেল। ছি ছি! অধ্যাপককে মারল কে? মুটকির চেলাচামচারা।

তুমি অ্যানথ্রোপলজি পড়ছ?

আর বোল না। বিয়ে ঠিক হয়ে আছে অনেক দিন। কিন্তু বরের জেদ এম এ পাশ মেয়ে চাই। আমি এ সাবজেক্ট পড়ব না, ভালো লাগে না।

এম এ পড়বে না?

পড়ে নেব কোনও সাবজেক্ট। বিয়ের জন্যে তো, নইলে পড়ত কে?

তুমি চাকরি করেও পড়ছ কেন? বিয়ে হয়নি বুঝি?

হয়ে যাবে এবার।

ক্লাসে চলো। আরে, তোমার খবর কাগজে বেরিয়েছে। তোমার নাম জানে সবাই।

ক্লাসে ঢুকছিলাম, যেন কোনও পবিত্র গড়ামে যাচ্ছি। আমরা গাছকে পূজা করি, গ্রামদেবতা বা গড়াম বলি। বনে ভক্তি, সমীহ, শ্রদ্ধা।

অর্জুন শর্মা সিগারেট নিভিয়ে ক্লাসে ঢুকেছিল। খাতায় আমার নাম দেখে বলেছিল, মধুমন্তী শবর? শবর মেয়ে তো এখানে কেন? ছাত্ররা! শবর মেয়ে দেখেছ? চলে যাও নয়াটোলি ব্লকে, সেখানে দেখতে পাবে। ওরা জঙ্গলে যায়, কাঠ কাটে, মাটি কাটে, পাথর ভাঙে।

আমি হতবাক।

তা পড়বে, না ভেগে যাবে?

আমি এস-সি এস-টি হস্টেলের সুপার, স্যার! চলে যাব কেন?

শবর পদবি, আদিবাসী, এম এস সি হবে?

ছাত্রছাত্রীরা নীরব। সেদিন ভানু ক্লাসে ছিল না। আমার মনে হল, বুকের ভেতরে বাতি নিভে গেল। অধ্যাপক এভাবে কথা বলে?

পরদিন ওর ক্লাস ছিল না। কিন্তু তার পরদিন ও ক্লাসে ঢুকেই বলল, শবররা তো ক্রিমিনাল।

আমি বললাম, তার মানে?

বুঝিয়ে দিচ্ছি। বেঙ্গলে, সাওলিয়া বর্ডারে পুরুলিয়ার খোড়িয়া শবর সব ক্রিমিনাল। তোমরাও ক্রিমিনাল ট্রাইব।

না, উইথড্র করুন!

আরে, এটা আমার রিসার্চ।

কিন্তু এটা মিথ্যে। আমরা ক্রিমিনাল ছিলাম না। বিমুক্ত গোষ্ঠীও নই।

অর্জুন শর্মা বলল, তুমি চেঁচালেই হবে? ট্রাইব কী, তা ট্রাইব জানে? অ্যানথ্রোপলজিস্ট্ জানে।

সার, অ্যানথ্রোপলজিস্টরা কোন্ ট্রাইব?

ভানু কুমার বলেছিল, আমি ট্রাইব?

ট্রাইব মানে তাদের মধ্যে অনেক মিল। আপনাদের মধ্যে এত মিল!

বন্ধুগণ! ক্লাস ছেড়ে চলো। এসো মধুমন্তী দিদি। দিদি বলছি, তুমি আমাদের দিদি। চোখ মোছো।

কী করে এর ক্লাস করব?

হেডকে বলো।

বলেছিলাম। মিসেস শুক্লা মৃদু হাসলেন। বললেন, অর্জুন কী পাগল! ওটা তো ডক্টর ভাটের সাবজেক্ট।

আমাকে জাত তুলে কথা বলবেন?

এটা ঠিক নয়।

আপনি ওকে কিছু বলবেন না?

অত সোজা নয় মধুমন্তী। এ সব ইউনিভার্সিটির নিয়মে করতে হয়। কিন্তু আমি ওকে তাড়াতে চাই।

আমি হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসি। সেদিনই মনে হল, এটা শিকার পর্ব। যা পুরাণে বড়ো করে লেখা হয়নি। একলব্যের আঙুল কাটতে হয়নি দ্রোণাচার্যের হুকুমে? শম্বুককে মরতে হয়নি রামের নির্দেশে? নিচুতলার মানুষ লেখাপড়া জানতে গেলে, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হলে ওপরতলার সমাজ তাদের শিকার করবেই।

আমাকে কেন, আমাকে কেন, আমাকে কেন?

রিমা বলল, ও ম্যাড! তুমি আমল দিও না।

ভানু বলল, জন্‌তা সরকার! জাত নিয়ে কথা বলবে?

অর্জুন শর্মাও জানে যে জনতা সরকার। মণ্ডল কমিশনের ব্যাপারও আছে, আর আমাদের দলিত ছাত্র সংগঠন অল ইনডিয়া সংগঠন। এখানে ও তাকেই বলছে, যে আদিবাসী। সে হরিজন নয়।

আমি বললাম, হরিজন নির্যাতন তো বন্ধ হয় না?

সে তো গরিব হরিজনদের মারে। আমাদের মতো ধনী হরিজনদের মারবে?

ভানু বলল, ভেবো না তো দিদি! লাইব্রেরী চলো, বই থেকে নোট করো।

দলপত্ বলল, বইয়ে কী হবে? নলেজ বাড়বে। পরীক্ষা পাস করতে হবে ওদের নোট পড়ে। আমরা সেগুলো যোগাড় করে দেব।

এরপর অর্জুন শর্মা শুরু করলেন—ক্লাসে আসি, খাতায় অ্যাবসেন্ট দেখান। হস্টেল থেকে আসতেও সময় লাগত। স্টোর পারচেজের দিন কামাই হয়ে যেত।

মিসেস শুক্লা বললেন, পরীক্ষা তুমি দিতে পারবে। পার্সেণ্টেজ আমি ব্যবস্থা করে দেব।

আমি তো স্পেশাল ফেভার চাই না ম্যাডাম। ক্লাস করেছি, পার্সেণ্টেজ চাই।

কমিটিতে কথাটা ওঠাব।

প্লিজ ম্যাডাম। আমার একটা বছর নষ্ট হলে বড্ড ক্ষতি হবে।

সেই ক্ষতিই হল। শ্রীমতী শুক্লা কোনও ব্যবস্থা করলেন না। আমার পরীক্ষায় বসা হল না।

ম্যাডাম আমাকে বলেছিলেন, রাগ হচ্ছে আমার ওপর? আমার হাতেই তোমার ভবিষ্যৎ। তুমি ওর কথা নিয়ে এত গুরুত্ব দিও না।

পরীক্ষা তো দেয়া হল না।

আমি তোমায় দেখব মধুমন্তী।

উনিও দেখেননি। অর্জুন শর্মাও তার অপমান করা ছাড়েনি। দু-বছরের ইতিহাস কী বলব! কর্মজীবনে শুধু অন্যায় সইছি, এখানে শুধু অন্যায় সইছি। বিয়ের পর বিজু বলল, ওরা তোমাকে ঘুঁটি করে দাবা খেলছে মধু। তুমি কমিটিকে জানাও।

কমিটিকে জানাই, পাটনায় জানাই, অ্যাসেমব্লিতে কথা ওঠে, তদন্ত কমিশন নথিযুক্ত হয়। ডক্টর ভাটের রিমোট কন্ট্রোল গঠিত কমিটি তো। তিনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরাসরি নেই, কিন্তু তিন অধ্যক্ষের তদন্ত কমিটি ওঁকে ডাকল আগে।

আর লিখতে পারছি না কেশরজিৎজি! রিপোর্ট বেরোচ্ছে না, অর্জুন বলে, রিপোর্ট বেরোবেও না, তোমাকে পরীক্ষা দিতেও দেব না।

এখন শ্রীমতী শুক্লা আমাকে চাপ দিতে শুরু করলেন, তদন্ত কমিটি দেরি করছে বলে তুমি পালটা কেস করো!

ভেবে দেখি।

ভেবে দেখবে কী? কেস করো, অর্জুন শর্মাকে তাড়াই তোমাকে সামনে রেখে। ব্যস্! সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা দাও মনের আরামে। নইলে—আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না।

বিজুকে বললাম সব। কিশোর, গোপাল, বিজু আর আমি আলোচনা করলাম। ওরা বলল, এটা ঠিক হবে না।

সে কি আমিই বুঝিনি? সরকারের কর্মী আমি, আমার কথায় সরকার একটা তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করেছে। সেই কমিশন দেরি করছে বলে আমি সালাপুরা কোর্টে কেস করব? সেটা তো সরকারের বিরোধিতা করা হবে।

মনের এমন অবস্থাতেই বিজুকে বললাম, মিসেস শুক্লাকে চটালে পরীক্ষায় বসার কোনও মানেই হবে না। রিপোর্ট না বেরোলে মনও শান্ত হবে না। এরা দু-জন, মিসেস শুক্লা আর অর্জুন শর্মা আমাকে বাঁচতে দেবে না।

কাজ ছেড়ে দে মধু।

কী করে?

বিয়ে হয়ে গেছে আমাদের, গরিব ভাবে চলেই যাবে। অন্য কাজ পেয়ে যাবি তুই।

ডিপার্টমেন্টেও তো ঝগড়া। ছাড়তে চাইলে ছাড়তে দেবে না। আর....পরীক্ষা?

আমি তোর মতো বিদ্বান নই। কিন্তু পরে রাঁচি গিয়ে পড়তে পারবি। নয় ভাওনগর। ওখানে এমন ঝামেলা নেই।

ভেবে দেখি বিজু।

তোর বাবা, গিরধর ভাইয়া, আমার মা, সব মনে দুখ্ হয়ে আছে....

এবার যাব। ফাংশনের ব্যাপারটা....

তোরও তো ইচ্ছে খুব।

খুব সাধ। বিয়ে হবে বিয়ের মতো।

তাই হবে তাই হবে। এখন দুঃখ হয়।

কেন?

তোর তুলনায় আমি কি?

কেউ বলেছে?

সবাই বলে।

ওরা কী জানবে! আমি জানি তুমি কী, তুমি জানো আমি কী!

হ্যাঁ....তাই....

চলো ষোল তারিখে যাই গ্রামে।

কোন মাসে?

আগস্টে, বুদ্ধু! রবিবার ডিউটি থাকবে তোমার, সোমবার যাব।

তাই যাব।

চাকরি করতে করতে তুমিও যদি পড়তে! তাহলে আজ আমাকে এত দৌড়াতে হত না। সব তো বুঝতে পারি না, যাই ডাক্তারবাবুর কাছে, মিশন হাসপাতালের মেট্রনের কাছে।

বিজু অমনি বলল, পড়ব এবার।

আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

প্রত্যেকদিন ভেবেছি রিপোর্ট বেরোবে, বেরোয়নি। তেরই আগস্ট, পি এইচ ডি-র সেমিনার। আমার যাবারই কথা নয়। মিসেস শুক্লা বললেন, তুমি থেকো। কথা আছে।

কী কথা থাকতে পারে? 'কেস করব না' জানিয়ে দেবার পর থেকেই উনি খুব দূরে সরে গেছেন।

আমিও ওঁকে এড়িয়ে চলি। লাইব্রেরিতে ঢুকে যাই, নোট করি। ভানুদের সঙ্গেও বেশি কথা বলি না।

অর্জুন শর্মার কথা তো সবাই জানে।

মিসেস শুক্লার চাপ দেবার কথাও কি জানে না? জানে, জানে।

নইলে সেদিন কমল ভার্মা হঠাৎ বলল কেন, ডক্টর শুক্লার মতো শুভানুধ্যায়ী পাবেন না দিদি।

বুঝি না, বুঝতে পারি না এখন।

তেরো তারিখ যখন ইউনিভার্সিটি যাই, সসংকোচে বসলাম পিছনে, এক কোণে।

ওখানে আমার থাকার কথাই নয়। অধ্যাপকরা আমাকে 'চলে যাও' বলছেন না কেন?

সবাই কেন এ-ওর দিকে তাকাচ্ছেন?

আমি মুখ নিচু করে বসে আছি।

হঠাৎ অর্জুন শর্মার গলা কানে এল, এখন প্রমাণ হল তো যে দিজ্ শবরস্ আর অফ দি খেড়িয়া শবর ট্রাইব অফ বেংগল। লাইক দেম, দে আর ক্রিমিনাল্স্।

সবগুলো মুখ আমার দিকে ঘুরে গেল।

আমি উঠলাম, বেরিয়ে গেলাম। করিডোরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম চোখ বুজে।

কানের কাছে নিচু গলায় ধারালো শ্লেষে বিষাক্ত কথার ঝাঁক ঝাঁক গুলি। এখন বুঝছ, রিপোর্ট বেরোচ্ছে না? বুঝছ, ইউ ক্যান ডু নাথিং টু মি? বুঝছ, সেপ্টেম্বরে ইউ আর নট সিটিং ফর দি এক্জাম?

আমি মাথা হেলালাম।

আমাকে চটানো ঠিক হয়নি তোমার।

আমি মাথা হেলালাম।

অবশ্যই ওরা কারেকট।

এই শর্মারা, শুক্লারা, ভাটরা, বাজপেয়ীরা।

শবর, কেরকেটা, হাঁসদা, টোপনো, জোংকো ট্রাইব কখনও কারেক্ট হতে পারে?

মধুমন্তী, আমার ঘরে এসো।

মিসেস শুক্লা। আমার হাত ধরেই ঘরে ঢুকলেন, আর বললেন, লাস্ট চান্স

দিচ্ছি। কেস করবে তুমি, নইলে....

আমি হাত ছাড়িয়ে নিলাম।

চলে যাচ্ছ যে? কেস করবে?

প্রত্যেকটি শব্দ বন্দুকের গুলি।

আমি মাথা হেলালাম।

তারপর বেরিয়ে এলাম। আশ্চর্য, মাথা থেকে চাপ-চাপ অন্ধকার নেমে যাচ্ছে। আলো, উজ্জ্বল আলো।

আগে কেন বুঝতে পারিনি?

ভোর হয়ে গেল।

॥ ৫ ॥

সকাল থেকে ঘর পরিষ্কার করল মধুমন্তী, কাপড়, বিছানা কাচল। রোদে দিল।

বিজু বাজার করে আনল।

রান্না, খাওয়া, শুয়ে পড়া।

চোখ বুজে জেগে থাকা।

আর পারোকে দেখা।

পারো জঙ্গলে যায়, মাটি কাটতে যায়। মাথায় করে বোঝা নিয়ে হাটে যায়।

পারোকে কেউ শিকার করবে না। ও তো পড়তে যাচ্ছে না, নাইলন পরে চাকরি করছে না, ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে না।

নাকি যাচ্ছে?

এ পারো, যাস না যাস্ না।

কেন যাব না?

তোকে শিকার বানাবে।

ইশ্, আমি তো মিস্ত্রির জোগাল কাজ করতে যাচ্ছি।

তোর মতো পড়তে যাচ্ছি?

আমিও জোগাল হয়ে যাব?

পারবি না। ভুলে গেছিস সে জীবন।

আবার রাত ভোর হল।

॥ ৬ ॥

সকালে, খুব সকালে বিজু ডিউটিতে বেরিয়ে গেছে।

খসখস করে লিখছি আমি খাতায়। সময় নেই, সময় নেই।

আজি বিজু ফিরবে। রেমুটোলি যাব। যাব না।

সময় নেই, সময় নেই আমার।

কাগজটা টেবিলে রেখে একটা তালা দিয়ে চাপা দিলাম।

স্নান করেছি, চুল বেঁধেছি, কাপড় পরেছি।

জানলার পর্দা টানলাম। দরজা বন্ধ করলাম।

কুয়োর দড়িগাছা হাতে নিলাম। বিছানার ওপর চেয়ার। চেয়ারে দাঁড়ালাম। গলায় ফাঁস নিলাম। ছাতের হুকে দড়ি গলালাম।

চেয়ার পা দিয়ে ঠেলে দিলাম। বিজু, আমায় মাপ কোরো।

মহাপুরুষ

"নন্দালয়" বাড়িটার ওপর থেকে নিচ রং করা হয়েছে। এ বাড়ির দশতলাটি সমস্তটা জুড়ে একটা ফ্ল্যাট। প্রতি তলায় বড় বড় চারটি ফ্ল্যাট। প্রত্যেকটি দু'হাজার বর্গফুটের। দশতলায় আট হাজার বর্গফুট জুড়ে আবাসকক্ষ, উপাসনা গৃহ, ব্যালকনি।

ব্যালকনিতে গাছপালা এমনভাবে সাজানো যে ছোট্ট একটা বাগানে দাঁড়িয়ে আছি বলেই ভুলে হয়ে যায়। নন্দলাল সিং পয়সা খরচ করতে ত্রুটি করেনি। দশতলায় নেই হেন বিলাস-সামগ্রী। সাধে কি বছরভোর এখানে দূরদর্শন সিরিয়ালের শুটিং চলে?

নন্দালয় বাড়ির দোতলায় আপিস। সেখানে গেলেই দেখা যায় ঝকঝকে ব্রোসিওর। তাতে লেখা আছে কি কি দূরদর্শন সিরিয়ালে দশতলাকে ব্যবহার করা হয়েছে, কোন কোন নামী-দামী লোক এখানে এসেছেন।

ন'তলাটির দুটো ফ্ল্যাট মাননীয় অতিথিদের জন্যই রাখা আছে। আজকালকার কখন গোপনতার দরকার হয় কে বলতে পারে! ওই দুটি ফ্ল্যাটও বিলাসবহুল।

নন্দালয়, যমুনালয়, করুণালয়—তিনটি বাড়িই নন্দলালের। নন্দলালের নামে নন্দালয়, বড় বউয়ের নামে করুণালয়, ছোট বউয়ের নামে যমুনালয়। আজ নন্দলালকে দেখে মনে করা কঠিন যে দশ বছর আগে ও ছিল আগরওয়াল কোম্পানিতে একজন ছোট ঠিকাদার। কে বলবে ওর বউ দেশের বাড়িতে থাকত, ও কলকাতায় থাকত বিজয়বাবুর চিলেকোঠার ঘরে। বিজয়বাবু ছিলেন এলাকার কয়েকটি ব্যারাকবাড়ির মালিক। নন্দলাল বিজয়বাবুকেই পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে বাড়িগুলো কিনে নিয়েছে, ভাড়াটেদের টাকা দিয়ে, না-দিয়ে, ঠেঙিয়ে তুলে দিয়েছে। বাড়িগুলো ভেঙে ইট-দরজা-জানলা-রাবিশ বেচেছে।

তারপর একের পর এক সৌধ তুলেছে। এখন ও এ শহরের এক বড় ডেভলপার-কন্ট্রাক্টর। পার্ক স্ট্রীটে ওর আপিস।

এ কথাও বলতে হবে যে পাড়ার অনেক ছেলেকে ও চাকরি দিয়েছে। নন্দলাল সব সময় বলে, বাংলায় থাকব, বাঙালী হয়ে গেছি, চাকরি কি অন্য রাজ্যের ছেলেদের দেব?

পাড়ার পুজোগুলোও এখন নন্দলালের পুজো হয়ে গেছে। এ পাড়ার দুর্গোৎসবের আলোকসজ্জা দু'বছর পুরস্কার পেয়ে গেছে। এ ছাড়াও পাড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তী হোক, নববর্ষ হোক, প্রতিটি উৎসবে নন্দলাল টাকা ঢেলে দেয়। সরকারী মহলেও নন্দলালের খুব দহরম-মহরম।

পাড়ায় শীতলামন্দির, শিবমন্দির, সব নতুন করে তৈরি করে দিয়েছে নন্দলাল। পাড়ার ছেলেরাও ওর অনুগত হয়ে গেছে।

নন্দলাল সব সময়ে বলে থাকে, এ সব কিছুই আমার নয়। জীবনের খুব দুঃসময়ে সেই মহাপুরুষের দেখা পেলাম বলেই সব হয়ে গেল তাঁর আশীর্বাদে। তিনি আমার

গুরু বলে বলছি না, একদিন তাঁর ছবি ঘরে ঘরে থাকবে দেখে নিও।

মহাপুরুষ ওর গুরুদেব।

খুব নামডাক ওঁর। হরিদ্বারে ওঁর আশ্রম। কেমন করে যে নন্দলালের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ হয়, সে একটা শোনার মতো কাহিনী বটে। নন্দলাল বলে, একজন যোগ্য লোক ধরে পয়সা দিয়ে ও গুরুদেবের জীবনটা লিখিয়ে নেবে। চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষায় তা অনুবাদ করাবে। আর লক্ষ লক্ষ ছেপে তা সর্বত্র বিতরণ করবে।

ভারতকে উদ্ধার করতে ওর গুরুদেবই পারবেন। ওঁর বয়স তিনশো বছর। কলকাতা আর উনি একবয়সী। বহু বছর নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন হিমালয়ের কোনো দুর্গম গুহাতে। তারপর যখন বুঝলেন এবার আত্মপ্রকাশ করা দরকার, তখন এসে বসলেন হরিদ্বারে।

নন্দলাল যখন ওঁকে দেখেছে তখন হরিদ্বারে ওঁর খুব নামডাক। সকলেই ওঁকে দেখতে যায়। বড় বড় কারবারী, ব্যবসায়ী হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। হরিদ্বারে ওঁর আশ্রম আগাগোড়া মার্বেলে তৈরি। সেখানে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে নাম লেখাতে হয় খাতায়। কতজন সাত—দশ দিনও বসে থাকে।

নন্দলালের হরিদ্বারে যাবার কথাই ছিল না। বন্ধুর বাবাকে পৌঁছবার জন্যে গিয়েছিল। তখনো ও ছোট ঠিকাদার। গাজিয়াবাদের কাছে গ্রামের বাড়িটা সবে পাকা করতে পেরেছে। গ্রামে তো অল্প বয়সেই বিয়ে হয়। ততদিনে নন্দলাল বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। ছেলেরা পড়ছে, ছোট মেয়ে নেহাতই ছোট।

জমিজমা, মোষ, হাল, এসব আছে বটে কিন্তু তার মালিক নন্দলাল একা নয়। তিন ভাই আছে, বাবা বেঁচে আছেন।

নন্দলাল দেশে জমিজমা বাড়াবার পক্ষপাতী ছিল না। ও ব্যবসায়ী হতে চাইছিল।

ও সমুদ্রের সন্ধান খুঁজছিল।

আগরওয়াল কোম্পানির মালিক আগরওয়াল সব সময়ে বলতেন, ভাঙা বাড়ির রাবিশ সরাবার ঠিকাদারী কাজ করতে করতে তাঁর ব্যবসা বেড়েছে।

বারবার বলতেন, কলকাতায় পয়সার সমুন্দর আছে। যে জানে সে কোটিপতি হতে পারে। আমরা বড় কোম্পানি হলাম কি করে? বাঙালীরা পয়সা চিনে না। আমরা চিনি। এখন বাঙালীও সমুন্দর চিনছে। তবে আমাদের সঙ্গে পারবে না।

নন্দলাল বলত, জী! আমি পারব?

—চোখ-কান খোলা রেখে চলো। আমি তো রাবিশ বেচতাম, জমি কিনতাম। তখন বস্তি কিনেছি, জলা-ডোবা কিনেছি, যা পেয়েছি তাই কিনেছি। সেই থেকেই তো ব্যবসা শুরু করলাম।

নন্দলাল ভাবত, কলকাতায় পয়সার সমুদ্র আছে জানলেই তো হবে না। পয়সা করতে হবে।

বড় বউ করুণা বলত, জমি কেনো।

নন্দলাল বলত, জমিজমা মোষ বলদ ভুলে যাও তো। এখন দিনকাল পালটে গেছে।

করুণা বলত, জমি না থাকলে খাব কি?

—একটু বুঝতে শেখো। ব্যবসা করলে অনেক টাকা। কলকাতায় পয়সার সমুদ্র আছে, জানো?

—কেমন করে জানব? সমুদ্র তো দেখিনি!

—আমি তোমাদের পাকাবাড়িতে রাখব। মাথার উপর বিজলী পাখা, ঘরে বিজলী আলো। রোজ গঙ্গায় স্নান করবে, মোটরে চড়াব তোমাকে।

—তুমি কি মন্ত্রী হবে, না এমেলে?

—মন্ত্রী আর এমেলে আসে আর যায়। ব্যবসায়ী চিরকাল থাকে। ব্যবসায়ী ঠিকাদারদের কাছে টাকা নিয়ে ওরা ভোটে জেতে।

—দেখো!

করুণা ভেবে পায়নি নন্দলাল কি বলছে। বাড়ির বড় বউ করুণা। সংসার যাকে বলে তার ওপরে। দেশের ঘরে কত খোলামেলা জায়গা। উঠোনে ধান-গম শুকোও। কাপড় মেল। কুয়ার জল কত মিষ্টি! আর দুধ, দই, ঘি, ঘোল, কিসের অভাব আছে?

—একবার হরিদ্বার ঘুরে আসি, তারপর সব করে ফেলব।

—আমাকে হরিদ্বার দেখাবে না?

—দেখাব, দেখাব।

সব কথাই রাখতে পেরেছে নন্দলাল। বাবা, মা, ভাইরা, ভাইদের পরিবার, করুণা, ছেলেমেয়ে সবাইকে ভারত ভ্রমণ করিয়ে দিয়েছে বারবার। দেশের বাড়ি এখন পাকা দোতলা। বিজলী বাতি ঘরে ঘরে। জমিজমা অঢেল। ট্র্যাক্টরে চাষ হয়। সব ভাইদের লিখে দিয়েছে।

কলকাতায় এসো বেড়াতে। কিন্তু দেশের সম্পত্তি তোমাদের, আর কলকাতার সম্পত্তি আমাদের। কোনো ভুল করো না। ভাইপোরা গাজিয়াবাদে কারখানা খুলেছে। আর নন্দলাল এ বছর ছোট মেয়ের বিয়ে সতেরো বছরেই দিল। পাঁচ লাখ পণ, পঞ্চাশ ভরি সোনা, মারুতি থেকে ভি সি আর, কি দেয়নি?

বড় মেয়ের স্বামীকে বিয়ের সময়ে তেমন দেখা যায়নি। তাই তাকেও একটি ঠিকাদারী ব্যবসা করে দিয়েছে ধানবাদে। ধানবাদেও পয়সার সমুদ্র আছে। ক্ষমতা থাকে, ধরে ফেল।

এ সবকিছুর মূলেই মহাপুরুষ।

মহাপুরুষ যখন গঙ্গার ঘাটে বসতেন, নন্দলাল দূরে বসে দেখত। দাড়ি-গোঁফ-মাথা কামানো চমৎকার চেহারা। কে বলবে তিনশো বছর বয়স হয়েছে? কপালে একটি ক্ষতচিহ্ন। মহাপুরুষ যখন কোটাশিলার গুহায় ধ্যানমগ্ন, স্বয়ং মহাদেব ওঁর কপালে ত্রিশূল দিয়ে খোঁচা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সমাজে চলে যা। তোর এখন অনেক কাজ আছে।

সেই থেকে মহাপুরুষের কপালে ওই দাগ। তা নন্দলাল বসে বসে দেখত হাতজোড় করে। দূর থেকে দর্শনই লাভ। ওঁর কাছে যাবার সৌভাগ্য কতজনের হবে?

নন্দলাল খুব ধরেছিল হরিরামকে। হরিরামজী, তুমি তো ওঁর আশ্রমে রোজ মিঠাই পৌঁছাও, আমাকে একবার দেখা করিয়ে দিও।

হরিরাম তো আমলই দেয় না।

—মন্ত্রী, বড় বড় নেতা, বিদেশী ভক্ত, বড় বড় ব্যবসায়ী, বম্বের সিনিমার কর্মকর্তারা, বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রী, সকলকে নাম লেখাতে হয়, বসে থাকতে হয়। তুই কোথাকার কে যে তোকে দর্শন দেবেন?

নন্দলাল হরিরামজীর পায়ের কাছে হাজার টাকা নামিয়ে দিয়েছিল। ওঁর নামে কাঙালীদের লাড্ডু বিতরণ করো। কাছে যেতে পারব না তো দূর থেকেই সেবা করব। আমার কপালে যা আছে, হবে।

হরিরামজী দয়াপরবশ হয়ে বলল, নাম-ধাম-জাত-গোত্র-ব্যবসা-দেশ সব লিখে দিয়ে যাস। কপালে থাকে তো ডেকে নেবেন।

—তেমন কি কখনো হয়েছে?

—কেন হবে না?

খুব বড় একজন অভিনেত্রীর নাম করে ও বলল, তিনি তো পাঁচটা সিনিমা ফ্লপ করে যাবার পর এখানে এসে হত্যা দিয়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁকে কেউ ছবিতে নিতে চায় না। তা দেবতা গঙ্গায় স্নান করে উঠে যাবার সময়ে ওঁকে ডেকে বললেন, বৈশাখ মাসের দশ তারিখে যে লোক আসবে, তার ছবিতে সই করবে। টাকার কথা বলবে না। এই ছবি থেকে তোমার কপাল ফিরবে।

তিনি তো অবাক। অনেক কাঁদলেন, বললেন, আমার কপাল ফেরে তো, মহারাজ, আমি আপনার উৎসবের দিন সোনার ঝাঁটা দিয়ে আপনার আশ্রমের সিঁড়ি ধুয়ে দেব বাকি জীবন।

তো দেবতা বললেন, এই ছবি সই করবে। বাকি জীবন ঢেঁড়স আর টক দই খাবে না, লাল রঙ পরবে না, তোমার সময় সাত বছর ছ'মাস চার দিন ভাল যাবে। এই সময়ের মধ্যে টাকা-পয়সা ঠিকভাবে রেখো। এই সময় কেটে গেলে তোমার বিয়ে হবে, বিদেশে থাকবে, সেখানে আমার নাম প্রচার করবে। সন্তান তোমার হবে না, সেজন্যে দুঃখ করো না।

অ্যাকট্রেস তো এ কথা শুনেও খুব কাঁদলেন। তো দেবতা বললেন, সিনিমাতে অনেকবার মা হয়েছ, সে কথা মনে রেখেই সান্ত্বনা পেও। যাঁর সঙ্গে বিয়ে হবে, তিনি খোজা। কিন্তু তোমার কপালে তিনিই লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ।

নন্দলাল বলল, এ তো আপনি অ্যাকট্রেস বর্ণার কথা বলছেন।

—আবার কার কথা? তবে এটাও জেনো, দিল্লীর মন্ত্রী দয়াগোপালজী যে এখনো টিকে আছেন, শুধু দেবতার আশীর্বাদে।

—আরে বাপ রে!

—ওনার ছেলে মেরে দিল বউকে। আর উনি সেই বউয়ের বোনের সঙ্গে সেই ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে দিলেন। দয়াগোপালজীর কোনো মুশকিল হলো না। পুলিশ

বলে দিল, এ তো আত্মহত্যা। দয়াগোপালজীর কিছু হলো না। কেন হলো না?

—কেন হলো না?

—দেবতা বলেছিলেন, এখন আড়াই বছর তোমার উপর আমার আশীর্বাদ থাকবে। যা পারবে করে নাও। দয়াগোপাল সরল মানুষ। বললেন, বউমার আরেকটা বোন আছে। বাপের তিনটে কারখানা, অত বড় কারবার, জমিজায়দাদ, সে তো ভাগ হয়ে যাবে। এই বউটা না থাকলে ছোটটাকেও বউ করতাম, এই ইচ্ছে।

—দেবতা কি বললেন?

—পাথরবাটি ছুঁড়ে মারলেন। দয়াগোপালজীর কপাল কেটে গেল। গর্জন করে বললেন, আড়াই বছর টাইম পাচ্ছ, সময় নষ্ট করো না, এ টাইমে মাকে খুন করলেও পাপ হবে না। তা দয়াগোপালজীর মা তো নেই। ছেলেকে সব বললেন। তারপর যা হলো সে তো সবাই জানে।

—হ্যাঁ...সব মনে নেই।

—ওঁর দুশমন ছিল ওঁর শালা, সে মরে গেল। ছেলে এ মেয়েকে বিয়ে করল। আড়াই বছর মন্ত্রী থেকে দয়াগোপাল মরে গেলেন। ছেলে ভকতগোপাল এখন মন্ত্রী। আর দিল্লীতে অত বড় আশ্রম তো দয়াজী করে দিয়েছেন।

—দেবতা ফোরেনে যান না?

—না। ফোরেন থেকে লোক আসে। উনি ভারতভূম ছেড়ে যান না।

—কলকাতা যান না?

—ওখানে ভক্ত হোক, যাবেন।

—আমার কাগজটা দেবেন ওনাকে।

সে কি অবস্থা নন্দলালের। টাকা-পয়সা ফুরিয়ে যাচ্ছে। সদাব্রতে খায়, গঙ্গার ধারে ঘুমোয়। কলকাতায় কাজ পড়ে আছে, তা জানে। কিন্তু মন বলছে ওঁর আশীর্বাদ পেতেই হবে। যাওয়া তো চলে না।

স্বচক্ষে দেখছে কত নামী-দামী ভক্ত আসছে। তাড়া তাড়া নোট নামিয়ে দিচ্ছে। উনি হাসছেন আর বলছেন, ওরে! হিন্দু-ভারত বাণী প্রচারের জন্যে দিবি তো দে। আমাকে দিস না।

স্বচক্ষে দেখছে, উনি যা বলছেন, দিল্লীতে ছাপা হয়ে যাচ্ছে, প্রচার হয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। গঙ্গার ঘাটে বসে ও যে কত লোককে দেখল তার ঠিক নেই। কত মন্ত্রী, কত নেতা, কত নায়ক-নায়িকা, সবাই আসছেন। এদের মধ্যে কে মনে রাখবে যে নন্দলালও বসে আছে ওখানে?

অথচ অলৌকিক ঘটনা যখন ঘটবার তখন ঘটবেই। এ তো নন্দলাল নিজেই জানে। বিজয়বাবুর চিলেকোঠায় থাকে, সেদিন বেলেঘাটা থেকে ফিরতে দেরি হলো। প্রাণের বন্ধু গোবিন্ বলল, আজ আমার এখানে থাকো। ঝড়বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।

ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, নন্দলালের চিলেকোঠার গায়ে নিমগাছের ডাল ভেঙে পড়ল, জানলা ভাঙল, দেয়াল ভাঙল। নন্দলাল ঘরে থাকলে সর্বনাশ একটা হয়ে যেত।

রাতে ফেরেনি বলে ও বেঁচে গেল।

বিজয়বাবু বললেন, তোমার সুসময় আসছে নন্দলাল। বিপদ থেকে বেঁচে গেলে যখন, ভগবানের কোনো সদিচ্ছা আছে।

তেমনি অলৌকিক ব্যাপারই ঘটে গেল।

হরিরামজী ওকে ডেকে নিয়ে গেল দোকানে। বলল, তোকে তো আমি চিন্নতে পারিনি নন্দলাল। তোর মধ্যে যে কি আছে তাও বুঝিনি। যা হয়ে গেল সে তো চমৎকার ঘটনা।

—কি হলো হরিরামজী?

—আজ সকালে কৈলাস এসে হাজির। দেবতা ডেকেছেন, শীঘ্র চলো। আমি তো দৌড়ে দৌড়ে গেলাম। দেবতা আমাকে চোদ্দপুরুষ তুলে গালাগালি দিলেন। বললেন, নন্দলাল সিং, ওর জন্যে আমি বসে আছি আর তাকেই তুই আনছিস না? যা, এখনি তাকে ডেকে নিয়ে আয়। তার সামনে এখন একচল্লিশ বছর সুসময়। ওর নামে রাস্তা হবে, দেখে নিস।

—হরিরামজী!

—আমার কথা মনে রেখো ভাই।

—ভুলব কেমন করে?

নন্দলাল ভোলেনি। ঝুলন, দোল, গুরু উৎসব, বিয়ে—বাড়ির যে কোনো উৎসবে হরিরামজীর স্পেশাল ক্ষীরের লাড্ডু থাকবেই থাকবে। প্রতি বছর গুরু উৎসবের দিন লোক মারফৎ হরিরামজীর কাছে শাল, সিল্কের থান, কলকাতার মিঠাই যাবেই যাবে।

এ জন্যেই নন্দলালের এত নামযশ। বড়লোক অনেকে হয়। কিন্তু পুরনো দিনের লোকজনকে মনে রাখে কে?

মহাপুরুষ নন্দলালকে "আও বেটা" বলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, সামনে সুদিন আসছে। মাথা ঠিক রেখে চলতে হবে।

—দেবতা!

—যে কাজ করছ তাতে কোনো উন্নতির পথ নেই। ওই জমিজমা হাল-মোষ নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। সামনে পথ বন্ধ।

হরিরামজী নন্দলালের সব কথাই ওঁকে বলেছিল। তার কাছেই উনি নন্দলালের সব খবর জেনেছেন। কিন্তু নন্দলালের সেকথা মনেই পড়ল না। তার মনে হলো মহাপুরুষ উনি, সবই দৈববলে জেনেছেন।

—তবে কি করব দেবতা?

—জমি থেকেই লক্ষ্মীলাভ হবে।

—জমি থেকে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। কলকাতায় জমি কেনো, আট-দশতলা বাড়ি ওঠাও, টাকা ডেকে আসবে।

—কেমন করে পারব মহারাজ?

—তুমি কি পারবে? তোমার ক্ষমতা কি? পারিয়ে দেব আমি।

—কৃপা করুন দেবতা।

—আমি যা বলব, তাই করবে।

—তাই করব দেবতা।

—একটা বিয়ে করতে হবে।

—আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে।

—বয়স কত?

—বিয়াল্লিশ।

—তাতে আটকাবে না।

মহাপুরুষ ওকে বসতে বলেছিলেন।

ধানবাদের ব্যবসায়ী রাজারাম ঠাকোর নন্দলালের স্বজাতি। তাঁর বিয়ে তিনটি, প্রথম পক্ষের সন্তান একতম কন্যা যমুনা। জননীর পূর্বজন্মের পাপের ফলে যমুনা একাধারে হাবা, কালা, বোবা ও কুৎসিত।

রাজারাম ঠাকোরের শ্বশুর এক সর্বনেশে উইল করে গেছেন। তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, চা-বাগান, রেয়ন কারখানা, হিমাচল প্রদেশে ফার্ম, যোধপুরে মেশিনারি অর্ডার সাপ্লাই ব্যবসা, দিল্লীর হোটেল—এ সবই তাঁর একমাত্র সন্তান রতনকুমারীর প্রাপ্য হয়। রতনকুমারীর পাওয়াও যা, রাজারামের পাওয়াও তা। তাঁর শর্ত, সম্পত্তির অর্ধেক রতনকুমারী তখনই পাবে, যখন বিশ বছর না পুরতে সে যমুনাকে বিয়ে দিতে পারবে।

—অর্ধেকও তো কয়েক কোটি টাকা!

—বাকি অর্ধেক যাবে চ্যারিটিতে। উনি মহাবীরনগরে টাউনশিপ করছেন। সেখানে হাসপাতাল....মন্দির....

—আমাকে কি করতে হবে?

—যমুনাকে বিয়ে করবে। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকবে। এ বিয়ে হলে অনেক মানুষ উদ্ধার পাবে।

—কেমন করে দেবতা?

—রাজারামের শ্বশুর বাঘ মনে করে গরু শিকার করে ফেলেছিল। সেই পাপে জন্মাল একটাই মেয়ে রতনকুমারী। আর রাজারামের বাপ রাগের বশে ব্রাহ্মণের ঘর পুড়িয়েছিল। ফলে রাজারামের এক সন্তান যমুনা। যমুনার বিয়ে হলে ওরা উদ্ধার পায়। নইলে তো অনন্ত নরক।

—হাঁ দেবতা, সত্যি!

—যমুনাকে বিয়ে কেন করবে? কেননা এটা পুণ্য কাজ। বিয়ে করলে কি পাচ্ছ? কলকাতায় টালিগঞ্জে জমি পাচ্ছ দু'বিঘা। নগদ পাচ্ছ পঞ্চাশ লাখ। এরপর যমুনার নামে আলাদা টাকা, ওর তো লোক চাই, গাড়ি চাই। তারপর একদিন, যমুনার যদি ছেলে হয়, তাহলে যমুনার মায়ের সম্পত্তি, বাপের সম্পত্তি—বুঝতে পারছ?

—দেবতা, আপনি সব জানেন!

পরে অবশ্য নন্দলাল সব পায়নি। যমুনাকে বিয়ে দিয়ে তারপর রাজারাম হঠাৎ তিন বউয়ের গর্ভে তিন ছেলে উৎপাদন করলেন, তার একটি মরে গেল, দুটি রইল। যমুনার মাতামহও বুড়ো বয়সে রক্ষিতার ছেলেকে দত্তক নিয়ে মেয়ে জামাইকে দিলেন সিকি।

কিন্তু নন্দলালের বরাত ফিরে গেল।

হরিদ্বারে বন্ধুর বাবাকে পৌঁছতে গিয়ে দেড় মাস থেকে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যাসহ প্রত্যাবর্তন করেছিল নন্দলাল। নন্দলালের শ্বশুর সকন্যা জামাতা বড় হোটেলে থেকে গেলেন, যতদিন না ক্যামাক স্ট্রীটে ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া গেল।

বিয়ে করে নন্দলাল দেশে জানাতে গিয়েছিল। করুণা কেঁদেকেটে চুপ করে যায়। যমুনা সুন্দরী ইত্যাদি হলে তার হিংসে হতো। কিন্তু যমুনা করুণার পাত্রী। সে বোবা, কালা, হাবা ও কুৎসিত।

করুণা বুঝল ওর শ্বশুরের কথাই ঠিক। বেটা ছেলে দুটো বিয়ে করতেই পারে। নন্দলাল তো তেমন বেটাছেলে নয়। চাষীবাসী ঘরের ছেলে। খুবই নীতিবান। এই বয়সে দাদামশাই হয়ে বসে আছে।

এই যে বিয়ে এ একজন বিশাল মহাপুরুষের নির্দেশে। এ বিয়ে না করলে নন্দলালের ওপর অভিশাপ লাগত। বোঝা যাচ্ছে নন্দলালের জন্যে ভগবান অনেক চিন্তা করছেন। করুণা দুটো ছেলে দুটো মেয়ের মা। বলতে কি, করুণার বয়সও সাঁইত্রিশ হয়েছে। যমুনা ওর বড় মেয়েরই বয়সী হবে। করুণার তো ওকে স্নেহ করা উচিত।

এই বিয়ে করে নন্দলাল খুব ভাল কাজও তো করেছে। এটাও ভাবতে হবে যে বোবা, কালা, হাবা মেয়েটিকে সে উদ্ধার করেছে।

করুণাও সেকথা মেনে নিল।

শাশুড়ী বলল, এও তো হলো তোমার সৌভাগ্যে। স্বামীর সৎকাজে স্ত্রীর সৌভাগ্য কাজ করে।

আগরওয়ালজী খুব খুশি হলেন। বাঙালীর ব্যবসাবুদ্ধি কোথায়। তারা মিটিং মিছিল করে, বইমেলা করে, মেতে থাকে পুজো-ফাংশান নিয়ে। কলকাতা শহর এখন বাজারের পণ্য। যে যেমন পারো কিনে নাও। নন্দলাল, তুমি নেমে পড়ো! আমার আশীর্বাদ তোমার সঙ্গে থাকল। তুমি গাজিয়াবাদের লোক, আমি জয়পুরের। তবে দু'জনেই এসেছি রাজস্থান থেকে। দেশবাসীকে দেশবাসী তো মদত করবেই। আমাকেও এককালে কোটাওয়ালা মদত দিয়েছিল। আমি দেব তোমাকে।

এই থেকেই নন্দলালের ভাগ্য পরিবর্তন শুরু হয়। ক্রমে বিজয়বাবুর কাছ থেকে ব্যারাক বাড়িগুলো কেনা হয়। হাইরাইজ বাড়ি হলো। এখনকার জমানার সবচেয়ে দরকারী জিনিস।

মস্তানদের হাতে রাখতে ও টাকা বিলোয়। পুরনো বাড়ি ভাঙা রাবিশ বেচার ছোট ঠিকাদারী দেয়। শুরুতেই শীতলা ও শিব মন্দির সংস্কার করে ও জনগণকে অভিভূত করে ফেলে। আর পাড়ার জনগণকে ডেকে মিটিং করে বলে, এ পাড়াকে আমি বদলে দেব। আপনারা জানেন, আমি যে কোনো এলাকায় যেতে পারতাম।

কিন্তু যেখানে এতকাল থাকলাম, সে জায়গাকে উন্নত করা তো আমার প্রথম কর্তব্য। আপনারা আশীর্বাদ করবেন, যাতে মহাপুরুষের ইচ্ছা সফল করতে পারি।

সবচেয়ে আগে উঠল করুণালয় আর যমুনালয়। কেউ বলতে পারবে না নন্দলাল আইন মানেনি। সরকারী আইন ষোলআনা মেনেও ভালো হাইরাইজ করা যায়। করুণালয় উদ্বোধন করে গেলেন স্থানীয় কাউন্সিলার। যমুনালয় উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বিধায়ক। আর নন্দালয়ের বেলা এলেন এক রাজ্যমন্ত্রী। রাস্তা জুড়ে কাঙালীভোজন হলো, মন্দিরে মন্দিরে পুজো পড়ল।

এরপর করুণার আর কি বলার থাকতে পারে? এই স্বপ্নসৌধ তার, একান্তই তার। এই সাজানো ঘর তার, সে এর মালিক। এই ঝকঝকে ঠাকুরঘরও তার। নন্দলাল সস্নেহে বলল, জীবনে অনেক কষ্ট করেছ, এবার আরাম করো।

করুণার ফ্ল্যাটের পাশেই যমুনার ফ্ল্যাট। অভাগিনীকে তুমি না দেখলে কে দেখবে? এ কথা সত্যি যে, ওর বাপের বাড়ি থেকে দুই খাণ্ডারণী ঝি এসেছে। ওর কাজকর্ম তারাই করবে। তবু মানুষটা অসহায়। ওকে স্নেহ করো।

যমুনার মা রতনকুমারী করুণাকে বেনারসী, কাচের চুড়ি, মুক্তোর বালা, সতী-চুনরী—এসব দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, সতীন নয়, ও তোমার একটা হতভাগা মেয়ে। ওর খাওয়া দেখবে, শোয়া দেখবে, সব ভার তোমার ওপর। ফিরে গিয়ে আমি পাঠিয়ে দেব লতাকে। লতা আমার এক দারোয়ানের মেয়ে। লেখাপড়া শেখালাম, বিয়ে দিলাম, বিধবা হলো। ও বরাবর যমুনাকে দেখত। লতা চলে এলে তোমার কোনো কষ্ট হবে না।

করুণা বিশেষ অভিভূত হলো।

—ও তো একটা অবোধ শিশুর মতো। এখন তুমি হলে আমার বড় মেয়ে। কি বলব বেটি, সন্তান একটা, সেও ওরকম! ওর বাপ রাগের বশে আরো দুটো বিয়ে করল। তারাও তো বাঁজা। আমার বাপের টাকা ছিল সেজন্যেই আমাকে তাড়িয়ে দেয়নি। যমুনারও বিয়ে হলো। এখন হয়তো আমাদের কপালও ফিরবে। যমুনার বাপ বড়ই নির্দয়। মেয়েটাকে এ জীবনে চিকিৎসা করাল না!

রাজারাম ঠাকোর মেয়ের চিকিৎসা না করান, কলকাতায় গোপনে নিজের চিকিৎসা করিয়েছিলেন। সেজন্য যমুনার বিয়ের দু'তিন বছরেই তিন বউয়ের তিন পুত্রসন্তান হয়েছিল। মেজ বউয়ের ছেলে পরে মারা যায়। রাজারামেরও যখন ছেলে হলো, তখন সেও তো মহাপুরুষের আশীর্বাদ বলেই গণ্য হলো।

করুণালয়ে করুণা ও যমুনার ফ্ল্যাট সংলগ্ন ব্যালকনিতে তুলসী মঞ্চ হয়েছে, ফুলগাছের টব।

এ বাড়ি এবং সব বাড়িই যদিও ফ্ল্যাট-ক্রেতাদের টাকাতেই করেছে নন্দলাল, তবু কৌশল করতে ছাড়েনি।

মহাপুরুষ বলেছেন, ওরে পাগল! এখন তেমনি খদ্দের খুঁজবি যে কালো টাকা সাদা করতে চায়। দশ লাখের ফ্ল্যাট চার লাখে "পেলাম" বলে দেখাবি। ও টাকা

তার সাদা হলো। ছয় লাখ তোর। তবে বাবু, দিয়ে-থুয়ে খাস। কর্পোরেশন বলো, যে বলো, টাকা ছাড়া চলে কার? আর চটকা বড়লোক হবে বলে ভেজাল দিয়ে বাড়ি করো না। একেবারে আগমার্কা বাড়ি করো। খাঁটি কখনো মাটি হয় না।

—যা বলেন দেবতা!

—খদ্দের বলতে বারো আনা বেচবি মালামাল লোকজনের কাছে। কিন্তু লোক দেখাবার জন্যে চার আনা, যাদের বলে মিডিল ক্লাস, তাদেরও দিস। বাড়িতে কলেজের মাস্টার, সরকারী চাকুরে থাকা ভাল। মানুষের চোখ টাটাবে না। এটা হলো গে প্রথম কাজ। পরে তুমি ধ্যারধেড়ে গোবিন্দপুর হেন জায়গায় ধেনো জমি কেনো, স্বল্পআয় লোকজনের জন্যে বাড়ি তোল। তোমাকে সরকার "আবাসন শ্রী" পদক দিয়ে দেবে।

নন্দলাল প্রতি কথা মেনে চলেছে।

যমুনার সংসারে শুধু নানা রকম পুতুল। যমুনা পুতুল নিয়ে খেলে। করুণার সংসারেই রান্না হয়। করুণা কাছে বসে যমুনাকে খাওয়ায়।

লতা এক খরখরে কর্মঠ স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। বছর তিরিশ বয়স। যমুনাকে ও বাঘিনীর মতো রক্ষা করে। সাজায়, সিঁদুর পরায়। ধুমধাম করে পুতুলের বিয়ে দেয়। এই ব্যাপারটি যমুনার বড় পছন্দ। আনন্দে হাততালি দেয় ও, হাসে খিলখিল করে।

নন্দলাল ক্রমে ক্রমে করুণালয়ে নিজের দুই ছেলে সুরেশ ও নরেশের নামে বেনামী ফ্ল্যাট রেখেছে। দুই মেয়েকে দুটি ছোট ফ্ল্যাট দিয়েছে।

আর যমুনাকে অবহেলা করে তাও তো বলা যাবে না। যমুনার একমাস সন্তানসম্ভাবনা জানতেই নন্দলাল ওকে আর লতাকে নিয়ে ধানবাদে দৌড়েছিল। নিজে গিয়েছিল গুরুদেবের কাছে। বছরখানেক বাদে ফুটফুটে এক মাস-তিনেকের মেয়ে নিয়ে ওরা ফিরে এলো।

মধ্যবর্তী কালে নন্দলাল অনেকবার যাওয়া-আসা করল কলকাতায়।

মেয়ে—ছেলে তো নয়!

করুণার কোনো হিংসেই হলো না।

এবারে যমুনা যখন ফিরল, তখন তার সঙ্গে দুই নতুন দাসী। লতার কোলে মেয়ে।

লতা বলল, বড় আপসোস। দিদি মেয়েকে কোলে নেয় না, চেয়ে দেখে না।

করুণা অসীম করুণায় বলল, ওর কি কোনো জ্ঞান আছে? নিজেই একটা শিশু। আরেকটা শিশুকে পালতে পারে? ওকে তুমিই দেখো। মেয়ে তো গলায় আওয়াজ করে, কানেও শোনে, মায়ের মতো হবে না।

এবারে যমুনা লতাকেও সইতে পারে না—বাচ্চাকেও। করুণার কাছে এসে বসে থাকে আর কাঁদে মাঝে মাঝে। অবশেষে রতনকুমারীকেই জানানো হলো।

রতনকুমারী আবারও করুণাকে বললেন, হতভাগী মেয়ে আমার! ওর মেয়েকে লতা দেখবে....

বলতে বলতে চোখ মুছলেন।

—আর আমার মেয়েকে তুমি দেখো।

সুরেশ বলল, নানীমা, তোমরা ছোটমার চিকিৎসা করাওনি কেন? বোবা-কালাদের যেমন শেখায়, তেমন লেখাপড়াও শেখাওনি!

—কে শেখাবে বুবুয়া? বাপ তো কানেই নিত না। আমি ওকে আগলে রাখতাম। ঘরে দুটো সতীন—কে কবে বিষ দিয়ে মেরে দেয়!

যমুনা কিন্তু মায়ের কাছেও ঘেঁষল না।

রতনকুমারী বললেন, করুণা, ওকে দেখো মা। আমি স্বাধীন নই। যখন-তখন আসতে পারি না।

করুণা বলল, দেখব নিশ্চয়। যমুনা আমার কাছে একটা শিশুর মতো।

—অনেক কপালে যমুনা তোমাকে পেয়েছে।

—যমুনার জন্যেই তো আমাদের সব হলো। ওর জায়গা সবার ওপরে।

করুণাই লতাকে সোনার হার গড়িয়ে দিল, হাতে দিল বালা। মানুষ করছে, সব ধকল নিচ্ছে। এটুকু তো করতেই হয়।

দুষ্টলোকে অবশ্য নানা কথা বলল। যমুনা গর্ভবতী হয়নি। লতার পেটে নন্দলালের সন্তান এসেছিল। তাই যমুনাকে বাপের বাড়ি রেখে নন্দলাল লতাকে সেই দেরাদুন না কোথায় রেখেছিল, গুরুদেবের এক শিষ্যার মহিলা আশ্রমে। এ সব কথা যমুনার বাপ-মা জানে। কেচ্ছা বাড়াবে না বলে মেনে নিয়েছে।

তা চোখের সামনে একটা লোককে এমন রমরমা হতে দেখলে স্বভাবনিন্দুকরা পাঁচ কথা বলবেই!

মেয়ের নাম হলো গৌরী। গুরুদেব নাম লিখে পাঠালেন। মেয়ের জন্ম নিয়ে কথাবার্তার মুখ মেরে দিল নন্দলাল। মেয়ের মুখে অন্নপ্রসাদ দিল বিশাল ধুমধাম করে। পাড়া ঝেঁটিয়ে নেমন্তন্ন হলো। কার্ড প্রতি খরচ হলো পঞ্চাশ টাকা, আর নিরামিষ ভোজনের প্লেটই ষাট টাকা করে। বড় বড় নামী-দামী লোক, গুরুদেবের শিষ্য-শিষ্যা—কে এল না! গরিবকে কাপড় বিলানো হলো। ফুলে সাজানো সিংহাসনে যমুনা ও নন্দলাল। বাপের কোলে মেয়ে। সব ভিডিও ছবি তোলা হলো। গুরুদেব পাঠালেন ব্রহ্মকমল ফুল।

যমুনার বাবা এসে আশীর্বাদ করে গেলেন হীরের পেনডেন্ট দিয়ে। নন্দলালের বাবা দিলেন মোতির হার, নন্দলাল কিনে দিয়েছিল।

লতা সাদা চন্দেরী পরে ঝলমলিয়ে ঘুরে বেড়াল। আর নন্দলালের ছোট ভাই তার বউকে বলে গেল, ডাল মে কালা হ্যায়। কিন্তু এখন আর সে কথা বলে লাভ নেই।

বউ বলল, বড় ঘরে বড় ব্যাপার হয়ে থাকে।

নন্দলাল তার ভাই-ভাইপোদের দামী স্যুটিং, বাবাকে ও মাকে গরদ, ভাই-বৌ, ভাইঝি, মেয়েদের বেনারসী দিল। চাঁদির জুতোয় সবাই মুখ বন্ধ রাখল।

ভাই-বউ বলল, দেশের জমির স্বত্ব ছেড়েছে, সব তোমাদের। তবু নতুন বাড়ি, স্কুটার, আরো জমি, জেনারেটর, কি করে দেয়নি? সে-সব মনে রেখো।

করুণাও দেওর-দেওরানীর কাছে খুব খাতির পেল। ওরা বলল, দেশে কি আর যাবে না?

বৈভব করুণাকে যেমন মোটা করেছে তেমনি বাত ধরিয়েছে দেহে।

করুণা বলল, যেতে কি অসাধ! কিন্তু শুধু মালিশ করে দেহটি ঠিক রেখেছে। আজকাল আর নড়াচড়া করতে পারি না।

—ছেলেদের বিয়ে তো দেবে।

—দেবতা যেমন বলবেন।

—কে বলবে দেশে থাকতে!

করুণা মানুষটা কিছু বেশি সরল। ও বলল, স্ত্রী তো স্বামীর ছায়া। ওখানে রেখেছিল, ছিলাম। সংসারে সব কাজ করেছি, শাশুড়ীর সেবা করেছি, এত এত ধান-গম সব্জি-দুধ-ঘি-দই, সব সামলেছি। সব করেছি।

—আর এখানে?

—সুরেশের বাপ কিছু করতে দেয় না। কি-ই বা করব? নোকর-নোকরানী—কিসে অভাব? যমুনাকে দেখে রাখাও এক মস্ত কাজ।

—তা বটে।

—ওর কারণে এত ঐশ্বর্য, ও তা জানে।

—গৌরীকে বেশ ভালবাসে?

—ওই চেয়ে দেখে। তবে আমি গৌরীকে কোলে নিয়ে বসলে ওকেও আদর করতে হবে। গৌরী ঘুমোয় লতার কাছে, আর ও আমার পাশে ঘুমোবে আমাকে আঁকড়ে ধরে।

—স্বামী বলে ভক্তি আছে?

—ওর কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতাই নেই। তবে সুরেশ-নরেশের সঙ্গে ভাব খুব। ওরা ওকে বেলুন এনে দেয়। ছবির বই দেখায়।

—দেখ! রাজকন্যা তুই, কিছুই জানলি না!

—দেবতা বলেন, ওকে শৈশবে পেলে একেবারে সুস্থ করে দিতেন।

—তা কি হয় নাকি?

—কত অন্ধকে দৃষ্টি ফিরে দিচ্ছেন, কত বোবা লোক কথা বলছে। আমাদের দেখ না, কি ছিলাম আর কি করে দিলেন।

—লতা....গৌরীকে যত্ন করে?

—তা করে।

এত কৌতূহল, এত জেরা ভাল লাগেনি করুণার। ওরা দেশে ফিরে যেতে করুণা যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। ওর মনে হয়েছিল ওরা মনে মনে খুব দূরে সরে গেছে।

গৌরীর জন্মের পরেই যমুনালয় বাড়ি উঠে যায়। আর নন্দালয় বাড়ি যখন উঠল, তখন থেকেই নন্দলাল নতুন ব্যবস্থা বহাল করতে চাইল। বলল, তোমরা এখানে থাক, আমায় তো কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আমি নতুন বাড়িতে থাকি।

—এখানে খেতেও আসবে না?

—দরকার কি?

—একা থাকবে?

—ভাবছিলাম যমুনা, লতা আর গৌরীকে নিয়ে যাব।

করুণা বলল, বুঝেছি।

—কি বুঝলে?

—যা বুঝবার তা বুঝেছি।

—কিছুই বোঝনি। মহাপুরুষকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে কলকাতায়। ওখানকার আপিস, বাড়ি, কাজ কত রকম থাকবে!

—যমুনা থাকতে পারবে না। যমুনা আর গৌরী তো আমার কাছেই থাকে, দেখ না?

নন্দলাল চুপ করে গেল।

করুণা অন্যদিকে চেয়ে বলল, সুরেশের একুশ বছর বয়স হলো। ওকে বিয়ে দাও। আমরা এখানেই থাকি। তুমি...এখানেই খাওয়া-দাওয়া করো। ছেলেরা বড় হয়েছে, তাদের কথাও ভাবতে হয়।

—যমুনা ওখানে ভালই থাকত।

—যমুনা লতাকে ....সহ্য করতে পারে না...গৌরীকে চেয়েও দেখে না....মাঝে মাঝে খুব অস্থির হয়ে পড়ে। আমার চোখের সামনে থাকা ভাল। সেদিন তো লতাকে ঠেলে দিয়ে এমনভাবে ব্যালকনির ধারে ছুটে গিয়েছিল যে বলার কথা নয়। তেমন যদি কিছু ঘটে?

নন্দলাল নিশ্চুপ।

—লতা না থাকলেও গৌরীকে আমি সামলে নিতে পারব। লতাকে না দেখলে যমুনা অনেক শান্ত থাকে।

নন্দলাল নীরব।

করুণাও আর কথা তুলল না। বলল, যা বলেছি তা থেকেই বুঝে নাও কি বললাম?

নন্দলাল বলল, হ্যাঁ.... ছেলের বিয়ে.... কাজগুলো তো বুঝে নিতে হবে ওকে।

—অনেক লেখাপড়া তো তুমিও শেখোনি, অথচ কত লেখাপড়া জানা লোককে কর্মচারী রেখেছ।

নন্দলাল অবাক হয়ে করুণাকে দেখছিল। জীবনেও, কাজের ব্যাপারে সংসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সময়ে, নন্দলাল করুণার সঙ্গে কথা বলেনি। কথার কি আছে? খাচ্ছ, পরছ, আরামে আছ, আর কি চাই?

—তবে কি করব?

—একুশ আর উনিশ। সুরেশ বি কম পাশ করেছে, কাজে নিয়ে নাও। নরেশ অ্যাকাউন কি বলে তা পড়ছে। পরীক্ষা দিলেই কাজে ঢোকাও। জামাইকে আনো,

ভাইপোদের আনো, নিজের লোকরা থাকতে বাইরের লোক কেন? আর...

—আর কি কথা!

—গৌরী তো আমার কাছেই থাকে। যমুনা দেখছি লতাকে দেখলে ক্ষেপে যায়। লতাকে অন্য কোথাও রাখা যায় না?

—ও তো ধানবাদ যাবে না।

--দেবতাকে জানাও। লতা থাকলে যমুনা কবে কি করে বসে, সেটা অধর্ম হয়ে যাবে। যমুনার বাবা, মাতামহ আছেন.... যমুনাই লক্ষ্মী এনে দিল....

নন্দলাল নিঃশ্বাস ফেলল।

—না, যমুনার কোনো কষ্ট হবে না।

মহাপুরুষ কেমন করে কি জানলেন কে জানে। নন্দলালের সন্দেহ, সুরেশ চিঠি লিখে কিছু জানিয়ে থাকবে তাঁকে। অথবা অন্য কেউ কিছু বলে থাকবে।

তিনি জানালেন, লতার সামনে অপার সম্ভাবনা। সে যেন সত্বর চলে যায় হরিদ্বারে। তাকে সব বুঝিয়ে দেবেন চাঁদনি গ্রেবাল। তারপর লতা গুরুবাণী, প্রণাম সংগীত ইত্যাদির ক্যাসেট বিক্রি করবে দেরাদুনের আশ্রম থেকে।

এসব নির্দেশ ক্যাসেট মারফৎ এসেছিল। কণ্ঠস্বর চাঁদনি গ্রেবালের।

লতা সব শুনে গুম হয়ে গিয়েছিল। নন্দলালের সঙ্গে দেখা করার জন্যে খুব চেষ্টা করেছিল। নন্দলাল তখন রাঁচিতে। অতএব গুরুদেবের শিষ্য, নন্দলালের গুরুভাই চমনলালের সঙ্গে ওকে হরিদ্বার যেতেই হলো। যাবার সময় ও বড় বড় স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে গেল। আর করুণাকে বলে গেল, আমি সহজে ছেড়ে দেব না। এখন মেয়েছেলের ওপরহাত নেবার দিন এসে গেছে। বেটাছেলে পাপ করে পার পাবে না।

—লতা, দেবতার কাজে যাচ্ছ, মন শান্ত রাখো!

—দেবতা তোমাদের সব দিয়েছে, আমাকে কি দিল? আমি কেন শান্ত হব?

চমনলাল সুরেশকে বললেন, কিছু ভাবতে হবে না। দেবতার আদেশে এমন কত মেয়ে গেছে, আছে তারা। লতা বহিনও ভালো থাকবে।

লতা চলে যাবার পর দেখা গেল, গৌরীর গলার হারটা নেই। আর দেখা গেল, যমুনা খুব খুশি। হাসছে, খাচ্ছে ভাল করে। দেখে করুণার মনটা শান্ত হলো।

লতা দেরাদুনে পৌঁছবার পর একটা চিঠিও লেখেনি।

সুরেশ বলল, কি লিখবে?

—এখানে এতদিন থেকে গেল...

—এখানকার কথা ভুলে গেলেই শান্তিতে থাকবে। দেরাদুনের আশ্রমে নাকি খুব সুবন্দোবস্ত। লতা অন্য মেয়েদের সঙ্গে গুরু-ক্যাসেট গুরু-সাহিত্য বিক্রি করত। ঘুরতে ঘুরতেই ওর সঙ্গে কোনো লোকের আলাপ হয়। তার সঙ্গেই ও চলে যায়।

চমনলাল বলে গেলেন, দেবতার নির্দেশ মানল না। ওর কপালে দুর্ভোগ আছে।

করুণা বলল, আহা!

করুণাকে মালিশ করতে করতে সুধা বিরস বদনে বলল, তার এখন ঘর-সংসারের

শখ। পুরুষমানুষকে বিশ্বাস কি? গয়নাপত্তর কেড়ে নেবে, মেরে ফেলবে, নয় বের করে দেবে।

—কোথায় যে গেল!

—কাজের জন্যে এসেছিল, কাজ ফুরোতে চলে গেল, আর ভেবে কি হবে!

—থাক সুধা, থাক।

—দেখো মা, শুধু মালিশে কিছু হবে না। বারান্দায় হেঁটে বেড়াও। তোমাদের শুধু ঘি-দুধ খাওয়া। তাতে মোটা হয়ে যাও।

—তুমি বেশ শক্ত আছ।

—না থাকলে চলবে? বাড়ি বাড়ি মাসাজ করে বেড়াতে হবে, শরীর শক্ত রাখতে হয়।

—ছেলে একই রকম?

—একই রকম। দু'রকম হবে কোথা থেকে? তার বয়স তিরিশ, আমার বয়স পঞ্চাশ।

—ওর বাবার কোনো খবরই নেই?

—কিসের খবর? খবর এত বছরে মিলল না, আর খবর মেলে?

সুধার জীবনকাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত।

সুধার বাবা পান-দোকানী। ঘর বারুইপুরে। জড়িবুটি ওষুধ বেচতে বেচতে অনাদি পাল ওদের ওখানে এসে পড়ে। সুধার বাবাকে খুব বশ করেছিল অম্বলের ওষুধ দিয়ে। মাঝে মাঝে সুধাদের বাড়ি ভাত খেত।

জীবনকাহিনীটি বারবার বলতে সুধা খুব ভালবাসে, আর করুণাও বারবার শোনে।

—তখন তো চরিত্র জানি না। সে বলত সাতকুলে কেউ নেই তার।

—তবে যে বলো সবাই ছিল?

—ছিল, সে তো পরে জানলাম। বেটাছেলেকে বিশ্বাস করলে মরতে হয় মা।

—তারপর কি হলো?

—সে কি আজকের কথা? বত্রিশ বছর আগেকার কথা। বাবার পানের দোকান ছিল। দাদা-মেজদা ফলের বাগান করত, তবে পুকুরটা ছিল লক্ষ্মী। বছরে দু'হাজার টাকার মাছ বিক্রি হতো। কোনো কষ্ট ছিল না। বাবা ধানের জমিও কিনেছিল দু' বিঘা।

—বাবার কাছে যাও?

—কবে মরে গেছে। আর সেই জমি ভরাট করে, বাড়ির জন্যে বেচে, দাদা-মেজদা পাকা বাড়ি তুলেছে। পুকুর ভরাট করে জমি বেচেছে।

—সেখানে যাও না?

—মায়ের যেমন কথা! তারা এখন ভদ্রলোক বাবুলোক। ছেলেরা আপিসে কাজ করে। বড় ভাইপোর বউও ইস্কুলে পড়ায়। খুব অবস্থা। তার মধ্যে গিয়ে পড়লে মানসম্মান তাদের থাকে?

—তাদের তো তোমাকে দেখা কর্তব্য।

—কর্তব্যজ্ঞান যদি তোমার মতো সকলের থাকত! তুমি তো রাজরানী। সতীনকে দেখছ, তার মেয়েকে দেখছ, আমি দেখছি তো!

—ওকে বিয়ে করলে কেন?

—খুব আসত-যেত। তাতে পাড়ায় বদনাম হলো। শেষে দাদা আর মেজদা ওকে চেপে ধরল। ও বলল, বিয়ে করব বলেই মিশেছি।

—বিয়ে হলো?

—হলো। তখনকার দিনেও বাবা পাঁচ ভরি সোনা দিয়েছিল।

—তারপর?

—আমাকে তো নিয়ে তুলল জগদ্দলে। তখন দেখি দিব্যি একতলা বাড়ি, মা-বাপ-ভাইদের দিব্যি সংসার। স্বজাত-স্বঘর—সেটা মিছে বলেনি। কিন্তু বাপ কাজ করে চটকলে, ভাইরাও কাজ করে।

—তোমাকে মেনে নিল?

—না নিয়ে উপায়? আদর করেনি, আবার অনাদরও করেনি। ওর পিসির কথায় বুঝলাম যে পরিবারে ও-ই অমানুষ। চিটিং, পরের বউ-ঝি নিয়ে টানাটানি, হেন অন্যায় নেই যে করেনি। শেষে ওই মেয়েছেলের কেলেঙ্কারেই প্রচণ্ড মারধোর খেয়ে দু'বছর জগদ্দল ছেড়ে বাইরে ছিল।

—খুব দুঃখের কথা।

—দুঃখের তো সেই শুরু। শ্বশুর বলল, যা করেছ করেছ। পরের মেয়ে এনেছ, এবার কাজকর্ম ধরো। সে সময়ে চটকলে ঢোকা কিছু কষ্ট নয়। ঢোকাল তাকে কাজে। কিন্তু কাজ করবে কে? আজ ধরে, কাল ছাড়ে। আমি বলতে যেতে মারধোর। সে অনেক কথা মা!

—পূর্বজন্মে কোনো পাপ করে থাকবে তুমি।

—ভগবান জানে। ইহজন্মে তো পাপ করিনি। করিনি বা বলি কি করে? ওকে বিয়ে করে পাপই করেছি। তাতেই এত দুঃখ আমার।

—ছেলে অমন হলো, এসব পাপের জন্যে হয় সুধা। আমার মাসির ছেলে জন্মান্ধ। নিশ্চয় মাসি বা মেসো গতজন্মে পাপ করেছিল।

—কি জানব মা! তবে আমার ছেলে... বড় অশান্তিতে দুটো বছর কাটল। বাপের বাড়ি বা যাই কোন মুখে? যতবার যাই, মিনসে গিয়ে নিয়ে আসে। বাপের কাছে ক্ষমা চায় যে এমন আর করব না। প্রতিবার বাপের কাছে টাকা নেয়, সেও তো জানি না। শেষে আমার পেটে যখন আট মাসের ছেলে, তখন ধরল যে গলার হার হাতের পলার বালা, সব দাও। আমি দোকান দেব, জায়গা দেখেছি।

—তুমি দিলে?

সুধার চেহারা পাকানো, শ্যামবর্ণ, মাথার চুলে বড়ি খোঁপা, পরনে ছাপা কাপড়। চোখের চাহনি খুব তীব্র। এখন ওর চোখ কেমন যেন হয়ে গেল। সবেগে মাথা নাড়ল ও।

মনে আছে, মনে আছে সব। বর্ষার রাত ছিল। শাশুড়ী আর সুধা মিলে খিচুড়ি রেঁধেছিল। সুধার শরীর কেমন করছিল। শাশুড়ী বলছিল, মা থাকলে নিয়ে যেত।

বাপ তো সাধ পাঠিয়ে দেবেন লিখেছেন। কি বা করবেন ! বাড়িতে মেয়েছেলে নেই। এবার ঝপ করে একটা দিন দেখে একটু মাছের ল্যাজা, পায়েস খাইয়ে দেব একটা নতুন শাড়ি পরিয়ে।

সুধা বলেছিল, মা, আমি শুতে যাই। শরীরটা কেমন যেন লাগছে।

সুধা ঘুমিয়েই পড়েছিল।

মাঝরাতে খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে দেখে, ট্রাঙ্ক খুলে স্বামী ওর গয়নাবাঁধা রুমালটা বের করছে। সুধা ধড়মড় করে উঠে বসতে স্বামী বলেছিল, চেঁচালে গলা টিপে মেরে ফেলব।

গয়না বলতে হারছড়া, কানফুল, পলার বালা, আংটি আর একটা টিকলি।

কিন্তু ওই তো যথাসর্বস্ব।

সব মনে আছে।

করুণা আবার বলল, তুমি দিলে ?

—না মা। আমার পেটে দমাদম লাথি মেরে গয়না নিয়ে সে পালিয়েছিল।

—হায় সর্বনাশ !

—তাতেও মরলাম না। চীৎকার শুনে দেওররা এসে পড়ে। তারাই হাসপাতালে দিল। ছেলেও প্রাণে বেঁচে থাকল। কিন্তু ওই তো মাথায় লেগেছিল—ওই হাবা মতো হয়ে রইল। কি বলব মা ! সকালে বেরোবার আগে নাওয়ার ঘরে নিয়ে নাওয়াব, খায় আবশ্য নিজেই। কিন্তু চোখে দৃষ্টি কেমন আচ্ছন্ন, মুখে বোল নেই। বসিয়ে দিলে বসেই থাকে, কি রকম !

—ডাক্তার দেখেছে ?

—তখন দেখেছিল। জগদ্দলের অজিত ডাক্তারই তো ওর নার্সিংহোমে কাজ দিল। তারপর মাসাজের কাজ ধরলাম। কাজ করেই এতদিন চলছে।

—শ্বশুরবাড়ি আর যাওনি ?

—একসময়ে সেখানে থেকে কাজ করতাম। তারপর... ক্রমে ক্রমে.... ছেলেই নিরুদ্দেশ, তাদের ঘাড়ে বসে খাব কি করে ?

—এখন তো দিনে একশো টাকা কামাও।

—তোমরা বলো যে গুরুদেব দেবতা। আমি বলি তোমরা দেবতা। এই যে পরপর বাড়ি তুললে। ধনীমানী লোকরা এল, তা তুমি দিচ্ছ রোজ তিরিশ টাকা, মিশ্রবাবুর শাশুড়ীর বাত রোগ, সে দেয় চল্লিশ টাকা, অনেক সেঁক-তাপও করি। আর বনানী রায় রোজ পঞ্চাশ টাকা দেয়।

—এত !

—দেহ দেখিয়ে খাচ্ছে। অ্যাকটিং করে তো। দেহ ঠিক রাখতে হবে। কাঁচা হলুদ বাটা মেখে চান করে। হাতে-পায়ে দুধের সর। এ রোজগার তো তোমাদের দয়ায়।

—পয়সা জমিও সুধা।

—সে আর বলতে ! সোনাপুরের ভেতরে দু'কাঠা জমি কিনেছি। ক্রমে ক্রমে একটা ঘর তুলে নেব।

করুণা বলে, বাবুকে বলব। সে সময়ে খানিক সাহায্য দেবে। আরো কি! দেবতা আসবেন। আমার শাশুড়ী, জা সব তো আসবে। সে সময় শাশুড়ীকে মালিশ করতে হবে।

—বাবুকে স্বরূপ ঠিকমতো মালিশ করে?

—করে বই কি!

—বাবু খানিক জায়গা দিলে মাসাজ সেণ্টার খুলে দিতাম। মেয়েছেলেদের জন্যে।

—দেখি, বলব। এখন তো বলাই যাবে না কিছু। দেবতা আসছেন। উৎসব চলবে।

—এনার ক্ষমতা খুব?

—খুব ক্ষমতা। আমার ওপর তো খুব দয়া। যা বললেন, তাই হলো। বলেছিলেন, ও তোমার সতীন নয়, তোমার একটি অভাগী মেয়ে। সেই চোখেই দেখবে ওকে। তাই তো হলো। আমার বীণা, গীতার চেয়ে ওকে যেন আপন মনে হয় বেশি।

—গৌরীকেও তো দেখছ।

—সেও তো আমার মেয়ে।

—ছেলেদের বিয়ে দেবে না?

—দেবতা যা বলেন। বিয়ে তো দেবই।

—সুরেশ ছোটমাকে খুব ভালবাসে?

—খুব মমতা করে। সুরেশ ওর ঠাকুর্দার মতো। তাঁর মনেও দয়ামায়া খুব। দেখো না মনু ছোঁড়াটা কোনো কাজ করে না, মাইনে দিয়ে রেখেছি যে ছেলেদের কাজ করবি। সুরেশ তাকে পড়াচ্ছে। কি বলবে?

—বাবু কিছু বলেন না?

—বাবু বলেন, সংসার তোমার। তোমার যেমন খুশি চালাও।

—রান্নাটা বা নিজে করো কেন?

—গুরুজীর কাছে দীক্ষা না নিলে কেউ তো আমার রান্না করতে পারবে না। আর এখানে তো রান্না করতে কোনো কষ্ট নেই। দেশে কয়লার উনোন দুটো জ্বেলে রান্না তো আমিই করতাম।

—সুখে আছ।

—মেয়েমানুষকে স্বামী যেমন রাখবে তাতেই তার সুখ। তখনো সুখেই ছিলাম।

—নন্দবাবু তো দেবতা!

—কর্তব্যজ্ঞান খুব। বরাবর সব কর্তব্য তো উনিই করেছেন। বোনদের বিয়ে, ভাইদের বিয়ে, মেয়েদের বিয়ে, দেশের ঘরবাড়ি-জমিজমা সব এক হাতে করেছেন। দেবতার আশীর্বাদ!

—দেবতাকে আমরা দেখতে পাব?

—নিশ্চয় পাবে।

—দেখি! ছেলেটাকে এনে পায়ে ফেলে দেব। বলব, এক ভাল করে দাও ঠাকুর!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় আসবে। সে কয়দিন তো এখানে খাবে, ছেলের খাবার নিয়ে যাবে। দিল্লী থেকে শাকাহারী হোটেলের লোকজন আসবে। আমি বলেছি, কয়েক

দিন সদাব্রত চলবে। সদাব্রত বড় পুণ্যের কাজ।

—যমুনাজী খুব ঘুমোচ্ছে?

—হ্যাঁ, এখন খুব শান্ত আছে।

—নাও, ওঠো এবার।

—তোমার মালিশের জোরে বেঁচে আছি সুধা। তুমি নইলে আমি বাঁচি না।

—দুপুরে খাওয়াটা ছেড়ে দাও। ঘোল খাও, ফল খাও। দেখবে, চর্বি কমে যাবে।

—তাই করব। তা মিশ্রজীর ঘরে আজ কি হলো?

—কি হবে? মেয়েকে পুড়িয়ে মেরেছে, তা কেস করবে না! নাতনীটাকে নিয়ে এসেছে। জামাই তো চায় ছোট মেয়েটাকে বিয়ে করতে। সে ওরা দেবে না।

—দেবে না বলছে, দিতেও পারে।

—কি জানি! বড় মেয়ে আর জামাই বরাবর নাকি ভালবাসত দু'জনে দু'জনকে। তা এই কি ভালবাসার নমুনা?

করুণা বলে, এখন এসব খুব বেড়ে গেছে। আমাদের দেশে আমাদের জাতে তো খুব বাড়াবাড়ি। ছোট মেয়েটার বিয়ে দেবার আগে কম ভেবেছি? শেষে বাবু বলল, ভেবে কি করবে, বিয়ে দিয়ে দাও।

—মা, জামাই তোমার অনুগত। সে কখনো মেয়ের ক্ষতি করবে না। তোমার মেয়েকে খুশি রাখলে তারই ভালো। যাতে যার ভালো সে যদি তা বোঝে তাহলে তো সংসারে কোনো ঝামেলা থাকে না। তোমার জামাই জানে যে শ্বশুরকে ধরে থাকলে তার উন্নতি।

—এবার তবে এসো সুধা। গৌরী তো উঠবে এখন। দশটা নোকরানী রেখেও বা লাভ কি মা! সেই তো আমাকেই দেখতে হয়। এবারে দেশ থেকে বাবুর পিসিকে এনে নেব। থাকবেন কেশ গার্জেনের মতন। সব দেখেশুনে রাখবেন।

—সেই তো ভাল। আপনজনের মতো আর কে আছে তা বলো? আজ উঠি মা। তবে এটি জেনো, মিশ্রজীর ছোট মেয়ে কখনোই ওর জামাইবাবুকে বিয়ে করবে না। মেয়েকে দেখেছ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবতার শিষ্য তো!

—ছাতে টেনিস খেলে। গাড়ি চালায়। খুব চালাক মেয়ে।

—বয়সও কম।

—এখন উনিশ-কুড়িকে লোকে বয়স কমই বলে। আগে বলত অনেক বয়স। উঠি গো মা! বনানী দিদির জন্যে চন্দন বেটে নিয়ে যাচ্ছি।

—বনানীর মনটা ভাল। তোমাকে দামী দামী কাপড়-চোপড় দেয়।

—ও এক হাতে দেয় আমি অন্য হাতে বেচে দিই। ওসব কাপড়-চোপড় আমি পরতে পারি?

—দেবতার কাছে দেখা করতে আসবে যখন, একখানা ভালো কাপড় পরে এসো।

—সে আর বলতে হবে না।

সুধা চলে গেলে করুণা উঠে বসে। মিশ্রর ছোট মেয়ে সালোয়ার কুর্তা পরে ঘোরে। সুধা বলছিল, ছোট মাকে সালোয়ার কুর্তা পরিয়ে রাখলে পার। শাড়ি তো সামলাতে পারে না। কথাটা ভাল বলেছে। এখন নয়, দেবতা আসুন, চলে যান, তারপর।

নন্দলালের ছবির দিকে তাকায়।

পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে তবু চেহারা দেখো, যুবকের মতো। করুণাই দিন দিন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

ছোট মেয়ের শাশুড়ী চুলে কলপ লাগিয়ে খুকি সেজে থাকেন।

ছোট মেয়েকেও আদরে রেখেছেন।

টাকা, টাকা, টাকাটাই সব।

নন্দলাল মেয়ের বাপ, মেয়েকে ওরা কষ্ট দেবে না। নন্দলালের চেনাশোনা অন্তহীন। সরকারী আমলা, বড় বড় নেতা, কয়েকজন মন্ত্রী, পুলিশের অফিসার, বড় ব্যবসায়ী—নন্দলাল তো জাতে উঠে গেছে।

দেবতা কৃপা করেন তো নন্দলাল কোন বড় হাসপাতালের কাজ নাকি পেয়ে যাবে। কিছু কাজ পেলেই কোটি কোটি টাকা হবে। সে টাকা পেলে তবে নন্দলাল কলকাতার কাছে জমি কিনবে। দেবতার আশ্রম বানাবে।

ভক্তনিবাস তৈরি হবে। ধনী ভক্তরা থাকবেন। দয়াশ্রমজী থাকবেন আশ্রমের দায়িত্বে। তৈরি হবে প্রেস, দেবতার বই ছাপা হবে। আশ্রমের জন্যে হাসপাতালও হবে।

দেবতা তো চান যে কলকাতায় তাঁর কেন্দ্র গড়ে উঠুক। কলকাতা নাকি ধর্মনগরী। এখানে মানুষ বড় ধর্মপ্রাণ। দুর্গোৎসবে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। শনি-সন্তোষী মা-শিব-শীতল-সতীমাতা—সকলের পূজা চলে রমরমিয়ে।

দেবতা এই কলকাতায় তাঁর মর্মবাণী ছড়িয়ে দেবেন নন্দলালের সাহায্যে।

আত্মোন্নতি করো। নিজের উন্নতি হলো মুখ্য লক্ষ্য। তুমি যত উন্নতি করবে, তোমাকে ধরে আর দশটা মানুষ ভাত-কাপড়-টাকা-বাড়ি-টি. ভি.-গাড়ি পাবে।

নিজেকে ভালবাসতে শেখো। তবেই তো পরকে ভালবাসতে পারবে।

আসুন দেবতা। করুণা ভাবল, সুরেশ নরেশের বিয়ে দিয়ে সে আর যমুনা গৌরীকে নিয়ে দেবতার আশ্রমেই চলে যাবে।

দুই

"দেবতা আসুন" মনে করা এক, কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটি গুছিয়ে তোলা সোজা কথা নয়। নন্দলাল অনেক ভেবেচিন্তেই পি. সি. বা প্রভঞ্জন চ্যাটার্জী বা বাউলকে খবর দিল।

বাউল এ শহরে এমন এক কনট্রাকটর, যার কথা কেউ জানে না। বাউল একসময়ে অপরাধ জগতে এক সেনাপতি ছিল। চিরকালই ও প্ল্যানার ও অর্গানাইজার। খুন-ব্যাঙ্কডাকাতি-গাড়িচুরি-চোরাকারবার—এসব কাজে অনেক প্ল্যান ও করে দিয়েছে। সে সব প্ল্যানে কাজও হয়েছে।

পুলিশ তাকে বড় ভালবাসে। কারণ দুর্জ্ঞেয়।

বাউল অদ্ভুত সব ব্যাপারের ঠিকাদারী নেয়। যেমন এই যে দেবতা আসবেন, নন্দলাল তো হিমশিম খাচ্ছিল।

অপরেশবাবু বললেন, কোনো ঝামেলা হবে না। পাঠিয়ে দিচ্ছি বাউলের কাছে।

বাউল নিজের ঘরে ইলেকট্রিক ধুনি জ্বেলে কালীর ছবির সামনে বসে থাকে এবং সারাদিন চামচ চামচ হুইস্কি খায়।

বাউলের একটি হাত কাঁধ থেকে কাটা।

সে বলল, বসুন, বসুন।

নন্দলাল বসল।

সব শুনে বাউল বলল, দমদম থেকে সামনে পেছনে মোটর সাজিয়ে এনে দেব ওঁকে—মোটরে ক্যাসেটে গান বাজবে।

—ওঁর গাড়ি....

—সাদা আর গাঁদায় সাজানো থাকবে।

—তারপর...

—পৌঁছে দেব। পরপর প্রোগ্রাম যেমন চান তেমনি হবে।

—ভি. আই. পি-রা আসবেন...

—তাঁরা আসবেন। ভক্তরা প্রণামী দেবেন—সবাই দর্শন করতে আসবে। এই তো?

—আজ্ঞে।

—ভাববেন না। পঞ্চাশটা সিকিউরিটি রাতদিন পাহারা থাকবে ভেতরে। পঞ্চাশ সিকিউরিটি বাইরে ভিড় সামলাবে। প্রত্যেকে সাদা জামাপ্যান্ট পরবে। কাঁধে থাকবে প্লাস্টিকের গাঁদা ফুল।

—আপনি থাকবেন না?

—আমি তো গুরুদেবের কামরাতেই থাকব। ওঁর সিকিউরিটি দেখব। পাঁচ লাখ।

—পাঁচ লাখ!

—পাঁচ লাখ। কাপুরকে বলে দিন বাউল বলেছে, ও দুই দিয়ে দেবে।

—ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!

—ওখানে মদ-মাংস চলবে না তো?

—না, না—সব পবিত্র শাকাহারী।

—কোনো গোলমেলে ব্যাপার ঘটবে? কাউকে ক্যালাতে হবে? সেজন্যে আলাদা রেট।

—না না, তা হবে কেন? দেবতা তো নরদেহে দেবতা। কলকাতায় এটা ওঁর মুহরত। কলকাতায় ওঁর সেণ্টার হবে।

—জানি।

বাউল ফটাস করে গলায় ঝোলানো হারের পদক খোলে।

দেবতার ছবি, দেবতার ছবি!

—আপনি...

—হ্যাঁ। আমার সিকিউরিটি ম্যানেজমেণ্ট ব্যবসা উনি করে দিয়েছেন।

—আপনাকে তো ওখানে....

—নিষেধ ছিল। এটা বুঝলেন না, যে অন্য কেউ হলে আমি দশ লাখ নিতাম? কেন নেব না বলুন! আমাকে একশোটা পরিবার পুষতে হয়। এ সবই দেবতা জানেন।

নন্দলাল অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়।

—অপরেশবাবু না বললে...

বাউল বলে, মানুষ মন্দ থাকে, ভাল হয়। আমার যে বাঁ হাতটা নেই, সেটা অপরেশবাবুর হুকুমেই নেমে গিয়েছিল। তা বলে কি আমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ আছে? নেই। আজ অপরেশবাবু আর আমি, এ-ওকে সাহায্য করছি। দেবতা বলেন, এইভাবেই একদিনে বাঘে-সিংহে এক ঘাটে জল খাবে।

—অপরেশবাবু...পুলিশ?

—ছিলেন। নেই। বর্ডার থানা। নবাব বাদশা হয়ে গেছল। আমিও তখন বর্ডারে রাজা। দিন দু'হাজার কামাই। ভাগবাটরা নিয়ে বিবাদ হয়ে গেল। অমন বিবাদে হাত নেমে যায়, মাথা নেমে যায়...

ঘোর শাকাহারী নন্দলাল শিউরে ওঠে। বংশ গোপালভক্ত। চিরকাল শাকাহারী। এত রক্তপাত, হিংসা—ও ভয় পেয়ে যায়।

—ভয় পেলে চলবে না নন্দলালবাবু। কাজে নেমেছেন। লেবার ট্রাবল হতে পারে, পালটা কোন কনট্রাকটরকে জব্দ করতে হতে পারে, তখন বাউলকে লাগবে। কথায় কাজ হবে না।

—দেবতা বলেন, ধর্মরাজ্য হবে।

—আপনি এখনো খোকাবাবু আছেন। জীবনে সাওসের কাজ করেননি। ওই যা লতাকে...

—বলবেন না, বলবেন না।

—আরে ধর্মরাজ তো হবে! কিন্তু তার জন্যে রক্ত দিতে হবে। মহাভারত দেখেন না?

বেরিয়ে আসে নন্দলাল। এখন তার মনে হয়, দেবতা বললেন, যমুনাকে বিয়ে করল, কলকাতায় অগাধ সম্পত্তি হলো, সবই ঠিক। দেবতার কৃপাতে তার অবিশ্বাস নেই। কিন্তু বাউল আর অপরেশবাবু দু'জনেই দেবতার কৃপাধন্য? এরাও তার গুরুভাই?

ঐশ্বর্য পেলে মাথা ঠিক থাকে না এ কথাও সত্যি। নইলে লতার সঙ্গে অমন সম্পর্ক হয়ে গেল কেমন করে? গৌরী তো লতার মেয়ে!

মেয়েকে কেড়ে রেখে লতাকে বের করেই তো দিতে হলো। লতার আকাঙ্ক্ষা ছিল ঘর-সংসার করবার। নন্দকে বলেছিল, দশ বছরে বিয়ে, বারো বছরে বিধবা,

তেরো বছর বয়স থেকে যমুনার দাসী-বাঁদীর চাকরি করেছি। টাকা পাইনি। ভাত-কাপড় পেয়েছি। এখানেও যমুনার বাঁদী হয়েই থাকছিলাম। কিন্তু এখন তুমি আমাকে বিয়ে করো।

—দেবতা যা বলেন!

—দেবতা বললে বিয়ে করবে?

—নিশ্চয় করব।

দেবতা তো "হ্যাঁ" বললেন না। বললেন, তীরে এসে তরী ডোবাবি? যমুনাকে বিয়ে করেছ, ব্যস। লতাকে বিয়ে করতে পারো না। ও বিধবা। বিধবার আবার বিয়ে ধর্মে সয় না। সন্তান নষ্ট করতে বলি না। জীবহত্যা মহাপাপ। বরঞ্চ লতা আশ্রমে থাকুক। যমুনার সন্তান বলেই ওকে সবাই জানবে।

যমুনা সব বুঝতে পেরেছিল। নন্দলালকে দেখে ভয় পেত আর লতাকে দেখলে ক্ষেপে যেত। সে জন্যেই তো লতাকে....

এই সব পাপ হয়ে গেছে।

করুণাও সব বোঝে। সুরেশ, নরেশ, বীণা, গীতা, ভাইরা—কে বোঝে না? গৌরীর রং লতার মতো ফর্সা, নাক-চোখ-কপাল লতার মতো। গৌরী অবশ্য খুব বঞ্চিত হয়নি। করুণা ওকে মায়ের মতো ভালবাসে। যমুনাকে বিয়ে করেছে নন্দলাল। কিন্তু তাকেও যত্ন করে শান্ত রাখে করুণা।

অপরেশবাবু বলেন, আইন দেখালে আপনার এ বিয়েটা সিদ্ধ নয়। সেদিন নেই যে য-টা ইচ্ছে বিয়ে করলাম। তবে দেবতার রায় তো আইনের ওপরে। তাই বলতেই হবে এ বিয়ে পবিত্র।

সমস্ত ব্যাপারটাই বড় গোলমেলে।

নন্দলাল শান্ত স্বভাবের মানুষ। মনে পাপবোধ আছে। দেবতাকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে পারলে সে-সব পাপের ক্ষালন হবে বলেই বিশ্বাস।

কিন্তু বাউল "রক্ত" বলল কেন?

নন্দলাল গুরুদেবের ছবি আঁকা পদকটি আঁকড়ে ধরল। হে দেবতা, এমন কোনো কাজে আমাকে নিও না, যাতে খুনখারাবা করতে হয়। আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠা করব। তোমার মাহাত্ম্য প্রচার করব।

সিকিউরিটি বাউল দেখবে।

প্রচার ও বিজ্ঞাপন?

এটা প্রচারেরই যুগ।

অপরেশবাবু না থাকলে এ কাজও হতো না। অপরেশাবাবু যোগাযোগ করেছেন মস্ত এক বিজ্ঞাপন আপিসের সঙ্গে। দেবতাই সব করাচ্ছেন। তাঁর শিষ্য নিতাই দত্ত, যিনি এ রাজ্যে বাঁধ মেরামতির নামে মেরামত করেন না, যিনি একবারে কাজ না সেরে বছর বছর এক কাজই করেন, এভাবে তিনি কত টাকা করেছেন তা নিজেও জানেন না।

সেই নিতাই দত্ত বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে টাকা দিচ্ছেন।

দেবতাই নাকি তাঁদের উন্নতির পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওরে একবারে নয়, বারে বারে কর্‌! একবারে কাজ করলে ক'টা লোক ক'দিন কাজ পায়? বারে বারে করলে কত লোক কাজ পায়, ভাব্‌?

—দেবতা, নদীর ভাঙন যে বাড়ছে!

—নদীর ধর্ম ভাঙা, সে ভাঙছে। এ হলো ভগবানের তৈরি নিয়ম। মানুষ পাপের কারখানা বসিয়েছে, নদী মানুষের বাড়িঘর ভাঙছে।

এসব পুরনো কথা।

সেই থেকে নিতাই দত্ত এক বাঁধ বারবার মেরামত করছেন আর টাকা করছেন।

কলকাতা নামক ধর্মরাজ্যে দেবতার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা পাক, এটা তাঁরও স্বপ্ন।

নিতাই দত্ত মনেপ্রাণে বাঙালী।

তিনি বলে থাকেন, বাঙালী ধর্মগুরু, তাঁর ভারতজোড়া জয়জয়কার, অথচ কলকাতা হেড আপিস, এ অনেক কাল হয়নি। পরমহংসদেবও দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। খাস কলকাতার বুকে বাঙালী মহাপুরুষ প্রতিষ্ঠা পেলে এ রাজ্য আবার জাগবে।

তিনি বললেন, ইলেকট্রা!

নন্দলাল বিচলিত।

—বিজলি লাইন তো ঠিক আছে। ভালো ভালো জেনারেটরও আছে।

—ইলেকট্রিক নয়, ইলেকট্রা!

—সেটা কি?

—বিজ্ঞাপনের এজেন্সি।

—তারাই কাজ করবে?

—হ্যাঁ। চলুন, সেখানে যাই।

—চলুন।

ক্যামাক স্ট্রীটে বিশাল অফিস। নন্দলাকে মানতে হলো, সিনিমাতেও এরকম ঘর সাজানো দেখা যায় না। দেয়ালে প্রলম্বিত ছবিগুলো কিছু দুর্বোধ্য, কিন্তু নিতাইবাবু বলল, ওসব হচ্ছে মডার্ন আর্ট। বোঝেন?

—না সার।

—আমিও বুঝি না। চলুন।

এত বড় আপিসের হর্তাকর্তা এক বাঙালী মহিলা, যাঁর চেহারা অতীব সুদর্শনা। যাঁর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট এবং চোখে বিরক্তি।

নিতাই দত্ত আগেই বললেন, বাংলায় বলবেন মিসেস সাহানা। নন্দলালবাবু ইংরিজি তেমন বোঝেন না।

—অবশ্যই। কফি? চা? ঠাণ্ডা?

—কিছু চাই না।

—কার সঙ্গে কথা বলব?

—দু'জনকেই বলুন।

—ক্লায়েন্ট কে ?

—নরদেহে ঈশ্বর। আমরা তাঁর এজেন্ট মাত্র। ধরুন আমরাই তাঁর হয়ে...

—কে, বলুন তো ?

—মহাপুরুষ।

—মানে হরিদ্বার ?

—আজ্ঞে।

—মানে "আগে আত্মোন্নতি কর" ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিসেস সাহানা গলার হারটি তুলে ধরলেন। লকেটে দেবতার ছবি।

নিতাই দত্ত মাথা নেড়ে বললেন, আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! তাহলে আপনি আমাদের...

—গুরুবোন হলাম।

—আপনাকে এ ব্যবসায়ে তিনিই কি.... ?

—অবশ্যই।

মিসেস সাহানা অভিভূত।

—দেখুন, কলকাতায় আমরা কতজন তাঁর শিষ্য, তাঁর সেবক, অথচ এ-ওকে চিনি না।

নন্দলাল সরল বিশ্বাসে বলল, সবই তাঁর ইচ্ছা। তিনি যখন মনে করবেন সকলে সকলকে চেনার সময় এসেছে, তিনি জানাবেন।

—সত্যি, সত্যি !

—কিন্তু দিদি, দোষ নেবেন না, সিগারেট খুব খারাপ জিনিস।

—এ সে সিগারেট নয়। আমার হাঁপানি আছে। এ ওঁর দেয়া দৈবী ওষুধের গুঁড়ো। এভাবে খেলে ভালো থাকি।

নিতাই দত্ত বললেন, কাজের কথাটা হয়ে যাক। গুরুদেব আসছেন কলকাতা।

—সত্যি ?

—কলকাতাকেই হেড আপিস করবেন ক্রমে ক্রমে। এবারকার উৎসব দিয়ে শুরু। নন্দলালবাবু মহাপুণ্যবান। ওঁর বাড়িতেই উঠবেন। "নন্দালয়" বাড়ির নাম শুনে থাকবেন। সে বাড়ি যেন ইন্দ্রপুরী !

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, ওয়ান বাই ওয়ান সি বাই ডি, এইচ. এইচ. রোড ?

—ঠিক ধরেছেন।

—আরে, ও বাড়িতে আমরা অ্যাড ফিল্‌ম তুলেছি ! সেই যে ফোর সার্কেল শাড়ির বিজ্ঞাপন !

নন্দলাল খুবই বিব্রত।

—ওসব শোভন জানবে। ও বিল্ডিং কেয়ারটেকার কাম সুপারভাইজার। আমি জানি না।

—বা, তারপরেই বনানী রায় ফ্ল্যাট কিনল। অ্যাডমডেল ছিল। টি. ভি. সিরিয়ালে করছে...

—হ্যাঁ...উনি আছেন বটে।

—যাক গে, বলুন।

—নিতাইবাবু বলবেন।

—রাস্তায় মোড়ে মোড়ে বড় হোর্ডিং চাই। খবরের কাগজে ফুল পেজ চলবে দু'দিন। প্রত্যেক কাগজে ওঁর জীবনকথা বেরোবে।

—মেটিরিয়াল?

—দেব, তৈরি করে নেবেন। তারপর বড় বড় পাঁচজন লোকের পুরো ইন্টারভিউ দেব। ফিল্‌মস্টার-ব্যবসায়ী-রাজনীতিক নেতা-নামকরা অধ্যাপক-একটি সাধারণ গৃহবধূ।

—ব্রিলিয়াণ্ট! কাগজে যাবে?

—নিশ্চয়। বিজ্ঞাপন।

—বাজেট?

—আনলিমিটেড। তারপর কলকাতায় প্রস্তাবিত মহাপুরুষ কেন্দ্রের পুরো নকশা ছাপবেন। আর সাহায্য, ডোনেশন প্রার্থনা থাকবে। সই থাকবে কলকাতার টপ দশজন নাগরিকের।

—বিশাল ব্যাপার।

—বিশাল পুরুষ যে। তারপর নন্দালয়ে সাত দিনের প্রোগ্রামও ছাপিয়ে দেবেন।

—ভিড় সামলাতে পারবেন?

—ভাববেন না। আমাদের শুধু কর্মে অধিকার, ভাবনায় নয়। বাঙালীকে উদ্ধার করতে বাঙালী মহাপুরুষ ব্যাপারটায় জোর দেবেন।

—অবশ্যই।

—প্রত্যেকটা বিল যাবে আমার কাছে।

—নিশ্চয়। এটাও জানবেন, ইলেকট্রা ওঁরই অবদান। তাই কোনো প্রফিট রাখব না।

—সে আপনার বিবেচনা।

—উনি টক দেবেন না?

—নিশ্চয়। এই দেখুন ঃ

রামশিলাও চাই, বাবরি মসজিদও চাই—

কলকাতা ধর্মের পীঠস্থান—

মহাপুরুষ দর্শন পথে জীবের মুক্তি—

আত্মোন্নতি মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন—

কর্মী সৈনিক গঠনের আবশ্যকীয়তা—

পাঁচ দিনই টক চলবে, ছ'দিনই দর্শন। শুধু প্রথম দিনটা উনি মৌন থাকবেন। নো ডিসটার্বেন্‌স।

—দেখা করতে যাঁরা আসবেন....

—কম্পুটার, কম্পুটার...

—রিসেপশানিস্ট ইত্যাদি....

—আগের দিন এসে যাবেন।

—ওঃ ! বাদাম তেল কেচ্ছার পর আমার স্বামী তো ডুবে যেতেন। স্ট্রোকই হয়ে গেল। মেয়ে স্বামী ছেড়ে চলে এল। ছেলে বিয়ে করল একজন ডিভোর্সিকে। সেদিন গুরুদেব না থাকলে...

—সব ঝামেলা মিটিয়ে দিলেন ?

—নিশ্চয়। তেলের লাইসেন্স বেচে দিলাম বম্বের মালখানির কাছে, সব উনি ঠিক করে দিলেন। এ অফিসও মালখানি ব্যবস্থা করে দিলেন। স্বামী গুরুদেবের যোগাশ্রমে ফাইন আছেন কসৌলিতে। মেয়ে স্বামীর কাছে ফিরে গেছে। ছেলে বউকে ডিভোর্স করে গুরুদেবের নির্বাচিত মেয়েকে বিয়ে করেছে। দু'জনেই অফিসে বসে। আর আমি একটা নতুন জীবন পেয়েছি।

—তাঁর দয়ার তুলনা নেই।

—স-ব হয়ে যাবে ভাই।

সবই হয়ে যেতে থাকল।

নন্দলাল কাগজ খুলে চমৎকৃত।

চিত্রতারকা শ্রাবণ ঘাটকোলে লিখেছে, শেষ ছবি "জিন্দগী এক মেল ট্রেন" মার খাবার পর আমি তখন বিপর্যস্ত। প্রোডিউসার ছিলাম, নিজের টাকা ডুবে গেছে। বউ ছেড়ে চলে গেছে। কোনো ডিরেক্টর নিতে চায় না।

মনের কথা কাকে বোঝাব ? রোমিতা দেশাই বুঝত, কিন্তু সে ছিল আমেরিকায়। প্রাণের বন্ধু মুকুট আনোয়ার, আত্মহত্যা করে বসল। আমার মনে তখন আত্মহত্যার চিন্তা পেয়ে বসল।

এ সময়ে আমার জীবনে এলেন অমৃত দাদা। আপনারা ওনাকে বাষট্টিটি ছবিতে বড় দাদার রোলে দেখেছেন। আর আমি জানি উনি কত অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছে সত্যিই বড় ভাই।

ভাইয়া আমাকে নিয়ে গেলেন তাজ হোটেলে মহাপুরুষকে দর্শন করাতে। আমাকে দেখেই উনি বললেন, পরশু তুমি গোয়া যাচ্ছ। সেখানে মোহন প্রকাশ তোমাকে খুঁজছে। দশ লাখ নয়, এক লাখে কাজ করবে। সব সাদা টাকা। "সুহাগ, কেয়া আগ" ছবিতে জান লড়িয়ে কাজ করবে। তারপর রেজাল্ট দেখে হরিদ্বারে আমার কাছে আসবে।

পরের ইতিহাস তো আপনারা জানেন। "সুহাগ, কেয়া আগ" ছবির পর শ্রাবণ ঘাটকোলে আর পেছন ফিরে তাকায়নি। রোমিতাকে নিয়ে আমি সুখের সংসার পেতেছি। রিমা, আমার মেয়ে, আমাদের প্রাণ।

মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আমার ভি. ডি. ও. ছবি "আগ জ্বলাতা নেহী, জীবন

দেতা" হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। ওঁর আশীর্বাদে আমি বিস্মৃত অথচ জীবিত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্যে "উনকো ভুলো মত" বৃদ্ধাবাস তৈরি করেছি ওই ভি. ডি. ও. বিক্রি করেই। আমি বিশ্বাস করি ভারতের মুক্তিপথ উনি দেখাবেন। ওঁর তুল্য ধর্মীয় নেতা আজ আরেকজন নেই।

প্রেমলাল চৌহান তো বড় ব্যবসায়ী। বিশাল হীরক ব্যবসায়ী। এসব ল্যোক যে মহাপুরুষের ভক্ত তাই জানত না নন্দলাল।

আমরা সাতপুরুষে ডায়মণ্ড মার্চেন্ট। বম্বে, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে আমাদের দোকান আছে। ইতিহাস বলে, লর্ড কার্জনকে একটি হীরের আংটি উপহার দিয়ে আমার পূর্বপুরুষ খুব নাম করে ফেলেন।

আমরা হীরে কিনি, বেচি। কিন্তু দুবাইয়ের এক শেখের বেগমের জন্য তৈরি হীরের নেকলেস চুরি যাওয়াতে আমরা ভীষণ বিপাকে পড়ে যাই।

সে সময়ে অপরেশবাবু আমাদের নিয়ে যায় মহাপুরুষের কাছে। আমাকে দেখেই বললেন, সুরজগড়ের মহারানীর গৃহদেবতা মহালক্ষ্মীর জন্যে যে গয়না করেছ, সে বাক্সটা দেখেছ? দেখে এসো, তারপর কথা বলো। আর নিজের ভাইপো যখন নয়, ওই লোকটাকে আর রেখো না।

কি আর বলব! হীরের হার ফিরে পেলাম। সেই থেকে দেশবিদেশের অর্ডার পাচ্ছি। তাঁর মধ্যে আমি ভগবানকেই দেখছি। বিশ্বাস রাখি, দেশবাসীও ওঁকে চিনবে।

রাজনীতিক নেতার রাজনীতিক জীবন যখন শেষ হতে বসেছিল, সে সময়ে মহাপুরুষ বলেছিলেন, যাঁর জন্য ও এত ভয় পাচেছ, সে নেতা তো গেলেন বলে। গলায় মাফলার বাঁধেন, কত দিন বাঁচবেন?

সইফুদ্দিন সায়েব গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে গলায় মাফলারের প্যাঁচ খেয়ে হঠাৎ মারা যান একথা সবাই জানেন।

তাঁর মৃত্যুর পর আমাকে না ডেকে উপায় ছিল না। দুর্নীতির অভিযোগ, স্বজনপোষণের অভিযোগ, যুব সংগঠনের অভিযোগ, বিশেষ করে স্কুল কমিটি ভেঙে দেবার অভিযোগ, কোনোটাই অপ্রমাণিত ছিল না।

সইফুদ্দিন সায়েব প্রবীণ নেতা, এত দুর্নীতি সইতে রাজী ছিলেন না।

প্রস্তাবিত শিশু পার্কের জায়গায় সমবায়িকা গোছের দোকান-রেস্টুরেন্ট-ছোট একটি অডিটোরিয়াম করার ব্যাপারে আমাদের নেতার সঙ্গে সইফুদ্দিন সায়েবের অত্যন্ত মনান্তর ও মতান্তর ঘটে যায়। এটা এমন পর্যায়ে যায় যে ওপরের নেতারা আলোচ্য নেতাকে কিছুকাল অবসর নিতে বলেন। "অভিযোগগুলি আলোচনা করা হবে। আপাতত বসে যান আপনি।"—এই গোছের কথা।

সইফুদ্দিন কথা দিয়েছিলেন যে ছোটদের পার্কটা হবেই হবে। এটাও নাকি বলেছিলেন, পার্কটা যদি না হয়, আনীত অভিযোগের তদন্ত ও বিচার যদি না হয়, তাহলে আমাকে চলে যেতে হবে পাড়া ছেড়ে। বুঝব যে আমার দলও আমাকে বিশ্বাস পায় না, আর মানুষের চোখে তো আমি বিশ্বাসযোগ্য থাকবই না।

প্রত্যেক দিন সকালে জামাইয়ের গাড়িতে সইফুদ্দিন সায়েব মাইলখানেক গিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিতেন। তারপর হেঁটে বাড়ি ফিরতেন। সেদিন একটু কুয়াশা ছিল। পথে একটা গরু এসে পড়ায় ড্রাইভার গাড়ি পাশ কাটাতে গিয়ে নালায় গাড়িসুদ্ধ উল্টে পড়ে। ড্রাইভার খানিক জখম হয়। আর সইফুদ্দিন সাহেবের মাফলার জানলায় আটকে গিয়ে ফাঁস লেগেই তিনি মারা যান।

এরপর, যে জন্যই হোক, আলোচ্য নেতার বিরুদ্ধে তদন্তসকল আর আনীত হয়নি।

তাঁর রাজনীতিক পুনর্বাসনের কোনো অসুবিধা হয়নি। এই নেতা এখন মনে করেন যে মহাপুরুষ জাতির জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়।

নেতার ব্যাপারটি লেখার সময়ে কাগজে সেই বিবৃতি ছাপা হয়েছে, যা নেতার সেক্রেটারি তৈরি করে দিয়েছেন। একমাত্র এই বিবৃতিতে মহাপুরুষের অতীত প্রসঙ্গে তাঁর দেশপ্রেম, হিমালয়ে অজ্ঞাতবাসে দেশকে উদ্ধার করার পথ সন্ধানে ব্যাকুলতা, এসব কথাও ছাপা হয়েছে।

অধ্যাপকের পরিচয়, তিনি দর্শনের অধ্যাপক। বেদান্ত দর্শন, চার্বাক দর্শন থেকে মার্কসীয় দর্শন, সব গুলে খেয়েও তিনি শান্তি পাননি। মনে করেছিলেন যে একটা নতুন দর্শন দরকার, যা ধর্মবোধ জাগাবে, মানুষকে ঐহিক কর্মে উদ্দীপিত করবে, বাস্তববোধ এনে দেবে মনে। বাঙালীর বাস্তববোধ নেই, বাঙালী পথভ্রান্ত। একটি সঠিক দর্শনবোধ নেই বলেই বাঙালী এত এলেবেলে, গোলমেলে, নিজ বাসভূমে পরবাসী।

এটাও সত্যি যে অধ্যাপক ক্রমে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর লিখিত ও বহুল বিক্রীত দশ হাজার দর্শনের বইসহ প্রকাশকের গুদামঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একই সময়ে পায়ের কড়া কাটতে গিয়ে তাঁর ছেলের পায়ে ক্ষত হয়ে যায় ও বাড়ির ব্যালকনি ভেঙে পড়ে পোষা কুকুর মারা যায়।

মনের এ হেন অবস্থায় তিনি তাঁর এক বন্ধু মাধ্যমে "কোন পথে মিলিবে মুক্তি" বইটি হাতে পান এবং পথ পেয়ে যান। চলে যান হরিদ্বারে। যখন ফিরে আসেন তখন তাঁর মনে নবজন্ম ঘটে গেছে। মহাপুরুষ তাঁকে স্ববিশ্বাসে এনে ফেলেছেন।

না, অধ্যাপক আর পাঠ্যবই লিখবেন না। নিজে প্রেস করেছেন। সে প্রেস থেকে গুরুবাণী ছাপবেন, প্রচার করবেন। না, তিনি আর পড়াবেন না। বাড়িতে ক্লাস নেবেন ও জ্ঞানপিপাসুদের বোঝাবেন গুরুদর্শন। অধ্যাপকের মতে এই গুরু নেতা+ধর্মগুরু+দার্শনিক+তাত্ত্বিক +কর্মবীর।

এমন সব তা'বড় তা'বড় মানুষদের সঙ্গে গৃহবধূ শ্রীলা গুহরায়ের সাক্ষাৎকারও বেরোয়।

খাদ্য দপ্তরের কেরানী দীপক গুহরায়ের স্ত্রী শ্রীলা এক সাধারণ গৃহবধূ। সে শুধু রেঁধেছে, সন্তান পালন করেছে, সংসার করেছে।

আজও সে রাঁধছে, সন্তান পালন করছে, সংসার করছে।

মধ্যবর্তী অবস্থায়, তার স্বামী ফ্ল্যাট কেনার জন্যে বন্ধুকে টাকা দিয়ে ঠকে যায়। বন্ধু টাকা মেরে পালায়। খবরের কাগজে সৌন্দর্যচর্চার নিয়ম পড়ে কি সব মাখতে গিয়ে ওর মেয়ের মুখের রং নীল হয়ে যায়। আর ছেলে "পড়ব না, খেলব" বলে ফুটবলে নেমে যায়।

শ্রীলা গৃহবধূ, শুধু গৃহবধূ। সে মাঝে মাঝে বোনের সঙ্গে তাঁতের কাপড়ের ব্যবসা করেছে মাত্র, আর কিছু নয়। পাড়ার পূজোয় ঘুগনির স্টল দিয়েছে, সেলাইয়ে প্রাইজ পেয়েছে।

এই শ্রীলার জীবনে অতগুলো বিপদ এসে পড়ার ফলে ও খুব বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তখন ওর মেসোমশায়ের দাদা অপরেশবাবুর পরামর্শে ও চলে যায় দার্জিলিং। মহাপুরুষ সে সময়ে দার্জিলিঙে, শিষ্যগৃহে। শ্রীলাকে দেখেই তিনি বলেন, "আয় মা, আয়! মাকে তো "মা" বলি, মেয়েকেও বলি। আয় বাপের বুকে আয়।"

শ্রীলার বক্তব্য, সেই যে বুকে তুলে নিলেন, আর তো নামাননি। মাঝের কথা আর বলব না। কিন্তু আজ বাগুইহাটিতে আমার ফ্ল্যাট হয়েছে, বাবার দেয়া মলমে মেয়ের মুখ ফর্সা হয়ে গেছে, ছেলে বড় ক্লাবে চান্‌স পেয়েছে। বাবা আমার মতো সামান্য গৃহবধূকে দয়া করেছেন। এতেই তাঁর মাহাত্ম্য প্রমাণিত।

নন্দলালকে নিতাই দত্ত বলল, আর কি দেখছেন? এবারে শুধু সামনে তাকাবেন, ওপরে উঠবেন। নিচের দিকে চাইবেন না। আপনাকে ধরে আমরাও উঠব।

—এ যে মহাদায়িত্ব! আমি কি পারব?

—যাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নেবেন।

—দেবতা কিছু মহিমা দেখাবেন তো?

—ওই জলকে শরবত করবেন, প্রত্যেক দিন দশজন অচেনা লোকের নাড়ীভুঁড়ি বাতলে দিলেন, এমন কিছু? কিন্তু চমৎকারী না দেখানোই ভাল। ওগুলো খুব সস্তা হয়ে গেছে।

—তাহলে?

নিতাই দত্ত সোনার দাঁত মেলে হেসে বলল, পাবলিক দেখবে মহিমা! কেন্দ্রের মন্ত্রী, বিহার ও ওড়িশার মন্ত্রী, আমাদের মন্ত্রী অবশ্য ডীপ নাইটে আসবেন। বম্বে ও বাংলার তারকারা, বিতর্কিত বিপ্লবী রাজনীতিক নেতার দল, ব্যবসায়ী-কনট্রাকটর, সরকারী অফিসার-পুলিশের কর্তারা-বড় বড় অধ্যাপক—কত চান?

নন্দলাল চোখ বুঝে বলে, দেবতা!

—আর আসবে পাঁচ পাবলিক। রিকশাঅলা থেকে যে কোনো লোক। আসবে হতাশাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রী। কত চাই আর? তবে হ্যাঁ, প্রত্যেকে যেন আদর পায়, প্যাকেট পায়। মেয়েদের দিকে থাকবে মেয়ে ভলাণ্টিয়ার।

—পার্কে কি হবে?

নিতাই দত্ত সুমধুর হাসে।

—পার্কে সাত দিনে সাতটা ধর্মীয় ছবি দেখানো হবে খোলা প্যাণ্ডেলে। গুরুদর্শন

করে পার্কে চলে যান। ভিড় বাড়াবেন না। হলে মোটা পাবলিক চলে যাবে। "সম্পূর্ণ রামায়ণ", "শ্রীহনুমান পাতালবিজয়", "কালী, সংহারওয়ালী"—কত চান?

—আপনি সুপারম্যান।

-স-ব হয়ে যাবে।

তিন

সব হয়ে যায়।

এমন শৃঙ্খলায় হয়ে যায় যে সেটাই একটা মিরাক্‌ল।

কলকাতা বিজ্ঞাপনে ফেটে পড়েছিল। বাউলের বাহিনী সব ম্যানেজ করেছিল।

মহাপুরুষের লেকচার এমনই আঁতে ঘা দেয় যে তাঁর প্রস্তাবিত কেন্দ্র গঠনে চেকের পাহাড় জমে গিয়েছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শিবে পানআলা অবধি প্রত্যেকে প্যাকেট পেয়েছিল।

করুণা সদাব্রত করে কাঙালীভোজন করিয়েছিল পার্কে।

সুধা প্রতিদিন খাবার নিয়ে গিয়েছিল।

আর শেষদিন, যখন মহাপুরুষ সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘরে এসেছেন, তখন সুধা একটি স্থির স্থির দৃষ্টি মানুষপুতুলকে ঠেলতে ঠেলতে করুণার পেছনে ঘরে ঢুকেছিল।

—আমার ছেলেকে ভাল করে দিন বাবা, আমি বড় অভাগিনী...

বলতে বলতে সুধা থেমে গিয়েছিল।

করুণা, নন্দলাল, অপরেশবাবু, নিতাইবাবু, বাউল, চমনলাল, হরিরাম স্তম্ভিত।

মহাপুরুষের চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। তিনি সুধার দিকে চেয়ে আছেন।

সুধা বলে, তুমি!

মহাপুরুষ নির্বাক।

—তুমি মহাপুরুষ? আমার পেটে লাথি মেরে উধাও হয়েছিলে সর্বস্ব চুরি করে! আজ তুমি রাজাবাদশা হয়ে বসেছ?

মহাপুরুষ নির্বাক।

—এই ছেলে! লাথ মেরে মাথা নষ্ট করে দিয়েছ, আজ বত্রিশ বছর...নাকে আঁচিল লুকোবে কোথায়? তোমার ফটো আজও আমার বাক্সে আছে। ছেলেকে ভাল করে দিতে পারবে? অ মা! অ বাবু! কাকে পিতিষ্ঠে করছ, এ যে যমদূত গা! এর নাম অনাদি সাহা। জগদ্দলে বাজারের পেছনে...তোমাকে আমি খুন করে ফাঁসি যাব....ও হো হো হো....

মহাপুরুষ বলেন, বা-উ-ল!

অন্য সবাই স্তম্ভিত, পাথর।

—তোমাকে আমি....আমিও সুধা....

ঘরের বাতি নিভে যায়।
সুধার চীৎকার মাঝপথে থেমে যায়।
দরজা খুলে যায়।
করুণা ঢলে পড়ে মাটিতে। সে বিবশ, আচ্ছন্ন।
সব থেকে বোধের অগম্য।
অনেক, অনেক পরে তার জ্ঞান ফেরে।
দুঃস্বপ্ন দেখল কি ও?
—সুধা.....কোথায়..... ?
মহাপুরুষ সস্নেহে বলেন, চলে গেছে মা।
মানুষের বিভ্রম....বিভ্রান্তি....
—সুধা? তার ছেলে?
—সব চলে যাবে যোগাশ্রমে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে মা, তুমি ভেবো না।
—কিন্তু....
নন্দলাল, তার স্বামী অপরিচিত চোখে চায়।
অন্য গলায় কথা বলে।
—এখন ওর কথা ভুলে যাও।
—কিন্তু...দেবতা....
—ভুলে যাও।
মহাপুরুষ বলেন, ভুলে যাও।
অপরেশবাবু বলেন, ভুলে যান।
নিতাইবাবু বলেন, ভুলে যান।
চমনলাল বলে, ভুলে যান।
করুণা আবার সংজ্ঞা হারায়।

কলকাতায় মহাপুরুষ এখন একটি নাম।
তাঁর কেন্দ্র রমরম করে তৈরি হচ্ছে। জয়পুর মার্বেল দিয়ে আগাগোড়া তৈরি হবে।
নন্দলাল হাসপাতালের কাজ পেয়েছে।
সুধা এবং তার হাবা ছেলের খবর আর জানা যায় না।
এটা খুব দুঃখের কথা যে নন্দলালবাবুর স্ত্রী করুণা আজকাল অসুস্থ থাকেন। তাঁকে বেরোতে দেখা যায় না।
মহাপুরুষ, কেন্দ্র তৈরি হলেই কলকাতায় চলে আসবেন।

দুটি আইনের আসামী

নরীঘাটের নাম "নরীঘাট" কেন, তা কেউ সঠিক জানে না। চূর্ণী নদীর আর যৌবন নেই। এখন সে গমিতমহিমা, স্তিমিত গতি। শুধু বর্ষাকালে তার বুকে প্রাচীন উল্লাস জাগে। তখন সে ফুলে-ফেঁপে কলকল্লোলে ছোটে। তার বুকে নৌকো নাচে। সে সময়ে নরীঘাটের ওপর প্রাচীন কদম গাছটিও ফুলে সেজে ওঠে। এক সময়ে এই কদম গাছের ফুল ছাড়া আষাঢ়ে বনমালী বিগ্রহের পূজা হতো না। তবে সে সব এখন গল্পকথা মাত্র। সে রায়চৌধুরী বাড়ি নেই, সে বনমালী বিগ্রহও নেই। রাজঘাট টাউনে রায়চৌধুরীদের চকমেলানো বাড়ির সামান্য একটু অংশ আছে মালিক বংশের দখলে। নিচে দুটি ও ওপরে একটি ঘর। নিচে কল-পায়খানা—চিলতে উঠোন। তাপসের ও বনানীর পক্ষে যথেষ্ট।

ওদের একতমা কন্যা শ্রীলা কলকাতায় বনানীর ভাইয়ের বাড়িতে থেকে পড়ে। ফলে নিচের ঘর দুটি কাজে লাগে না। সেজন্যই একটি ঘর ওরা মিলনবাবুকে দিয়েছে, মানে দিতে বাধ্য হয়েছে।

কুশলরা তাপসের পেছনে ভয়ানক লেগে গিয়েছিল। দেখো তাপস, নিচতলাটা আমাদের দরকার। একটা ঘর রাখো, একটা ঘর ছেড়ে দাও।

—কেন, কুশলদা?

—কাজে লাগবে, কাজে লাগবে।

—বাড়িতে বলে দেখি।

—সব শরিকরা সরে গেল.....তোমার ওই অংশটার জন্যে ডেভলপমেণ্ট করা যাচ্ছে না।

—ভেবে দেখি। আমি বা যাই কোথায়?

—ক'মাস ঘর ভাড়া নিয়ে থাকো। তারপর তো হাইরাইজ উঠবে। ফ্ল্যাট পাবে একটা।

—মিলন কাকুকে বলে দেখি।

—আবার তাঁকে কেন টানবে?

—ওনাকে না বলে তো কিছু করি না।

—দেখো, ভেবে দেখো!

কুশল তার বাজাজে আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গিয়েছিল। গ্রীক ভাস্কর্যের মতো সুদর্শন কুশল, রাজঘাট শহরের অন্যতম নেতা, বিশাল টাকা করেছে বাড়ি তৈরির ব্যবসায়ে। বেলেপাড়া, যেখানে তাপসের বাড়ি, সেখানে ঘোষচৌধুরী-দত্তচৌধুরী-রায়চৌধুরী-মল্লিক—তাদের চকমেলানো বাড়ি, জমি, সব কিনে নিয়েছেন কুশলের বাবা সুনন্দন। সুনন্দনের কাছ থেকে জমি ও বাড়ি ডবল দামে কিনেছে জয়সোয়াল।

জয়সোয়াল অ্যানড্ সেন কোম্পানি ওখানে পরপর ফ্ল্যাটবাড়ি তুলছে।

তাপসের জন্য বাড়িটি দখল করা যাচ্ছে না।

বনানী তাপসকে বলছিল, বাড়ি ছাড়ব না।

—ছাড়ব না সবাই বলেছিল, রাখতে পারল ?

—তারা বাস করত না এখানে।

—আমরা বাস করি। কিন্তু কুশলদা যদি...

বনানী গভীর বিশ্বাসে বলেছিল, না না, আমাদের কিছু করবে না। হাজার হলেও আমাদের বিয়ের সময়ে এসে দাঁড়াল...কত আনন্দ করল...

—তখন ও অন্যরকম ছিল।

—বারো বছরে এত পালটে যাবে ?

—যাবে কি, গেছে। যাক গে...

—কি করবে ?

—যাই মিলন কাকুর কাছে।

—কুশলদাকে নয় আমিই বলি।

—বলে লাভ ? এত খাটলাম ওদের জন্যে, চাকরি দিল একটা ? শুধু শুধু ঘোরাল।

—যাক গে, কাজ একটা করছ। আমিও গান শিখিয়ে কিছু পাই। শ্রীলা তো ভালই আছে।

—তা আছে।

বনানীর দাদা শ্যামল নিঃসন্তান। শ্রীলাকে সে ও তার বউ রুমা স্নেহ করে। ওরাই শ্রীলাকে ভর্তি করেছে সাখাওয়াতে। শ্রীলা পড়াশোনায় ভালো, অঙ্কে খুবই ভালো। তাপস ও বনানী জানে, রাজঘাটে মেয়েকে ওরা এত সুযোগ দিতে পারত না। রুমা নিজে একটি স্কুলে পড়ায়, শ্যামল অধ্যাপক। ওরা বছর বছর বেড়াতে যায় শ্রীলাকে নিয়ে।

মাঝে মাঝে ওরা আসে।

মাঝে মাঝে তাপসরা যায়।

কুশল বলে অন্যদের, তাপস একটি ধান্দাবাজ। নিঃসন্তান শালার ফ্ল্যাটটা বাগাবে বলে মেয়েকে...অথচ এমন ছ্যাঁচড়া যে বাড়িটা ছাড়বে না।

পৈতৃক বাড়ি না ছাড়লে. তাকে ছাড়তে বাধ্য করা কুশলের হাতের পাঁচ আজকে।

কুশল তা করে না।

সুনন্দন বলেছেন, কোনো হটকারী কাজ করবি না। এখন দিনকাল খারাপ। অমন কাজ করলে অমিয়দা ছাড়বে না।

—এখনো অমিয়বাবুকে ধরে থাকা দরকার ?

—খুব দরকার।

—কেন ?

—অমিয়বাবুই বলছে সভা করে, টাউনে কিছু লোকের সম্পত্তি অত্যন্ত বেড়েছে।

বাড়ল কি ভাবে!

—তোমার বা ওনার মদতের দরকার কি আর? কোনো দরকার নেই।

—তুমি ছাই বোঝো।

—বারবার বলছি, রাজঘাটের সব জয়সোয়ালকে ঝেঁকে দাও, কলকাতা চলো। জয়সোয়াল ইনডাসট্রি করবে, মানুষ চাকরি পাবে, কেউ ওর পেছনে লাগবে না। কলকাতা চলো।

—চুপ করো, কিছুই বোঝো না।

—রাজঘাট বলে এত টান কিসের?

—যা, নিজের কাজের যা।

এটা সবাই জানে যে সুনন্দন সেন তিরিশ বছর আগে ভূমিসংস্কার আপিসে কানুনগো মাত্র ছিলেন। বাইশ বছর আগে তিনি যখন চাকরি ছেড়ে দেন, তখন বোঝা যায়নি যে স্বনামে বেনামে কত জমি হাতিয়েছেন। বাইশ বছরে বিভিন্ন রাজনীতিক দল এ শহরের মাটিতে গড়ে উঠেছে।

সুনন্দন সেনের অবস্থা দিনে দিনে ভালো হয়েছে। জমির ব্যাপার তিনি জানেন ও বোঝেন। তিনি রাজঘাট উপান্ত থেকে ডাংপাড়া বসতি তুলেছেন, চূর্ণীর বাঁক থেকে মাঝিপাড়া বসতি তুলেছেন। এখন রাজঘাট রীতিমত মধ্যবিত্ত ও ধনীর শহর। প্ল্যানিং নেই, কিন্তু অলিতে-গলিতে কাব্যিক নামের ছোট বড় বাড়ি। টাউনে এখন তিনটি সিনেমা হল। কারেন্ট থাকলে শহর ঝলমল করে। সকলেই বলে, এ সমৃদ্ধির মূলে সুনন্দন সেনের মস্ত অবদান আছে।

সুনন্দনের এসব কথা শুনতে ভাল লাগে। নিজেকে তিনি কৃতী পুরুষ মনে করেন। রাজঘাটে তিনি কেউকেটা লোক। ভোটের আগে সব রাজনীতিক দলকেই বেশি-কম চাঁদা দেন। ব্যবসা করতে গেলে খুশি রাখতে হবে।

সুনন্দন আশা করেন, একদা নকুড় দাঁ লেন রাস্তার নাম সুনন্দন সেন লেন হবে।

যদিও চিরনৈরাশ্যবাদী পৌরসভা কেরানী সলামত আলি বলে, তা হবে না।

সলামত ও সুনন্দন হলায়গলায় বন্ধু।

রাজঘাটে ওরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জীবন্ত প্রতীক বলে গণ্য হয়।

যদিও ওদের বন্ধুত্বের ভিত্তি অন্যত্র। সলামত এক বনেদী ইটভাটার মালিক। সুনন্দন বাড়ি তোলেন, সলামত ইট দেয়।

সলামত স্বভাবে নৈরাশ্যবাদী।

সে বলে, হবে না সেনবাবু, তোমার নামে রাস্তা হবে না। তোমার তো কোনো চ্যারিটি নেই।

—চ্যারিটি কার জন্যে? পাবলিকের জন্যে? দেখো আলি, চ্যারিটি খুব খারাপ। মানুষকে ভিখিরি করে দেয়। খাটব না, অথচ পেয়ে যাব, মনোভাব জন্মে যায়।

—তা বটে!

—চ্যারিটি করি না, কিন্তু কতগুলো লোককে ভাত দিই, তাই বলো ? খাটাই, পয়সা দিই।

—তা বলতে পারো। আর চ্যারিটি করে বা কি হয় ! আমার বাবার নানা দৌলত হোসেনের নামে তো গাঁয়ের নাম দৌলতপুর। তিনি খুব চ্যারিটি করতেন। হাইস্কুল, হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিমখানা, দৌলতপুর থেকে রাজঘাট ইট ফেলা রাস্তা—কি না করেছেন ! করে কি হলো ? কেউ নামও করে না !

—কেন, মহকুমা ইতিহাসে তো লিখেছে ওনার কথা, যাকে বলে বিতং করে !

সলামত বিষাদে ডুবে যায়।

—ওকে তুমি লেখা বলো সেনবাবু ? তিনি ডাকাত ছিলেন, পরে ইংরেজের মোসায়েবি করে জমিদারি পান। যাক গে, বংশে কেউ নেইও যে প্রতিবাদ করে !

—চ্যারিটি করলে যা, না করলেও তা !

—তবু করা দরকার। নিজের নামে রাস্তা চাও !

সলামতের শখের মধ্যে "বাবা" জর্দা দিয়ে পান খাওয়া। একটি পান মুখে ফেলে সে বলে, কুশল যেমন ডেঁপলে উঠেছে, নাম রটেছে খুব। এ কারণেই....

—বেল্লিক ছেলে !

—শাসন করোনি আগে...

—ছ' মেয়ে, এক ছেলে !

—হ্যাঁ, কঠিন বটে।

—কাত্তিকপানা চেহারাতেই সব্বনাশ ! চেহারা বা পেল কোথা থেকে !

—তোমার মেয়েরাও সোন্দরী।

—আমার বাপের চেহারা পেয়েছে। চেহারা পেলে, স্বভাব পেলে না ? কি ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন !

সুনন্দন সেনের আরো দুঃখ আছে।

কুশল অতীব মেয়েবাজ।

কুশল পছন্দ করে কালো-কালো কুচ্ছিত মেয়ে।

কুশল তার ডানাকাটা পরীসদৃশ বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে, যেটা অতীব মূর্খামি।

কেননা নীলার বাবা কলকাতার বিত্তশালী, প্রভাবশালী মানুষ। একতমা কন্যাকে তিনি ঢেলে দিয়েছেন, আরো দেবেন। দুই ছেলে ইনডাসট্রিয়াল প্ল্যানিংয়ে আছে জার্মানী ও জাপানে। স্ত্রী এবং তিনি শেষ অবধি বোধহয় জাপানেই যাবেন।

এমন এক বাপের মেয়ে কুশলের বউ হতে পারে কি করে ?

নীলা সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু ছোটবেলায় ব্রেনফিভারের পর থেকে ওর বুদ্ধিসুদ্ধি খুব পরিণত নয়। বলা যায় অপরিণত বুদ্ধি। কিন্তু বিয়ের দিকে প্রবল ঝোঁক ছিল ওর।

স্কুলের পড়া কয়েক বছরেও শেষ করতে পারেনি। তবে যত্ন করে রান্না শেখার ক্লাসে গিয়ে শিখেছিল নানারকম ফ্যাশানী রান্না।

সুনন্দনের এত বৈভবের পরও কুশলের মা রান্না করেন। রান্নাঘর তিনি ছাড়বেন না।

নীলার বাবা বিয়েতে মেয়েকে কুকিং রেঞ্জ দেন।

এমন অসম বিয়ে হলো কি করে? কলকাতার নীলা এবং রাজঘাটের কুশল?

নীলার বাবা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

তাঁর পুত্রবধূরা অবশ্য বলেছিল, নীলার কোনো মানসিক পরিণতি হয়নি। ওকে বিয়ে দেবেন না।

নীলার বাবা যতই একেলে হোন, মেয়ের বিয়ে দেবেন না এ তিনি ভাবতে পারেননি। তাঁদের গুরুদেবও প্রস্তাবটিতে সম্মতি জানান। নীলার দিকে সস্নেহ চোখে চেয়ে তিনি বলেছিলেন, তোমরা দেখছ ওকে কন্যারূপে। কিন্তু ওর মধ্যে রমণীর অন্যান্য রূপও সুপ্ত আছে। ও স্ত্রী হবে, জননী হবে। পাত্র তোমরা দেখো। কোষ্ঠীবিচার আমি করে দেব।

কোষ্ঠীবিচার হলো, "রাজযোটক হবে" বললেন। বললেন, নীলার কোষ্ঠীর জোর দেখেছ? ও বাহাত্তর বছর বাঁচবে। ওর দুটি সন্তান হবে। দুজনেই স্বদেশে পড়াশোনা ও বিদেশে কাজ করবে। ওর স্বামী ব্যবসায়ে বিশাল উন্নতি করবে।

বিয়ে ঠিক হলো। কুশলকে দেখে সবাই মুগ্ধ। অশিক্ষিত নয়, গ্রাজুয়েট ছেলে। রূপ দেবতার মতো। ব্যায়ামচর্চায় দেহ মজবুত। ছাত্রজীবনে বহুবার বিভিন্ন "কজ" নিয়ে অবিরত দৌড়েছে।

নীলার দাদারা, বউদিরাও বলল, এই ভালো। সাদাসিধে পরিবার, নীলা সুখে থাকবে। অত্যন্ত আধুনিক পরিবারে নীলা অচল টাকা। মানুষ ভালো, কিন্তু বুদ্ধিতে খাটো, কোনো ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না। মিষ্টি ব্যবহারে বশ থাকে। ধমকালে ক্ষেপে যায়।

তবে নীলার বাবা কোনো লুকোছাপা করেননি। সুনন্দন ও কুশলকে বলেছিলেন সব খুলেমেলে।

—দেখুন, ওর এগার বছর বয়সে ব্রেনফিভার হয়। সেরেও ওঠে, কোনো স্থায়ী ক্ষতিও হয়নি। তবে ছেলেমানুষী ভাবটা রয়ে গেছে খুব।

—পড়ালেন না কেন মেয়েকে?

—কয়েক বছর কোনো চাপ দিইনি। যখন পড়াশোনা ধরালাম আবার, মেয়েই স্কুলে গেল না।

ঈষৎ হেসে বললেন, বলল, যাদের সঙ্গে পড়তাম, তারা পাশ করে গেছে। আমি নিচু ক্লাসে পড়ব না।

—প্রাইভেটে তো পড়াতে পারতেন!

—তিনবার বসেছে পরীক্ষায়। কোনোবার সবগুলো পেপার দেয়নি। যতগুলো দিয়েছে, পাশ করেছে। জোরাজোরি আমরা করিনি। একটা দিকে খুব ঝোঁক, নতুন নতুন রান্না করতে ভালবাসে। গান শিখেছে, গায় না।

—বিদেশেও তো গিয়েছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে জার্মানী, জাপান—দাদারা থাকে, গেছে বই কি।

—আমার ঘরে কি অমন মেয়ে মানাবে?

—ওয়েল, আমার গুরুদেব মনে করেন...মানে চিৎঘনানন্দ স্বামী, মাদ্রাজে থাকেন...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই জানে তাঁকে...

—তিনি মনে করেন এ বিয়ে হলে নীলা সুখী হবে। নীলার শ্বশুরবাড়িরও ভাল হবে। মেয়ে আমার ভেরি লাকি। ও জন্মাবার পরই আমি কনস্ট্রাকশান ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম করি। তারপর...দেখছেনই তো!

সুনন্দন অভিভূত হয়ে যান।

পয়মন্ত মেয়েই তো চাই। কুশলের ঠিকে-ঝি—হাসপাতালের আয়া—ড্রাইভারের বোন ধরা বাতিক ঘুচতে পারে। ওর বাতিকের জন্য বহুবার সুনন্দনকে দু-চার হাজার ঘুষ দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করতে হয়েছে।

সুনন্দনের তৃতীয় মেয়ে যে স্বামীর ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে বাপের বাড়ি বসে আছে, সেটাও তো এক জ্বালা। বউয়ের প'য়ে মেনির কপাল ফিরতে পারে। জামাই প্রসন্ন হয়ে ওকে ফিরে নিতে পারে।

অত্যল্প সময়ে অত্যধিক টাকা করে সুনন্দন টাউনে বদনাম কিনেছেন, শত্রু বাড়ছে। বউয়ের প'য়ে এসব সমস্যা উপে যেতে পারে।

সুনন্দন বলেছিলেন, বেশ, তাই হোক।

বিয়ের কথা বলতে নীলার বাবাই সড্রাইভার এসেছিলেন। কথাবার্তার পর কুশলের মা স্বহস্তে শ্বেতপাথরের থালায় ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা, মোচার ঘণ্ট, চাটনি, পায়েস, আম ও মিষ্টি নিয়ে আসেন।

নীলার বাবা আতঙ্কিত।

—এ কি করেছেন?

—কিছুই করিনি। অতিথি হলেন নারায়ণ। যা দেখছেন, এ সবই আমার নারায়ণের সান্ধ্যভোগ।

নীলার বাবা খুবই অভিভূত হন। ভাবী বেয়ানের পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপাল সিঁদুর। ঘরে পুরনো মডেলের আসবাব, দেয়ালে প্রলম্বিত বংশবৃক্ষ এবং তৈলঙ্গস্বামী টু বালক ব্রহ্মচারী—সকলের তৈলচিত্র তাঁকে মুগ্ধ করে।

—কিন্তু লুচি!

—সানফোতে ভাজা।

—এত খাব?

—আপনি খান। ড্রাইভার ভেতরে বসে খাচ্ছে।

—তা...ছেলের বিয়ে দেবেন, দেনাপাওনা?

কর্তা-গিন্নিকে কুশল আগেই বলেছিল, ল্যাল্‌ঠামি করবে না। চিনু বলেছে ওরা ঢেলে দেবে। কিচ্ছুটি চাইবে না। আমি যা বলছি, অন্যথা কোর না।

দুজনেই হাত জোড় করেন।

—শুধু মেয়েটি দেবেন। ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের সব আছে। কিছুই চাই না। কি চাইব বলুন? গাড়ি, কয়েকখানা বাড়ি, দুটো ফ্রিজ, দুটো টি.ভি—কি নেই আমার? ছেলের বিয়ে দিয়ে পণ যৌতুক নেব—নো, নেভার!

নীলার বাবা এতেই কাত হন।

বিয়েতে যৌতুক দেননি, তবে মেয়ের নামে পাঁচ লাখ টাকা, অনেক গয়না, কুকিং রেঞ্জ এবং মেয়ে-জামাই বেড়াবে বলে মারুতি ভ্যান দিলেন।

নীলা ঝলমল করছিল আনন্দে।

কুশলও সময়োচিত বিনম্র ছিল।

এসব বছর চারেকের কথা।

নীলার প'য়ে মেনির বর বউ নিয়ে যায়।

নীলার প'য়ে কুশল কিছুকাল নতুন খেলনাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

সুনন্দনবাবু অত্যন্ত খুশি হন।

যদিও কুশলের নেশা বেশিদিন টেকেনি।

বর্তমানে কুশল ঝিনুক দাশ নামে নামোপাড়া গ্রামের একটি মেয়েকে নিয়ে অত্যধিক ব্যস্ত। ঝিনুক চুল্লু কারবারী। তার পার্টনার তার তিন দাদা—চাঁদ, তিনু ও চীনা। ভাইরা প্রভাবশালী লোক। কুশল মদ খায় না, কিন্তু ঝিনুকের বন্য যৌবন ও ব্রণলাঞ্ছিত মুখ, ঘোর কালো রং কুশলকে মাতাল করেছে। সে কারণেই কুশল ওদের কারবারে টাকা ঢালে, এবং রাজঘাট থানার সার্কেলবাবুর সঙ্গে ওদের একটা সন্তোষজনক চুক্তি করিয়ে দিয়েছে।

ফল ভাল হয়নি।

রাজঘাট থানার সুনাম-দুর্নাম সার্কেল ইনস্‌পেকটর-নির্ভর। দীর্ঘদিন এখানে ছিলেন বরাটবাবু। তিনি ছিলেন খুবই সজ্জন। চুল্লু-ডাকাতি-নারীব্যবসা—এসব তিনি শাসনে রাখতেন। বাজারের শিবু পানঅলার বিশ্বাস, বরাটবাবুকে দেখে মডেল করে হিন্দী ছবিতে সজ্জন পুলিশ-দারোগার চরিত্র ছকা হয়।

বরাটবাবুকে ফাঁসায় কুশল।

তারামণি বেওয়া নাম্নী এক মহিলার জমি জবরদখল করেছিল কুশল। এটি তার বাপের সম্পত্তি বাড়াবার জন্যে করেনি। ঝিনুক নামোপাড়া থেকে টাউনে আসতে চাইছিল। তারামণির জমিটি বাসপথের কাছে। ওখানে থাকলে ঝিনুকের ব্যবসা চোরাগোপ্তা বাড়ত।

তারামণি সলামত আলির কাছে পরামর্শ নিতে যায়।

সলামত বলে, নজর পড়েছে, ও নেবে। টাকা নাও, সরে যাও।

তারামণির এ পরামর্শ পছন্দ হয় না। জমিটি সে নাতির জন্যে ধরে রেখেছে। নাতি কলকাতায় দমকলে কাজ করে। সে এখানে পাকা ঘর ওঠাবে।

সে যায় বরাটবাবুর কাছে।

বরাটবাবু বলেন, ব্যবস্থা নেবেন।

এর মধ্যে ছবিতে ঢুকে পড়ে রবি সাঁতরা। এ শহরের তখনো বলবান রাজনীতিক নেতা। সে সলামতকে নিয়ে তারামণির কাছে যায়। তারামণি বেওয়া কাঠের ঘেঁসের গুল দিয়ে জীবন কাটায়, মাঝ মাঝে হরিসভায় যায় এবং বেওয়া হবার পর যে তাকে দেখত সেই পরলোকগত গুণমণি মহান্তির জন্য কাঁদে।

কিন্তু তার মাথায় ঘেঁস নেই, বুদ্ধি আছে। সে বুঝল, কুশল এবং রবি সাঁতরা দুজনের নজর পড়েছে তো ও জমি গেছে।

বলল, দাম কি দিচ্ছ?

—ন্যায্য দাম। সলামত ঠিক করুক।

—থানায় যে বলে এলাম?

—ওই কথা! থানায় কিছু বলবে না আর। আমি হাজার টাকা আগাম দিলাম...

সলামত বলে, তিন কাঠা ছ' ছটাক, তা পাঁচ হাজার করে কাঠা ধরুন। তুমি ষোল/সতের হাজার পাবে গো মেয়ে।

তারামণি বিরস বদনে বলে, ননীবাবু বেচল ওপাশে এগার হাজার করে কাঠা, আমার বেলা পাঁচ হাজার, তা বাবুদের সঙ্গে সমানে তো হয়নি, হবে না!

—কাগজপত্তর!

—তোলা আছে। মিলনবাবুর ঠেঙে রেখেছি।

—কাল নে' যাব।

বরাটবাবু জানতে পারেন না কিছু। তারামণিকে কথা দিয়েছেন জমি দখল করতে এলে দেখবেন।

কার্যকালে রবি সাঁতরা ও জমি এক হাতে কাঠা পাঁচ হাজারে কিনে অপর হাতে তা বারো হাজারে বেচে দেয় সারোগীকে। আগেই জমি কাঁটাতারে ঘিরে দেয়। বরাট সে খবর পেয়ে কাঁটাতার উপড়াতে এসে বোকা বনে যান। রবি সাঁতরার ছেলেকে চাঁদার জুলুমের কালে তুলে এনে মারধোর করাতে রবি সাঁতরার রাগ ছিলই।

বরাটের নামে সে কোথায় কি রিপোর্ট করে জানা যায় না। বরাট রাতারাতি অন্যত্র বদলী হয়ে যান।

মিলনবাবু তারামণিকে বলে, যাও। মুখ দেখাবে না আর। তোমার কারণে ভাল লোকটা চলে গেল। এখন কে আসে তা দেখো।

কুশল ফুঁসতে থাকে।

সহসা তার মনে হয়, সারোগীর গেস্ট হাউসের সহকারী ম্যানেজার তাপসের বাড়িতে ঝিনুককে ঢোকাতে পারলে মনে শান্তি হবে।

তাপসকে ও বলে, একটা ঘর চাই।

তাপস কোনোদিন বাড়ি ভাড়া দেবার কথা ভাবেনি। সে জানে, এখানে এ বাড়ি বেচলে যা পাবে, তাতে রাজঘাটেও ফ্ল্যাট হবে না। বসবাসের আরাম অনেক।

মোটা গাঁথনির দেয়াল ও ঘর। বড় বড় দরজা জানলা। বারান্দায় বিশ জন মানুষ বসতে পারে। কলে জল পড়ে। টিউবওয়েলও আছে। সবচেয়ে যা ভালো, বনানী উঠোন ভরে টবে বাগান করেছে। খুব সুখশান্তি এ বাড়িতে।

কুশলের নজর পড়ল, এটা ভয়ের কথা।

তাপস মিলনবাবুর কাছে গেল।

মিলনবাবু রাজনীতি করেছে, জেল খেটেছে, পেনশান পায়। খরচ দিয়ে খায় তাপসের বাড়ি। ঘুমোয় "প্রাইমা" প্রেসের ঘরে। প্রেসটা মিলনবাবুর ভাইপো বুবাই. ওরফে অংশুমানের। বুবাই স্টেশনের কাছে ক্যাসেটের দোকান করেছে। প্রেস মিলনবাবুই দেখে।

বুবাইয়ের প্রেসে কাজ করে মিলনবাবু, মাইনেও নেয়, কিন্তু বুবাইয়ের বাড়ি থাকে না।

মিলনবাবু এ শহরে প্রথম লাল ঝাণ্ডা তুলেছিল। স্থানীয় কৃষকসভার কর্মী ছিল। পরের দিকে রাজনীতির চেহারা ভাল লাগেনি, সরে এসেছে।

বর্তমানে "রাজঘাটে কৃষক সংগ্রাম" বই লিখবে বলে শোনা যাচ্ছে। শহরে মিলন মুনশি একটি সম্মানিত নাম। মন্ত্রীরা এলেও কথা বলেন। মিলনবাবু কিছু বললে অমিয়বাবু বা রবি সাঁতরা কিছু বলতে পারে না। মিলনবাবু প্রত্যেকের পূর্বেতিহাস জানে এবং দরকারে তা বলেও থাকে।

যেমন সুনন্দনবাবুর বিষয়ে বলে, রাজঘাট টাউনের চরিত্র বলে কিছু নেই। ঘটি চোর, সাইকেল চোর মরে গণপ্রহারে। আর জমিচোর গলায় মালা পরে মে-দিবসের সভায় বসে থাকে।

রবি সাঁতরার বিষয়ে বলে, শাহেনশা লোক। চিরকাল গরিবের জমি ধনীকে বেচে, কমিশন খায়। টাউনটাকে ও সারোগী-সিং-জয়সোয়ালদের হাতে তুলে দিয়ে যাবে।

অমিয়বাবুর বিষয়ে বলে, সততা আছে, গোঁ আছে। নেই ধৈর্যশক্তি, নেই উদারতা।

তাপস ও বনানীকে খুব স্নেহ করে। মিলনবাবু যখন জেলে, তখন মিলনবাবুর মাকে তাপসের বাবা খুব দেখেছেন। বুবাইদের বাবা এখানে থাকতেন না। মিলনবাবুর মায়ের অসুখে দেখেছেন, ওষুধ দিয়েছেন। মিলনবাবু সে কথা কখনো ভোলেনি।

তাপসের মেয়েকে কলকাতায় রেখে পড়াবার কথা মিলনবাবুই জোর দিয়ে বলেছিল।

—এখানে কি সুযোগ দিতে পারবে ওকে? ওখানে পাঠাবার সুযোগ আছে, পাঠাও। রাজঘাট এখন সে টাউন নেই। সাত বছর একটা ছেলে-মেয়ে স্ট্যান্ড করে না। লেখাপড়া হয় না ভাল।

তাপস ও বনানী ওকে গার্জেন বলেই মানে।

তাপস ওর কাছে গেল। বলল, কুশল কয়েকবার বলল কথাটা। ও যদি জোর করে.......

—বটে !

—আপনি তো জানেন ওকে।

—তাপস, বাড়ি বা জমি এখন বাপের নয়, দাপের ! তা তোমার চরিত্রে দাপ নেই ! চিন্তার কথা !

—একবার ছেড়ে দিলে.....

—কুশল সেন ! হ্যাঁ, সে তো চাইবেই। নামোপাড়ার মেয়েটাকে আনতে হবে.......

—ছি ছি ! এসব কথা শুনি বটে....

—আর ছি ছি ! যাক গে, তুমি ভেব না।

—কিছু একটা বলুন।

—বলব, বলব রবিবার। তোমার বাবা....উপেনদাদা কি সামান্য মানুষ ছিল ?

—বাবাকে মনেই পড়ে না।

—না....তুমি তখন খুব ছোট। তোমার মা মহীয়সী মহিলা বটে। লাইফ ইনসিওরের এজেন্‌সি করেছে, পয়সা নিয়ে উল বুনেছে....যাক গে, রবিবার সকালে যাব।

রবিবার সকালে মিলনবাবু বিছানা, বাক্স, ব্যাগ, সর্বসমেত হাজির।

—নিচের ঘরে আমি থাকব। আর পাশের ঘরে বউমা গানের ক্লাস নেবে। এখন আর কুশল ঘর নিতে চাইবে না, কি বলো !

—কাকা, আপনি বাঁচালেন। কিন্তু বুবাই....

—বুবাই বুঝদার ছেলে। ও বুঝবে। আর বউমার গানের স্কুল মর্মে একটা বোর্ড....

—হয়ে যাবে।

—চমৎকার ঘর ! এখানে থাকলে আমার বইটাও লেখা হয়ে যাবে।

মিলনবাবু থাকে এখানে, এ কথা দিকে দিকে রটে গেল তাড়াতাড়ি।

বাড়ির ইজ্জতও বাড়ল।

মিলনবাবু থাকলে বুবাইরা আসে, অমিয়বাবু আসে ক্বচিৎ, আরো লোকজন আসে।

কুশলকে ঝিনুক বলল, ধন্য ক্ষমতা তোমার ! কি নিমুরোদ মানুষ গো ! কবে থেকে বলছ টাউনে নিয়ে যাবে, তা হলো কোথা ?

—হ্যাঁ, ওই তাপসটা...

—বুড়োটা কে ?

—ওকে তোলা যাবে না।

—তবে আর কি !

—তুই থাম্ তো ! আমার হাত দিয়ে এত হচ্ছে, তোকে আমি টাউনে নেবই।

—দাদারাও যাবে তো ?

—দেখি, যা হয় হবে। দাদাদের হাতে কারবার ছেড়ে দে না তুই।

—তারপর ?

—আমার ঘর করবি।

—আহা ! বউ আছে না তোমার ?

—সে মানুষ নয়। কাদার ঢেলা।

—মাইরি ! কপাল করে এসেছিলে। অমন বউ !

—আমার ভাল লাগে না।

—বে' তো করতে পারবে না আমায় !

—করলে ঠেকাচ্ছে কে ?

—না বাবু ! ডিভোস না হলে বে' হয় না।

—ডিভোস ভদ্দরলোকে করে না।

—তবে কি করবে ?

—ভাবিস কেন ? তোর নামে টাকা লিখে দেব, ঘর করে দেব, ভাসিয়ে দেব না।

—দেখো ! নেহাৎ আমি আছি বলে নামোপাড়ায় আসছ আর যাচ্ছ।

—তুই না থাকলে আসব কেন ?

—ডাকাতের গ্রাম যাকে বলে।

—আমায় কিছু করবে না।

—যাক গে, এখন কি খাবে কিছু ?

—কি খাওয়াবি ?

—ডিম ভেজে দেব ?

—আগে কাছে আয়।

ঝিনুকের ঘামগন্ধ শরীরে আশ্চর্য মাদকতা। কুশল ডুবে যায়, ডুবে যায়। নীলার স্নানভেজা সুগন্ধিঢালা শরীরে কোনো আকর্ষণ নেই।

কুশল বাড়ি ফেরে অনেক রাতে।

সুনন্দন নিচু গলায় হিসহিসিয়ে বলেন, স্বভাব দেখছি যায় না। ওই গুন্ডা বদমাশদের ঠেকে যাস কেন ?

—ভাল লাগে।

—বংশের মানমর্যাদা বলতে....

—দেখো বাবা ! বে' আমি করতে চাইনি। তুমি আর মা মাথা কোটাকুটি করছিলে বলে রাজী হয়েছি।

—সে মেয়েটা সাদাসিধে। তোর দয়া হয় না ?

—না।

—তোকে নিশ্চয় জাদু করেছে মেয়েটা !

—আমি ওকে ভালবাসি।

—চিরকাল একেকটা কেলেংকার করছ, আর বলছ, ভালবাসি। প্রতিজনকে টাকা গুনে গুনে দিয়ে....

—ঝিনুক তেমন নয়।

—নয় ওকে টাকা দে, চলে যাক।

—তুমি পাঁচ লাখ ছাড়ো, আমি ঝিনুককে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

—ছি ছি ছি!

—আমার খিদে পেয়েছে।

—যা, মা দেবে।

—বউ কি করছে?

—সে খেয়েদেয়ে চলে গেছে। এগারোটা অবধি বসে থাকতে পারে?

সত্যিই নীলা ঘুমোচ্ছিল।

ফুলের মতো সুন্দর একটি মেয়ে।

মা বলল, ওকে ডাকিস না যেন।

—কেন?

—শরীরটা ভাল নেই ওর।

—কি হয়েছে?

—মনে তো হয়....

—কি?

—বোধহয় ছেলে-মেয়ে হবে!

—এঃ, কেলো হয়ে গেল।

—ও কি ছিরির কথা?

—ঝিনুক জানলে.....তুমি কি বুঝবে?

মা স্থিরচোখে ছেলেকে দেখেন। তারপর গম্ভীর গলায় বলেন, ওর বাবা ফোন করেছিলেন। মেয়েকে নিতে আসবেন পরশু। তুমি সে-সময় থেকো।

—আমি কি করব?

—থাকতে বললাম, থেকো।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

—কিছু বুঝি না আমি। এমন বউ থাকতে.....

মা বেরিয়ে যান।

কুশল ভাবতে থাকে।

২

এর পর নীলার বাবা সত্যিই মেয়েকে নিতে এলেন।

কুশল বাড়িতেই ছিল। নীলার বাবার মনে হলো কুশল যেন বড় বেশি গম্ভীর হয়ে আছে।

—কুশল কেন গম্ভীর?

—না না, এই কাজকর্মের ঝামেলা!

সুনন্দন আর তাঁর স্ত্রীর তরফে আদর-আপ্যায়নের আয়োজন ছিল ত্রুটিহীন। নীলার বাবাও প্রচুর কেক, প্যাস্ট্রি, সন্দেশ এনেছিলেন সঙ্গে।

—নীলাকে নিয়ে যাচ্ছি, তাতে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই তো? নীলার মা জানতে বলেছেন।

সুনন্দনের স্ত্রী নীলার মাথায় হাত রাখলেন।

—সারাটা দিন আমরা একসঙ্গে কাটাই। নীলা থাকবে না মনে করলেও ভাল লাগে না। কিন্তু বেয়াই, প্রথমবার সন্তান হবে, কলকাতাই অনেক ভাল। মায়ের কাছে থাকবে, ওখানে সবই সুবিধে তো!

—হ্যাঁ, কলকাতার বাইরে হেল্‌থ ফেসিলিটিজ......

কুশল বলে, নার্সিংহোম এখানেও আছে। ডাক্তারও ভাল। তবু কলকাতার মতো কি হবে? ডাক্তারগুলোর দায়িত্বজ্ঞান নেই, ব্যবস্থা খুব খারাপ।

নীলার বাবা বলেন, তুমি মাঝে মাঝে এসো। তাহলে নীলার ভাল লাগবে। আমাদেরও ভাল লাগে।

কুশল মুখে কুশলী হাসি মেখে রাখে।

—নিশ্চয় যাব।

ঈষৎ দুঃখে নীলার বাবা বলেন, কই আর যাও! ওর বড়দা এল, এখানে এল, নীলা গেল, তুমি গেলে না। আমাদেরও তো তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে, একলা থাকি!

সুনন্দন তাড়াতাড়ি বলেন, বলেন কেন! এমন কাজপাগলা ছেলে। কাজ নিয়েই.....

—সে তো ভাল। আমিই কি বসে থাকতে পারি? অফিসটা নিজে গড়েছি, যাই প্রত্যহ। ছেলেরা বিদেশেই থাকবে মনে হয়।

—আপনারাও যাবেন তো?

—ঘুরে এসেছি আগে। নীলাও গিয়েছে। আবার শেষ অবধি....জাপানেই থাকার ইচ্ছে....দেখি! নীলাকে নিয়ে ভাবতাম.....কুশল!

—বলুন!

—বড় ছেলে লিখেছে টিকিট পাঠাবে। তোমরা ওদের ওখানে, ইউরোপ ঘুরে এসো একবার।

কুশলের মা বলেন, এখন তো নয়। বাচ্চা হোক, খানিক বড় হোক, যাবে ই কি!

নীলা খুব মন দিয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উলটে যাচ্ছিল। ও হঠাৎ বলল, ও যাবেই না।

—কে যাবে না! কি বলছিস তুই?

নীলা কুশলের দিকে আঙুল দেখাল।

—ও যাবে না।

কুশলের মা তাড়াতাড়ি বলেন, যাবে যাবে। চলো মা, তোমার জামাকাপড় গুছিয়ে দিই।

—সে তো গোছালে সকালে। এখন আমার চুলটা বেঁধে দেবে চলো।

বাবাকে বলে, এখানে মা কি সুন্দর চুল বেঁধে দেয়, মা পারেই না।

ওরা বেরিয়ে যায়।

কুশল বলে, আমি একটু আসছি।

নীলার বাবা বলেন, এটা মস্ত কথা যে নীলা আপনাদের ভালবাসা পেয়েছে!

—লক্ষ্মী মেয়ে আপনার! এমন ঘরোয়া একটি মেয়ে তো রাজঘাটেও দেখি না আজকাল।

—ওর মা বলছিল....

—কি?

—আপনারা কি সাধ দেবেন ওকে.....

—উনি জানেন ওসব।

কুশলের মা নীলাকে নিয়ে ঢোকেন। নীল বেনারসী, মুক্তোর নেকলেস, কঙ্কন, ঝুমকো। সত্যিই খুব সুন্দরী নীলা। দেখলে চমক লাগে। তবে স্থির, শান্ত সৌন্দর্য।

—ওগো, উনি বলছেন সাধ কবে দেবে.....

কুশলের মা হাসেন।

—আমাদের বংশে আট মাসে সাধ। তা এখানো ছ'মাস আছে। আট মাসে ওকে আনতে বলব না। আমিই যাব ওখানে। আমি দিলে, পরের মাসে আপনারা দেবেন। তখন আমার মেয়েদের ডাকবেন একটু। ঠিকানা তো আছেই আপনার কাছে।

—মাঝে মাঝে যাবেন বেয়ান।

—যাবেই তো।

নীলা হঠাৎ ওর হাত চেপে ধরে।

—তুমিও চলো না মা।

—যাব মা! এখন যাই কি করে বলো?

গাড়িতে ওঠার সময়ে কুশল আবার এসে দাঁড়ায়। নীলা বলে, এই, যাবে তো?

—যাব, যাব।

নীলার বাবা হাত নাড়েন বেয়াইকে। জানতে হবে, নীলার কাছে জানতে হবে, ও কুশলের বাবা-মার কথা লেখে, কুশলের কথা কেন লেখে না?

নীলা বলল, কেন লিখব? ও কি আমার সঙ্গে কথা বলে?

—কাজে ব্যস্ত থাকে হয় তো।

—কাজ তো বাবা বেশি করেন।

—ওঁরা তোকে ভালোবাসেন তো?

—খুব ভালবাসেন। মা আমাকে কত জায়গায় নিয়ে যায় গাড়িতে। কেষ্টনগর...নবদ্বীপ...

নীলার বাবা নিশ্বাস ফেলেন। মেয়েটা সত্যিই অপরিণত। বিয়ে দিয়ে কি ভুল করলেন?

—সেসব জায়গা কেমন?

—খুব সুন্দর।

—প্যারিস, বার্লিন তোর মনে পড়ে না?

—পড়ে বই কি। বাবা, রান্নার বইগুলো তো আনলাম না, কি হবে?

—বই তো পরে গিয়ে দেখতে পারবি।

—ও বলে যে তোমাকে ফিরতে হবে না, তুমি এখানে এলে আমি চলে যাব।

—ঠাট্টা করে।

—আমার চন্দেরী শাড়িটা ঝিনুককে দিয়ে দিল।

—ঝিনুক কে?

—কে জানে! আমি তো দেখিনি। শাড়িটা দিয়েছিল বলে মা খুব বকল ওকে, আর আমাকে আরেকটা চন্দেরী শাড়ি আনিয়ে দিল।

নীলার বাবা ভুরু কোঁচকান।

তারপর বলেন, ওসব ভাবিস না।

—আমাকেই ও বকল। মিছেমিছি।

—কেন?

—বলল, কোনো কথা মা-বাবাকে বলবে না।

—ভাবিস না তো! খিদে পাচ্ছে? কিছু খাবি?

—না, বাড়ি গিয়ে খাব।

নীলার বাবা ঠিক করেন, আপিসে গিয়ে বরেনকে বলতে হবে সুকৌশলে। বরেনের কে যেন রাজঘাটে থাকে। বরেন রাজঘাটে পড়ত।

কুশল যে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না এটা তো সত্যি। কেন রাখে না?

বরেন বেশ ঘাবড়ে গেল।

বরেন ড্রাফ্‌টসম্যান। বরেন খুব কাজের ছেলে। নীলার বিয়ের সময়ে ও ছুটিতে ছিল।

—কি বলব সার?

—কুশল সেনকে চেনো?

—কোন কুশল সেন?

—রাজঘাটে সুনন্দন সেনের ছেলে।

—আমি....খুব কম দেখেছি সার।

—রাজঘাটে তোমার কে থাকেন?

—দিদি।

—ওখানে পড়তে কেন?

—জামাইবাবু হাসপাতালে ওয়ার্ডমাস্টার। ওনার কাছেই....আমার তো মা-বাবা নেই।

—সত্যিই জানো না?

—কি বলব বলুন?

—কুশল ছেলে কেমন?

—চমৎকার দেখতে....পড়াশোনায় খারাপ ছিল না....স্পোর্টসে খুব ভাল.....

—নেগেটিভ দিকগুলো বলো।

বরেন চোখ নামায়।

—আমি তো চলে আসি হায়ার সেকেণ্ডারির পর....দিদি ওখানে বাড়ি করেছে।

—অর্থাৎ, তুমি যাও?

—হ্যাঁ, যাই।

বরেন ঘাম মোছে। বাতানুকুল ঘরে বরেন ঘেমে যাচ্ছে কেন?

—বলো বরেন, বলো।

বরেন সোজা ওঁর দিকে তাকায়।

—ওর মেয়েছেলে নিয়ে বদনাম আছে। ঝি, হাসপাতালের আয়া, মানে ওই রকম মেয়েদের .....কি বলব। হি লাইক্স আগলি উইমেন।

—গড!

—কয়েকবারই গোলমাল হয়েছে। ওর বাবা টাকা দিয়ে সব মিটিয়েছেন।

—আগে বললে না বরেন?

বরেন খুব অবাক হয়।

—আপনি আমাকে জিগ্যেস করেননি সার। আর.....বিয়ের সময়ে আমি তো বেরিলিতে।

—এখনো কি....কোনো.....

—শুনেছি কে একজন.....

—ঠিক আছে বরেন, এসো এখন। আর এসব কথা কাউকে যেন বলো না....

—না সার, তাই বলি?

নীলার বাবার বুক অশান্ত, অশান্ত। না, হার্টের কোনো সমস্যা নেই তাঁর। এখনো জগিং করেন, মদ খান না, ধূমপান করেন না, শরীর খুব ভালো।

—কুশলের বাবা-মা কেমন লোক?

—কিছু মন্দ তো শুনিনি। আসলে একটা ছেলে, আদরে আদরে যা হয়!

নীলার বাবা হাত নাড়েন।

বরেন বেরিয়ে যায়। কেমন করে ও সারকে বলত, তাঁর জামাই বর্তমানে একটি সমাজবিরোধী চক্রের বজ্জাত মেয়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ?

কেমন করে বলত যে দিদি বলেছে, তোর বস্ কি পাগল? অমন মেয়েকে এমন বিয়ে দেয়? কলকাতায় কি ছেলে জোটেনি?

নীলার বাবা ঠিক করেন, গুরুদেবকে জানাবেন সব। তিনি কেন এ বিয়ে অনুমোদন করলেন?

নীলার মামা কলকাতার বিখ্যাত ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের একজন। শালা ও ভগ্নীপতির ভাব খুব।

সব শুনে তিনি গুম মেরে যান।

—আমার বোনটিকে বলোনি তো?

—না, কিছুই বলিনি।

—নীলাই হয়তো বলবে।

—জানি না।

—কি বলব বলো? তোমাদের অনেক বলেছি যে নীলাকে বিয়ে দিও না, তোমরা শোননি।

—নীলা নিজেই যে "বিয়ে বিয়ে" বলত।

—ও তো ঠিক পরিণত নয়। ডাক্তার রায় তো তোমাদের বলেছিলেন যে বিয়ে করা ওর উচিত নয়!

—কি বলব বলো?

—ছেলেটার খোঁজ বা নিলে কোথায়?

—কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে....

—আর তোমাদের ওই গুরুদেব! তোমরা এ দেশে একটা কলঙ্ক! অশিক্ষিত, অজ্ঞ এমন অন্ধ ধর্মবিশ্বাস করে, সেটা সমর্থন করি না তবে বুঝতে পারি। তোমরা দু'জন লেখাপড়া জানো, সমাজে প্রিভিলেজ্ড সেকশান তোমরা। তোমরাও অন্ধবিশ্বাসে চলো।

—গুরুদেব খুব শিক্ষিত।

—তিনি কি ঈশ্বর? আর বিয়েই যদি দেবে, তাহলে কলকাতায় দেখেশুনে.....না। বিয়ে দিয়ে ঠিক করো নি। এখন শুনছি ছেলেটাই খারাপ!

—আগে কেউ বলেনি।

—আরে ব্যাকগ্রাউন্ড, শিক্ষাদীক্ষা তো দেখবে!

—এখন কি করব?

—নীলাকে পাঠিও না আর। টাকাগুলো কার নামে?

—নীলার।

—ওর কি জ্ঞান আছে বলো!

—ওরা পণযৌতুক চায়নি...

—জানত যে তুমি অনেক দেবে।

—দেখি, মাদ্রাজে একবার যাই।

গুরুদেব বললেন, সিংহ রাশি ছেলের। অমন একটু হতে পারে। কিন্তু নীলা

সুখী হবে, স্বামীর ভালবাসা পাবে। এ হতেই হবে।

—ওদের কিছু বলব না?

—একেবারে না।

—যাক, খুব নিশ্চিন্ত হলাম।

প্রণামীর বাক্সে একটি চেক ঢুকিয়ে দিয়ে ঘরে ফেলেন নীলার বাবা। টেম্পল শাড়ি কেনেন। নীলা পরবে।

কুশলকে ঝিনুক অবাক করে দেয়। চাঁদ, তিনু ও চীনার সঙ্গে পরামর্শ করেই কথা বলে। এ যেন অন্য ঝিনুক।

কুশলকে ও গড় হয়ে প্রণাম করে।

—এ আবার কি ঢং?

—একটা বেরতো করেছিলাম, তাই।

—ওসব কথা ছেড়ে দে। এখন আমার ছুটি।

—শোন, বুঝেশুনে চলো।

—কি বুঝব?

—বউকে দিয়ে লিখিয়ে তো নাওনি?

—না, নেব।

—এখন বুঝলে, ওদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলো। কলকাতা যাও। বাপ-মার মনও ভোলাও।

—ভূতের মুখে রামনাম?

ঝিনুক হেসে বলে, আখের গোছাব আমরাই। বউ এলে পরে এক সময়ে লিখিয়ে নাও। তারপর সব নিয়ে আমরা.....

—কোথায় যাব?

—কিছুকাল নয় গা-ঢাকা দে' থাকব। তা বাদে ফিরে এসে জেঁকে বসব।

—বাবা কিন্তু টেঁওটা আছে।

—ছাড়ো ওসব কথা। ছেলেকে তিনি ছাড়বেন না।

—আর বউ? ছেলে, না মেয়ে?

—তারা থাকুক না ওখানে। আমরা তো আলাদা থাকব।

—তোকে না পেলে বাঁচব না ঝিনুক।

—জানি গো জানি। এখন খানিক একটিনি করো। কলকাতা যাও মাঝে মাঝে। বাপের সঙ্গে কাজ কর।

—তুই মন থেকে বলছিস?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। দাদারাও তাই বলছে।

—বেশ! তুই যা বলিস!

কুশলের বাবা-মা বিমোহিত।

নীলার বাবা-মা বিমোহিত।

নীলা আনন্দে উদ্ভাসিত।

—তুমি আমাকে তাহলে ভালবাস?

—খুব ভালবাসি।

—নিশ্চয় বাসো। নইলে কতবার এলে বলো তো?

—আসব না? বাড়িতে ভালই লাগে না।

কুশল আসে কয়েকবার। সারাদিন কাটিয়ে যায়। দেখেশুনে নীলার নাস্তিক মামাও খুশি হন।

বোনকে বলেন, নীলা তো খুশি, এটাই যথেষ্ট।

—হ্যাঁ.....খুব খুশি। ও তো চিরকালই খুব সামান্যে খুশি হয়। এখন তো খুবই খুশি।

—বাচ্চা হওয়া নিয়ে কি বলছে?

—ভীষণ খুশি। বলছে, বাচ্চাকে আমিই মানুষ করব। কারো হাতে দেব না।

—শাশুড়ী তো খুব স্নেহ করেন ওকে!

—খুব। বলেছেন হাউসকোট পরে থাকো। ভারি কাপড় গয়না পরবে না।

—সাধ না কি বলছিলি?

—এখানেই দেবেন।

সুনন্দনবাবুর খরচে, একটা বিয়ের ধুমধামে নীলার সাধ হয়। কুশলের বোনরা আসে এবং হাঁ করে নীলাকে দেখে। বড় মেয়ের মেয়ে বলে, মামী, সিনেমায় যদি নামতে!

—আমার ভালই লাগে না।

—মডেল হতে পারতে।

—ওসব খুব চীপ লাগে।

—কি ভাল লাগে?

—কেন, সবই ভাল লাগে।

নীলা একটু অবাক। কুশলের মা ওর গায়ে মাথায় হাত বোলাতে থাকেন।

—কোন ভাগ্যে এমন মেয়ে পেয়েছিলাম জানি না। তোদের কথাবার্তা ও বোঝে না রে। বড়ই ভালমানুষ।

নীলাকে ঘিরে এত হইচই নীলার খুব ভাল লাগে। এ বাড়ির সাধ, ও বাড়ির সাধ মিটে যায় একদিন।

তারপর উদল্যান্ডস্ নার্সিংহোমে চমৎকার একটি মেয়ে হয় নীলার। গুরুদেব টেলেক্স পাঠান, মেয়ের তিন বছর বাদে ছেলে। তারপর দীর্ঘ একচল্লিশ বছরব্যাপী সুসময়। আমার আশীর্বাদ রইল। নবজাতিকা পয়মন্ত।

সুনন্দনের বাড়ি থেকে রাজঘাটের কালী-শিব-শীতলা মন্দিরে পুজো যায়। সবাই

বলে, মেয়ে হতেই এত ? ছেলে হলে না জানি কি করবে !

সুনন্দন ও তস্য পত্নী ছেলে হলেই খুশি হতেন। কিন্তু মাদ্রাজে বসে এক ঈশ্বরপ্রতিভূ গুরুদেব বলছেন, এ মেয়ে পয়মন্ত। এও বলছেন যে এর পরে আসছে ছেলে। তাই আনন্দ করতেই হয় ওঁদের। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁদের ছেলের সুমতি হয়েছে এখন।

সুনন্দনরা খুবই কৃতজ্ঞ সেজন্যে।

বাবা ছেলেকে বলেন, আর যা করো করো, ওই ফালতু মেয়েছেলের পেছনে ঘোরা বন্ধ করো। এক সময়ে ইয়ে করা চলে, তোমার ঠাকুদ্দাও করেছে। তবে, যাকে বলে রেসপেক্টবল হবার পর আর কিছু করেনি।

কুশল বলে, হ্যাঁ, বাবা। শোন বেদেড্যাঙা মাঠটা সার্ভে করতে হচ্ছে। মনে হয় কর্মকারদের কিছুটা জমি ঢুকে গেছে। সে আমি সামলে নেব।

—সামলে নেবে গুণ্ডা লাগিয়ে ? ওসব ভুলে যা কুশে। অমিয়বাবু বলেছে ও সব গুণ্ডাবাজি আর চলবে না। বদনাম বাড়ানো চলবে না। জমি ঢুকেছে, দাম দিয়ে কিনে নাও জমি।

—জমির দাম কত জানো ?

—তাও কিনতেই হবে। বর্তমানে আমি পড়েছি গাড্ডায়। টাউনের রকমসকম দেখছ না ?

—সম্পত্তি বাড়ালে বদনাম হবেই।

—এখন মোটের কথা, খুব খারাপ সময়।

—আরে, সার্কেলবাবু আমাদের লোক।

—যা বললাম, তেমন করো গে। সার্কেলবাবু ! খবর রাখো কিছু ? কর্মকার মিলনবাবুর কাছে গেছে, অমিয়বাবুর কাছে গেছে ? অমিয়বাবু বলে দিয়েছে, বেদেড্যাঙাতেই শেষ। আর জমি কেনাকেনি বন্ধ রাখুন। এখানে রবি সাঁতরা আমার শত্তুর। আর শুনতে পাচ্ছি, আচম্বিতে কার কি সম্পত্তি বাড়ল এসব নিয়ে কাগজে খবর বেরোবে। রবি আপনাদের টাকা খেয়ে থাকে, সেই আপনাকে বাঁশ দেবে। আমি টাকা খাই না, আমি কেন আপনার দরুন পাপের ভাগী হতে যাব ? জমানা বদলাচ্ছে। পার্টির ছেলেরা আমাদের দুষছে। তাই বলি, সাবধানে চলুন।

—কর্মকার এত বেড়েছে ?

—পেছনে রবিবাবু।

—দেখতে হচ্ছে।

—কিছু দেখো না। কর্মকারের সঙ্গে মিউচুয়ালে চলে যাও। কে জানত এমন হবে !

সত্যিই তো, পরিস্থিতিটি যথেষ্ট ঘোরালো হয়ে উঠেছে। কলকাতার আশেপাশের বিরাটি বানতলার পর রবিবাবুদের দলের মহিলা সমিতি এখন নারী নির্যাতন, বধূ নির্যাতন, বধূহত্যা, নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে হরদম মিটিং করছে।

রাজঘাট নাগরিক সমিতি এবার "সমাজবিরোধী ও পুলিশ এক শিবিরে কেন"

শীর্ষক যে আলোচনাচক্র ডাকে, তাতে অমিয়বাবু, মিলনবাবুও বক্তা ছিল।

এ সময়ে জয়সোয়াল অ্যান্ড সেন কোম্পানি কিছুতেই ঢালাও কারবার সপাটে চালাতে পারবে না, উচিত হবে না।

জয়সোয়াল শিলিগুড়ি-রাজঘাট-কলকাতা ঘোরে হরদম্। সেও সুনন্দনকে বলেছে, টেক ইট ইজি। গো স্লো। সময় অন্যরকম। চুপ করে থাকুন, সব শান্ত হয়ে যাবে। এ সময়ে ঝামেলা বাড়াবেন না। আর, আপনার ছেলে কেমন ছেলে ? গুণ্ডা বদমাশদের সঙ্গে মেশে হরদম ?

সুনন্দন কুশলকে সব বললেন।

কুশল বলল, ঠিক আছে।

—বিপদে পড়লে বাঘ ছাগলের সঙ্গেও মিতালি করে, বুঝিস না ?

—বুঝলাম।

—এতদিন যা করেছ তা করেছ। এরপর বউমা এলে তার সঙ্গে শান্তিমত ঘরসংসার করবে। জয়সোয়াল কেন, সবাই ছ্যা-ছ্যা করে। অমন বউ থাকতে.....

কুশল সব কথাই ঝিনুককে বলে।

ঝিনুক বলে, মিথ্যে বলেনি তোমার বাপ। নেদো আর পটকা বম্বে পালাল। মহাজন বলছে, চুল্লু ছেড়ে আর কিছু ভাব। থানা তো কোনো পোটেকশানই দেয় না। শুধু হাঁ করে টাকা গেলে।

ঝিনুকের ঘর থেকে বেরোতে তাপসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

—তাপস কি নামোপাড়ায় আসো নাকি ?

—না দাদা। ডিউটি থেকে ফেরার কালে মাঝে মধ্যে শর্টকাট করি।

—তা.....বউয়ের গানের ইস্কুল চলছে ?

—কোনোরকমে।

—ঘরটা তো দিলে না। ভেবে দেখো, আমাদের নতুন যে হাউসিং হবে, তাতে ন'শো স্কোয়্যার ফুট মস্ত ফ্ল্যাট দিয়ে দিতাম।

তাপস গভীর আন্তরিকতায় বলে, বাপ-ঠাকুর্দার চিহ্ন একটা, সে জন্যেই মমতা।

—হ্যাঁ.....বুঝলাম.....এসো।

তাপস চলে যায়। কুশল মনে মনে ভাবে, এ দিনও দিন নয়। একদিন ও বাড়ি আমার হবে। ঝিনুক থাকবে। টাউনকে কলা দেখিয়ে ওখানেই.....

ছ'মাসের মেয়ে নিয়ে একদিন নীলা ফেরে। সঙ্গে পাথর-পাথর মুখ, কর্তব্যে সুকঠোর আয়া বিমলা।

নীলার মা বলে দেন, বিমলা নীলার ছোটবেলায় ছিল। তারপর আমার দাদার কাছে। খুব বিশ্বাসী।

—আয়ার কি দরকার, বেয়ান ?

—এ সময়টা থাকুক। নীলা সব পারেও না, রাতে ঘুমটা ওর দরকার। আপনিও

ব্যস্তই থাকেন.....

নীলাদের ঘরের পাশেই বিমলাকে একটি ঘর দিতে হয়। ঘর এ বাড়িতে অনেক। কুশলের মায়ের গায়ে তেল মালিশ করে, ঘরদোর ঝিদের দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে বিমলা ক'দিনেই সকলের মন জয় করে।

ছোট্ট মিতালির আদরযত্ন করে গভীর নিষ্ঠায়। নীলাকে বলে, যাও দিদি, বেড়াও, পুজো দেখো, আমি বেবিকে দেখব।

নীলা দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে, আরো ঢলঢলে। শাশুড়ীকে বলে, মা, আমাকে সব ঠাকুর দেখাবে তো?

—নিশ্চয় দেখাব।

অষ্টমীর সন্ধ্যায় পূজামণ্ডপে তাপস নীলাকে সেই প্রথম দেখেছিল। একটু লম্বাটে মুখ, পাতলা ঠোঁট, ঈষৎ বাদামী চোখে শিশুর বিস্ময়। মাথায় মস্ত খোঁপা, শাশুড়ীর হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিল।

বনানী বলল, সত্যিই দেবীপ্রতিমা।

—যেন সরস্বতী।

—মুখ কি সরল, কোনো মেকাপ নেই।

সেই প্রথম দেখা।

আর শেষ দেখা?

৩

পুজো চলছিল বলে তাপসের কিন্তু ছুটি ছিল না। ছুটি ও নিতেও চায়নি এখন। এবার পুজোয় ওদের মেয়ে মামা-মামীর সঙ্গে রাজস্থান বেড়াতে গেছে। শীতের সময়ে তাপস, বনানী, মেয়ে একসঙ্গে যাবে চাঁদিপুর ও চিল্‌কা। পুজোর সময়ে অন্তত দিনে ডিউটি দিলে ওর মনিব নবনী সারোগী কিছু খুশি থাকে। বোনাস দেয় না, তবে "পূজা এক্‌সপেন্‌স" নামে কিছু টাকা দেয়।

পুজোর সময়টা সারোগী গেস্ট হাউসে নবনী সারোগীর মা, বাবা, কাকা, পিসিমা, সবাই এসে আছেন। কালীপুজো অবধি থাকবেন। নিশিড়া-যশপুর রাজবাড়ির কালীপূজা এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। সেই পুজো দেখে যাবেন।

গেস্ট হাউসের দোতলায় সারোগীর নিজস্ব থাকার জায়গা। সেখানেই এঁরা আছেন। এ বছর নবনীও আছে। মনিবদের খেদমত করতে খুব নারাজ কেয়ারটেকার দিলীপ। সে ছেলে খারাপ নয়, কিন্তু তেরিয়া ও রুক্ষ।

—মনিব হলেই সব শুনতে হবে?

—ওরা মালিক, আমরা সোমিক।

—সোসনের দিন চলে গেছে।

তাপস ওকে বোঝায়।

—দেখ, তোর কথা সত্যি। কিন্তু দিলীপ, যতদিন না অন্য কাজ পাচ্ছি, তোর

এই আটশো টাকা, আমার এই পনেরোশো টাকাটা দরকার।

—সে সাচ্ বাত।

—দিনে মিল্ পাই, সুবিধেও আছে।

—কি কত্তে হবে?

—একটু মানিয়ে নে। আমি তোর টাকা বাড়াতে বলেছি, আমার কথা বলিনি।

—কাজ করছি তোমার জন্যেই।

—হ্যাঁ, দিলীপ।

—নইলে অ্যান্টিসোসাল হয়ে যেতাম। তবে মাইরি, চাঁদদের, ন্যাতাদের, বনিদের টাকার রেলা যখন দেখি, তখন মাথা খারাপ হয়ে যায়। গুণ্ডাগর্দি করে এত টাকা!

—মাথা খারাপ করিস না, লক্ষ্মী ভাই আমার। মালিক কথা দিয়েছিল তোর ভাইকে ড্রাইভার রাখবে, রেখেছে তো! দেখবি, সৎপথে থাকলে....

—যাক গে। তুমি যা বলছ, করব। দিলীপ বেইমান নয়। বরাটবাবুকে ধরে আমায় ছাড়িয়েছিলে, আমি ভুলিনি। তবে কালীপুজোয় ছুটি চাই।

—ছুটি দেব। আমি নয় থাকব তখন। তুই ঘরে যেতে রাত করিস না। রাত হলে নামোপাড়া দিয়ে যাস না। খুব, খুব খারাপ হালচাল ওখানে।

—হ্যাঁ.....শুনি.....

—কুশলবাবু টাকা ঢালছে ঝিনুকদের ঘরে.....নইলে অত রমরমা ওদের.....আর রাতে বেগাঁয়ের লোক দেখলেই পিটিয়ে খুন করে.....বলে স্যালো চুরি করতে ডাকাত এসেছিল.....কে না জানে যে স্যালো চুরি কে করে?

—না না, তাই যাই?

—সেদিনও গিছলি।

—বিকেল বিকেল ছিল।

—যাস না।

—ঠিক আছে।

কিন্তু সে কথা তো তাপস রাখতে পারেনি। কেননা নবমীর রাত এসেছিল মহাসমারোহে, বিদ্যুৎচমকে, দমকা হাওয়া ও বৃষ্টিপাতে চূর্ণী নদীকে উত্তাল করে। দুর্যোগ, ঘনঘোর দুর্যোগ।

নবমীর সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছিল। পৌনে আটটা নাগাদ বৃষ্টি কমলে তাপস গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে পড়ে। গেস্ট হাউসের পর চূর্ণী সেতু। তারপরও মাইলখানেক। সেতুর কাছে যখন পৌঁছয়, তখন একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। গাড়ি আছে, লোক নেই।

তাপস সেতুতে বাইক ঠেলে উঠছিল, হঠাৎ মনে হয় ওর বাঁ পাশে মাটির ওপর চলাফেরার শব্দ। বাইক দাঁড় করায় ও, কিছু না ভেবেই জোরালো টর্চটা জ্বালে ও ঘোরায়।

কুশলের চোখ ওর চোখে? ওকে কি দেখা যাচ্ছে? কুশল পাঁজাকোলা করে কাকে ধরে আছে? কার ফর্সা, সুন্দর মুখে টর্চের আলো?

তাপসের মাথায় ভূমিকম্প হয়ে যায়। টর্চ নেবায় ও, সাইকেলে ওঠে। চালাতে থাকে জোরে। তারপর বাঁদিকে বনবিভাগের কম্পাউন্ডে নেমে যায়। ঘন ঘন গাছ। এখানে গাড়ির হেডলাইট মারলেও তাকে দেখা যাবে না। না, অন্ধকারে কুশল ওকে চেনেনি নিশ্চয়। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, তাতে দেখে ফেলেছে? না, তা যেন না হয়।

সাড়ে ন-টায় বাড়ি ফেরে তাপস। মিলন কাকা দরজা খুলে দেয়।

—এসো, এসো। যে দুর্যোগ.....

তাপস শুধু বলতে পারে, কাকা....বনানীকেও বলে দিন.....কেউ জিগ্যেস করলে.....বলতে হবে.....আমি আটটায় ফিরেছি।

তারপরই ও হড়হড় করে বমি করে। বমির দমকের মধ্যেই বলে, ডাক্তার ডাকবেন না।

তারপর সব কিছুক্ষণ অন্ধকার।

ওরা ওকে কি ভাবে জল ঢেলে পরিষ্কার করে, কেমন করে জামাকাপড় বদলায়, কেমন করে টেনে মিলন কাকার বিছানায় শোয়ায়, তাপস জানে না।

ভোরের আগে ও তো কিছু বলতেই পারেনি। বলল যখন, ওই একই কথা।—বলবে আমি আটটায় ফিরেছি।

মিলনবাবু বলল, কিন্তু কেন বলব?

—আমি বলতে পারব না।

—এত ভয় পেয়েছ কেন?

—ও বাবা! জিগ্যেস করবেন না।

—আমি কাউকে বলব না তাপস!

—পারব না, আমি পারব না।

কিন্তু বনানী যখন ভাসানের আগে প্রতিমাকে সিঁদুর দিয়ে, সন্দেশ ও পান দিয়ে ফিরে আসে তখন তো তাপস আর চুপ করে থাকতে পারেনি।

বনানী ফিরে এল মুখ থমথমে করে।

—কি হলো বউমা?

—ওপরে চলুন, বলছি।

ওপরে এসে বনানী বসে পড়ে।

—এমন কথা কে কোথায় শুনেছে?

—কি কথা?

—সবাই বলছে, কুশলের বউ নাকি কোথায় চলে গেছে। ওদের বাড়ির সব দরজা জানলা বন্ধ।

—সে কি!

কুশল ঠাকুর দেখাতে বেরিয়েছিল, ভিড়ের মধ্যে.....জানি না, নানা জনে নানা

কথা বলছে।

তাপস হঠাৎ বলে ওঠে, না, কোথাও যায়নি।

—কি বলছ তাপস ?

—বিশ্বাস করুন.....

কাঁদতে কাঁদতে তাপস সব কথাই বলে।

সব শুনে মিলনবাবু ও বনানী বোবা।

তাপস মুখ ঢেকে থাকে।

বনানী বলে, কাকাবাবু, কি হবে ?

মিলনবাবু যেন অনেক দূর থেকে ফিরে আসে।

—কি বললে ?

—কি হবে এখন ?

—বিবেক বলে, এখনি থানায় যাক তাপস, সব বলুক। কিন্তু বাস্তববুদ্ধি বলে, তাতে তাপসের বিপদ। ওরা ধনী, থানার সঙ্গে কুশলের ভাল দোস্তি। যদি জানায় থানাকে, থানা তো কোনোদিন সহজে অ্যাকশন নেয় না বধূহত্যা কেসে। তারপর, তাপস বলতে পারবে না, কুশল খুন করেছে। ও দেখেছে কুশল একজনাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে জ্যান্ত না মরা, তাও হলপ করে বলতে পারবে না। একে রাত, তায় বাদলা বিষ্টি ছিল, ব্রিজে আলো ছিল ?

—তখন তো ছিল না।

—বললে পরে.....তাপস ও পথেই আসে যায়.....যাক গে, আপাতত তাপস চুপ করে থাকুক। বউমা কোথাও বলো না এ কথা। ঘটনা কোনদিকে ঘোরে, দেখো। টাউনে কয়েকটা কেসই চাপা পড়ে গেল !

—আমার গায়ে কাঁটা, দিচ্ছে এখনো।

—চুপ করে থাকো এখন। যেন কিছু হয়নি, এভাবে চলাফেরা করা। পারবে ? বউমা আছে, মেয়ে আছে, মনে রেখো।

—পারতে হবে কাকা। আটত্রিশ বছর বয়স হলো, কোনোদিন থানা-পুলিশের ধারে যাই না। এক যা দিলীপকে ছাড়াতে একবার.....

—প্রেসে তো যাব। খবর পাবই সব। ওখানে কেষ্টর চায়ের দোকানেই তো সবাই গুলতান করে। তা ছাড়া, তেমন হলে অমিয় বা রবি সুনন্দনকে ছাড়বে না। ওরা তো ভাবমূর্তি তুলতে চাইছে।

বনানী আস্তে বলে, যদি তেমন হয়.....শাস্তি হবে ?

—খুব কম হয়।

—যদি ফিরে এসেছে জানা যায়.....

মিলনবাবু বলে, ওঠো ওঠো বউমা। বছরকার দিন। ঘরদোর গোছাও। তাপসকে খেতে দাও কিছু। আমি একবার ঘুরে আসি। উঠোনের আলোটা জ্বেলেই রেখো। তোমার শাশুড়ী থাকতে এমন দিনে.....

—হ্যাঁ, কাকাবাবু।

বিকেলের আলো ম্লান হয়ে এসেছিল। আকাশে আবার মেঘ ঘুরছিল। বনানী আস্তে বলল, ভেব না। ভয় পেও না।

—ভয় করে।

ভয় করে, খুব ভয় করে তাপসের। প্রথম চাকরি বিশ বছর বয়সে চটকলের আপিসে। চাকরির ভরসায় বিয়ে করল বনানীকে। তারপর মালিকপক্ষ যা শুরু করল, ইউনিয়ন যেভাবে ডোবাল, তাপস চাকরি ছেড়ে কোনোমতে টাকাপয়সা নিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর পায়ের তলায় যখন মাটি পায় না, মিলনবাবুই ওকে নিয়ে যায় সারোগীর কাছে। ন'শোয় ঢুকেছিল, দেড় হাজারে পৌঁছেছে। চটকল জীবনের দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতে রেখেছে। আর শরিকদের সঙ্গে মিউচুয়াল করে বাড়ি ভাগাভাগি হয়। সে সময়ে ওকে জ্যাঠতুত ভাইরা একটি ঘরের জন্য সাত হাজার টাকা দেয়।

সে টাকা মেয়ের জন্য শ্যামলকে দিয়ে দিয়েছে।

বনানী গান শিখিয়ে দু-আড়াইশো টাকা পায়। কেমন করে চালায় বনানী, তা ওই জানে। মেয়ের জামাকাপড়, বইয়ের খরচা কেমন করে দেয়? মাসে একদিন মাংস হয়, ঠিকে-ঝি কাজ করে যায়, সব বনানীর জন্য।

এটুকু নিরাপত্তাতেই বনানী কৃতজ্ঞ।

তাপস জানে, তার কিছু হলে এ বাড়িটা ছাড়া বনানী ও মেয়ের কিছু থাকবে না।

তাপস কোনোদিন মারদাঙ্গা করেনি। ওর কোনো শত্রু নেই। সারাজীবন নরম গলায় কথা বলে গেল। কেউ অকারণ অপমান করলেও জবাব করে না।

সে কেন ওই দৃশ্য দেখল?

মণ্ডপে নীলাকে দেখেছে, যেন সরস্বতী।

কুশল কি করে নীলাকে..... ?

বনানী বলে, ছুটি চাও দেখি। ক'দিন কলকাতা ঘুরে আসি। দাদারা আসুক, আমরা যাব।

—এখনি ছুটি নিলে শীতে ছুটি দেবে না।

—না দিক।

—দেখা যাক। আজ যেতে পারলাম না.....

—আজ দিলীপ এসেছিল জিগ্যেস করতে।

—আমায় ডাকলে না?

—কয়েক বার ডাকলাম, সাড়া পেলাম না।

—কি বলল ও?

—কি আবার! আজ যাওনি কেন, তাই। বললাম, পুজোতে রাত করে খেয়ে পেটগরম করেছে, বমি হয়েছে, শরীরটা খুব খারাপ। রাতে কষ্ট পেয়েছে, বেলা করে

ঘুমোচ্ছে। ও চলে গেল। তোমায় খুব মানে। বলল, ম্যানেজার কি করে? যা করে, আমার দাদা।

তাপস ভাবে, দিলীপকে তো বলা দরকার, যদি কেউ জিগ্যেস করে যে তাপস গেস্ট হাউস থেকে বেরোয় কখন, বলতে হবে, সাতটা নাগাদ।

আবার ভাবে, দিলীপ যদি সন্দেহ করে?

গেস্ট হাউসে কাল যাবে।

ফেরার পথে তো নামোপাড়া মোড় পেরোতে হবে, যদিও নামোপাড়া গ্রামটি মোড় থেকে খানিক ভেতরে। ওখানে কুশলকে দেখেছিল।

ভাবতেও ভয় করে।

একই সঙ্গে, গলা ফাটিয়ে সকলকে বলে দিতে ইচ্ছে করে যে নীলা কোথাও চলে যায়নি।

নীলা সেন, কুশলের বউ, হঠাৎ কোথায় চলে গেছে, এ কথা নিয়ে রাজঘাট গুলতানি করে ঠিক দেড় দিন।

শোনা যায়, কুশল মর্মাহত।

কুশল মুখ লুকিয়ে আছে।

তারপর শোনা যায় সুনন্দন সেন চলে গেছেন কলকাতা। নীলার বাবাকে খবর দিতে গেছেন।

মর্মাহত ও বিধ্বস্ত কুশল রাজঘাট থানায় গিয়ে ডায়েরি করেছে, এও শোনা যায়।

তাপস কোনো কথায় কান দেয় না।

নীলাকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে নীলার বাবা বসে পড়েন চেয়ারে, মাথার রগ চেপে ধরেন।

—কুশলের সঙ্গে বেরিয়েছিল?

—হ্যাঁ, বেয়াই।

—গড!

—এখানে.....আসেনি?

—বসুন, এসে বলছি।

পাশের ঘরে চলে যায় নীলার বাবা। ফোন করেন কাউকে। নিচু গলায় অনেক কথা বলে যান। তারপর আবার ফোন করেন। সুনন্দন মাটির দিকে চেয়ে বসে থাকেন।

নীলার বাবা ঘরে ঢোকেন।

—বসতে হবে একটু। আমার শালা আসছে.....

—আপনারা কি যাবেন?

—হ্যাঁ, যাব। স্ত্রীকে ডাকছি, কিছু বলবেন না। বলবেন, নীলা অসুস্থ।

—ওঃ ভগবান!

—আর কিছু বলবেন না। আমরা নীলাকে আনতে যাচ্ছি। নবমী.....বিজয়া.....একাদশী.....কাল ফোন করেননি কেন? কালকে?

—খুব আপসেট.....ফোনও পাইনি.....

ঈষৎ তিক্ত হেসে নীলার বাবা বলেন, ওদের কোনো ঝগড়া হয়েছিল?

—মাঝে মাঝে.....

—আশ্চর্য! নীলা কোনোদিন ঝগড়া কি তা জানে না। পথে কেউ চেঁচালে ভয় পায়।

নীলার মা আর মামা একসঙ্গেই ঢোকেন। মামা বলেন, চলো। হ্যাঁ, আমি লিখিয়ে এনেছি। উঠুন মশাই, চলুন।

ভগ্নীপতিকে বলেন, ফোনও করে দিচ্ছে। ওঃ, তোমরা যে কি করলে!

নীলার মা বহুকষ্টে বলেন, নীলাকে নিয়ে এসো।

রাজঘাটে সংবাদ ফেটে পড়ে।

গেস্ট হাউসে বসে তাপস শোনে।

দিলীপ আর বাবুল দুজনেই উত্তেজিত।

—বউটার মামা কদ্দূর ব্যবস্থা করেছিল জানো দাদা? পুলিশের সবচেয়ে বড় সায়েবকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছিল, কোনো মেয়েছেলের লাশ পেলে মর্গ্যে রাখবে। তিনি সাক্যেলবাবুকে ফোনও করেছিল, তবে লাইন পায়নি।

—তোরা নিজের কাজে যা।

—ওদিকে চাঁপাইবেড়ের বাঁকে জেলেরা এট্টা মেয়েছেলের লাশ তুলেছে কাল। পুলিশ একবার বলে তুলেছে, একবার বলে তুলতে পারেনি, ভেসে গেছে। কিন্তু সবাই বলছে, পুলিশ লাশ গুম করেছে।

—আমি শুনতে চাই না।

—ওনারা থানায় ডাইরি করেছেন। তা বাদে কুশলবাবুদের বাড়ি যেয়ে ঝি আর বাচ্চা নে গেছে কলকাতা। কুশলবাবু নাকি পাগলা হয়ে গেছে। বলছে, তাকে এনে দাও, তাকে এনে দাও।

বাবুল বলে, সব ফল্‌স মারছে। আমি জানি না? আমার মাসতুত দাদা মর্গ্যে নাম লেখে। বডি না পাওয়া গেলে কোনো প্রেমাণ হয় না। সেই রুমা মাস্টারনীর বেলা দেখো নি? স্বামী লাশ গুম করে দিল, ব্যস, এখনো রুমার নাম নিরুদ্দেশ খাতায় রয়েছে।

দিলীপ বলে, কুশলকে ধরে প্যাঁদাক না! সব বেইরে পড়বে। ঠেলার নাম বাবাজী।

বাবুল গেস্টদের কাছে বখশিশপ্রাপ্ত ক্লাসিক সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, নবুমীর রাতেই সে মাল সার্কেলবাবুকে হেভি খাইয়ে রেখেছে। সার্কেলবাবু বড় সায়েবদের বলবে, ইয়েস সার। কাজের বেলা কিছু করবে না।

দিলীপ বলে, বেটা ছোট ছোট কেলাবের কাছেও টাকা চায়। আর নামোপাড়ার

সঙ্গে.....হোথা কতগুলো খুন হলো, তা দেখেও দেখে না।

তাপস ক্লান্ত গলায় বলে, তোরা থামবি?

দিলীপ বলে, ঝিটাও চেঁচিয়ে গেছে মাইরি! সবাই শুনেছে। কি যেন লিখে দিতে বলছিল.....

বেল বেজে ওঠে। তাপস বলে, চার নম্বরে যা বাবুল। কি চায় দেখ্।

চলন্ত গাড়িতে নীলার বাবা নীলার মামাকে বললেন, সব শুনে সেবারই নীলাকে বলি, কোনো কাগজে সই কোর না মা। বিমলার কথায় বুঝছি সেটাই কাল হলো। কুশল গত দুমাসে সাত-আট বার খুব চেঁচিয়েছে, "সই করবে" বলে, আর নীলাও নাকি সমান তেজে বলেছে, "সই করব না। বাবা বারণ করেছে।"

বিমলা থমথমে।

—নীলা তো বুঝত না। নবমীর দিন.....আনন্দ করে.....তারপর যে কি হলো....অনেক রাত.....নীলার শাশুড়ী কাঁদছিল খুব।

—ওঁরা দুর্ব্যবহার করতেন?

—কেউ না। শাশুড়ী তো.....

নীলার বাবা বলেন, সই করে দিলে টাকা যেত, কিন্তু নীলা হয়তো.....

মামা বলেন, মিসিং স্কোয়াডে একটা.....কাগজে কাগজে ছবি দিয়ে.....

—কোনো লাভ হবে মনে করো?

—ফেস্ রিয়ালিটি। যতক্ষণ না তাকে জীবিত কি মৃত পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ.....

—ওর...মাকে...কি...বলব?

—বলবে, পাওয়া যাচ্ছে না, খোঁজ চলছে। বিমলাও কিছু বলো না। দে আর গিল্‌টি। দেখলে না, মেয়েকে কত সহজে দিয়ে দিল?

বিমলা বলল, শাশুড়ী তো ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। বেবিকে দেখতই বা কে?

—ইয়েস.....নীলাকে বিয়ে দেয়াটা.....

নীলার বাবা ভুরু কুঁচকে চুপ করে থাকেন। কি হয়েছে, কি হতে পারে? নীলা কি ভয়ংকর বেঁকে বসেছিল সই করবে না বলে?

নীলার মামা বলেন, একটা ব্যাপারে কুশল জব্দ। নীলা যদি সই না করে থাকে, তাহলে ও কোনোদিন ও টাকায় হাত দিতে পারছে না। নীলাকে না পাওয়া গেলে...

নীলার বাবা জবাব দেন না। মনে ধস্ নেমে যাচ্ছে। গুরুদেব তাহলে সত্যদ্রষ্টা নন, আর নীলা তাহলে আর ফিরে আসবে না! নীলা যে নেই, মন তাই বলছে। এখন বুঝছেন, তিনিও ভেবেছিলেন বিয়েই নীলার পরম গতি।

যদি না ভাবতেন!

শ্যালক বলেন, ছেলেদের এখনি...

—না। জানাব পরে। সুসংবাদ তো নয়।

—কালচারে এত তফাৎ। এসব বিয়ে কখনো...

—গাড়িটা দাঁড় করাও মানিক, একটা ডাব খাই।

—হ্যাঁ, সার।

নীলার মেয়ে কাঁদে। বিমলা ওকে থামায়।

৪

নবমীর সন্ধ্যার পাঁচ দিন বাদে নীলা রাজঘাটে ফিরে আসে। কাগজে কাগজে নীলার ছবি এবং সন্ধান দিলে পঁচিশ হাজার টাকা ঘোষণা বলরাম হালদারকে বড় উতলা করে দেয়। বলরাম ওর বড় ছেলেকে ডেকে নিয়ে যায় বাইরে। বলরাম নৌকোয় মানুষ ও মাল বয়। চাঁপাইবেড় ঘাট থেকে ওদিকে দশানি, মাজাকুল, এদিকে তাপসে, বোয়ালডাঙা নৌকো চলাচল করে। বলরামের ছেলে মাছ ধরে, বেচে। নৌকো ওদের নিজস্ব এবং নৌকো নানারকম মাল বয়।

সময়ে চুল্লু এবং মাদকও। সে কারণে রাজঘাট থানা বলরামকে এবং বলরাম রাজঘাট থানাকে দেখে চলে। এখন দিনকাল মিউচুয়াল করে চলার।

বলরাম ছেলেকে পাড়ে বাঁধা নৌকোয় বসায়। বলরাম তার অনেক রোজগারের কথা ছেলেকে বলে না, ছেলেও বলে না বাপকে। কিন্তু এখন হলো সংকট-সময়।

—কি হয়েছে?

—কাগজটা দেখ্।

—কি দেখব?

—ছবি দেখে দোকান থেকে কিনে আনলাম।

বিড়ি নিভিয়ে বলে, এই বউটাকেই পেয়েছিলাম, ঘাড় ভাঙা। থানার কথায় আমি আর তুই মসজিদডাঙায় পুঁতে দিলাম।

—ও, সেই হাজার টাকার ব্যাপার?

—রাজার ঘরের মেয়ে হবে। পঁচিশ হাজার টাকা দেবে, ভাবতে পারিস?

—কি করবে, খুঁড়ে তুলবে?

—বলরাম হালদার কি ঘাস খায়? শোন, টাউনে যাব, মিলনবাবুকে বলব সব। সে লোক আমাদের এখানে বসত করিয়েছিল। মোটে-মাটে তাকে বলব, এমন একটা গস্তা কর, যাতে হইচাই লেগে যায় টাউনে। টাউনে হইচাই উঠলে আমরা বেঁচে যাব। আমি বলব, শটকার্ট কত্তে যেয়ে দেখি কুকুরে মাটি খুঁড়ছে, তা বাদে সন্দ হতে.....মোটেমাটে থানার কথা চেপে যাব। তা বাদে লাশ নিয়ে ফেলব টাউনে।

—সার্কেলবাবু ছেড়ে দেবে?

—ভাগ দেব।

—ও কার বউ তা জানো? সে লোক থানাকে মোটা খাইয়েছে নিশ্চয়। নইলে থানা লাশ গুম করতে বলে?

—এত টাকা!

—আমিও তাই ভাবছি।

—মিলনবাবুকে সব খুলেমেলে বলি তবে। সে জনা ভাল বুদ্ধিই দেবে। কে কখন লাশের খবর পেয়ে কি করবে, টাকার লোভে সার্কেলবাবুও...

—যা হোক ধর্মাধর্ম বলেও একটা কথা আছে। ছবি দেখে তো মনে হচ্ছে সরস্বতী ঠাকুর। তোর বউ বলে টান নেই বুঝলাম, কিন্তু বাপ-মায়ের মেয়ে। একটা ছেলে না মেয়েও কি হয়েছে.....

—হ্যাঁ...আমিও তো অমানুষ, টাকা দিল আর অমনি...এখন বুকটা কেমন করছে।

—তবে চলো টাউনে।

—সার্কেলবাবু জানতে পারলে কি করবে কে জানে! সে একেবারে কাঁচাখেগো হয়ে বসে আছে।

ছেলে বৈঠা টানতে টানতে বলে, মিলনবাবু তোমাদেরে বসত করিয়েছিল?

—আর কে! তখনে পাট্টি করত।

বলরাম ভুরু কুঁচকে জলের দিকে চেয়ে থাকে।

—এবারে তেফসলী ধান, মুলো-লঙ্কা-বেগুন সব বিসজ্যনে যাবে। এত বিষ্টি, এত জল! চুন্নিতে এত জল বহুদিন দেখি না। জলে ধার বা কত! বর ধানটা যদি ওঠে, তবে মানুষ বাঁচবে। হ্যাঁ, আমরা একুশ ঘর, তা বোসচৌধুরীরা উচ্ছেদ করল দশানি থেকে। মিলনবাবুরা পাট্টি করত। আমার জ্যাঠা তখনে খুব ডাকাবুকো মানুষ ছিল। সে বলল.....তোমরা যখন আসছ, আমরা খাওয়াচ্ছি, রাখছি। তা উচ্ছেদ করছে, ব্যবস্থা কর। তখন জমিদারী সবে চলে যাচ্ছে। তা মিলনবাবুরা দশজনে পড়ে আমাদের দশানি হতে এনে চাঁপাইবেড় বাঁকে জমিতে রেকড করে বসিয়ে দিল। টাউনে গিরিবাবু উকিল ছিল, পাট্টির উকিল। সেই সকলা লেখাপড়া করিয়ে.....

—তখনে মানুষ খুব ভাল হতো।

বলরাম নিশ্বাস ফেলে।

—মানুষ এখনো ভাল আছে, আবার মানুষই হারামজাদা হয়। আমাকে তো ইস্কুলে পড়াতে, ভাল পথে নিতে কত চেষ্টা করল!

—তুমি গেলে না?

—ওই যাকে বলে তখনে জ্যাঠাদের বুদ্ধিনাশ। তখনে কংরেসের গরমেন্ট, বোসচৌধুরীর ছেলে হলো এমেলে। বলল, ওরা ফুটো পাট্টি। আমার সঙ্গে থাক, সুবিধে করে দেব। মনে করব প্রজা ছিলিস, প্রজা আছিস। তা ওনাদের হয়ে মারদাঙ্গা করেছি, নানাখানা কাজ করেছি। তবু মিলনবাবু কখনো মুখ ফেরায়নি।

—তোমার জ্যাঠার নাতিরা দেখো চাকরি করছে।

—স্ববুদ্ধিতে সৎপথে গেল! আমি পড়লাম না, তোদেরে পড়ালাম না, যাকগে, টেনে চল্।

ছেলে আর কথা বলে না। বলরাম হালদার নৌকো বায়, ছেলেদের নৌকো করে দিয়েছে। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছে, চারখানা ঘরেরই ভিত ও দেওয়াল পাকা।

চাল অবশ্য টিনের। ঘরে গরু আছে, বাসনকোসন, সাইকেল, সব আছে। এখনো বলরাম সকালে পান্তার সঙ্গে একটা ছোট কাঁঠাল গোটা খেতে পারে, হজমও করতে পারে। পঞ্চায়েতের কাছে I. R. D. P. লোনও পেয়েছে জাল বোনার জন্যে।

ব্যাপারটা ফালতু। নাইলনের জাল বোনে বসে বসে বলরাম সে লোক নয়। টাকা হাতে নিয়েই ও গরু কিনেছে।

বলরামের বড় মেয়েটি স্বামী-পরিত্যক্তা। ওই গাইবলদ তার। বাপের ভিটে ভাইরা পাবে, ও গাইবলদ নেড়েচেড়ে খাক।

রাজঘাটে পৌঁছে যায়।

বলরাম ছেলেকে বলে, তুই এখানে থাক্।

—যাও তুমি।

—নয় ঘাটের হোটেলে ভাত খেয়ে নিস। আমার কতক্ষণ যাকে কে জানে!

—ঠিক আছে, ঘুরে এসো। বুঝেশুনে কথা বলবে, যেন ফেঁসে যেও না।

—বুঝেছি।

বলরামের গায়ে ছোট ঝুলের পাঞ্জাবি, ধুতিও খাটো। চুল বাবরি এবং কাঁচাপাকা। বলরাম "গঙ্গা" পালা কীর্তন চমৎকার গায় এবং এখনো তার ডাক পড়ে। দেহটিও পেশল, ছোটখাট, চৌকো গড়ন। বলরামের শরীরের শক্তির খ্যাতি আছে। টাকার বিনিময়ে সব কাজই ও করে থাকে বলে খ্যাতি আছে।

ছইয়ের গা থেকে রবারের চটি নেয় বলরাম। পা ধুয়ে পাড়ে ওঠে, চটি পরে। ট্যাঁক দেখে নেয়। ট্যাঁকে ও সব সময়ে কিছু টাকা রাখে, ছেলে জানে।

বলরাম সাইকেল-রিকশা নেয় এবং বাজারতলা ঘুরে টাউনে ঢোকে। কৌশল না করে উপায় নেই। থানার সামনে দিয়ে গেলে কেউ না কেউ দেখবে। সার্কেলবাবু ডেঁসে মরবে, বলরাম এল, গেল, দেখা করল না কেন?

তারপর, যদি সন্দেহ করে!

গুলি করে ফেলে দেবে বলরামকে। পাপের সাক্ষী লোপ করতে এমন কাজ সে পারাহাট থানায় দুবার করে এসেছে। "সমাজবিরোধীকে মেরেছি" বললে আজকাল পার পাওয়া যায় বটে। পার যদি নাও পায়, পুলিশের তো কিছু হয় না। পারাহাট থানায় তো এক মাস্টারকে লকাপে নির্দোষে মেরেই ফেলল। পাবলিক ঘিরল, কিছু হইচাই হলো। সার্কেলবাবু সাসপেন্ হয়ে থাকল তিন মাস, তারপর রাজঘাটে বদলি হলো।

বলরাম কি করবে? পুলিশ যা বলে, তাই করে। পাপ করে, টাকা পায়। এখন চারপাশে বলরামদের মতো কত ঘরের ছেলেরা গুণ্ডাগর্দি করেই খাচ্ছে। নামোপাড়ার নাম সবাই বলে। কিন্তু এ রকম এখন সর্বত্র।

বাবুরা খাটায় ওদের, পুলিশের সঙ্গে ওদের বোঝাপড়া। মিলনবাবুরা এ রকম পার্টি করত না। এখন কংরেস করো, পার্টি করো, সর্বত্তর চাই গুণ্ডা-ঠ্যাঙাড়ে।

সার্কেলবাবু জানলে.....

কিন্তু পঁচিশ হাজার টাকা!

রিকশা ছেড়ে দেয় বলরাম। বাকি পথটা হেঁটে যেতে হবে। টাউনে অনেকদিন আসা হয়নি বটে। বাড়ির পর বাড়ি উঠেছে। এককালে বড় বড় আমবাগান, মাঠ, দীঘি, কত কি ছিল।

সেনবাবু একাই কত বাড়ি তুলছে আর বেচছে। টাকার গদীর ওপর বসে আছে।

মিলনবাবু প্রেসে বসেছিল।

—বলরাম হালদার না?

—প্রণাম হই বাবু।

—আরে আরে, প্রণাম করার কি হলো? তারপর, আমার কাছে সহসা? এতকাল বাদে?

—তা বলতে পারেন। চড় মারতে পারেন। কিন্তু একটা জরুরি কথা ছিল। খুব জরুরি।

—বলেই ফেলো।

—এখানে বলা যাবে না।

—খুব জরুরি?

—খুব জরুরি। নইলে ছুটে আসি?

—বেশ! বাড়ি যাব আমি, চলো আগেই যাই। অ দীনেশ! আমি একটু আগে উঠছি আজ।

—হ্যাঁ, কাকা।

মিলনবাবু উঠে পড়ে। বলরাম বলে, বাবুর দেহটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে?

—না, ভালই আছি।

—বাসা করেছেন?

—চলোই না।

মিলনবাবু যে বাড়িতে ঢোকে, তা দেখে বলরাম অবাক হয়ে যায়।

—শান্তবাবুর বাড়ি না?

—ছিল বটে।

—ওঃ, ভাগজোখ হয়ে একেবারে.....

বনানী নেমে আসে।

—কাকাবাবু, তাড়াতাড়ি এলেন?

—কাজ আছে মা।

—রান্না তো হয়নি।

—পরে খাব এখন। এ কি বলবে বলে এসেছে, কি নাকি দরকারী কথা!

—আচ্ছা।

বনানী উঠে যায়।

বলরাম বলে, কেউ আসবে না তো?

—না, কেউ আসবে না।

বলরাম কাগজটা বের করে, ছবিটা দেখায়।

—এই ব্যাপারে এসেছি।

—বটে! কি বলবে?

বলরাম মাটির দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। শীর্ণ, পাকানো চেহারার এই বয়স্ক লোকটির সামনে এলে চিরকালই সে বড় বিবশ হয়ে পড়ে।

নিশ্বাস ফেলে জোরে।

—সব সাচাই কথা বলব বাবু। আপনি পরামশ্য দেবেন, যা বলবেন, করব।

—যা শোনা যাচ্ছে তবে তা সত্যি?

—কি শোনা যাচ্ছে বাবু?

—চাঁপাইবেড় বাঁকে লাশ উঠেছিল?

—তাহলে কথা রটেছে। আসলে আমি দেরি করে ফিরলেই লোকে মনে করে পুলিশের হয়ে...যাক গে, যা হয়েছিল তা আমি বলছি।

নবমীর রাত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দশানিতে কাটিয়ে বলরাম ভোরে ফিরছিল। চাঁপাইবেড় বাঁকে নদী সত্যি বাঁক নিয়েছে। বাঁকের পাড় ধরে অশ্বত্থ গাছটির অবস্থা পড়ো-পড়ো। গাছ হেলে পড়েছে। শিকড়বাকড় নদীগর্ভে।

সেখানে ও চুল ভাসতে দেখে ও বৈঠার ঠেলায় বোঝে এ মেয়েছেলের লাশ। তারপর ও লাশ ঠেলে নদীতে ভাসাবে বলেই বৈঠায় ঠেলে। কিন্তু দামী কাপড় ভেসে ওঠে খানিক। ও লাশ তোলে।

জলে কোমর ডুবিয়ে সামান্য তুলতেই দেখে টাটকা লাশ, সুন্দরী মেয়েছেলে। ঘাড় টেলে গিয়েছিল।

—জখম ছিল না?

—অত দেখিনি।

—তারপর?

—এনার লাশ বাবু!

—তারপর?

বলরাম সার্কেলবাবুকে খবর দেবে মনস্থ করে। হ্যাঁ, বলরাম পাপী। থানার কথায় ও কিছু কাজ করেছে, টাকাও পেয়েছে।

—সে আমি জানি। বলো।

বলরাম বস্তায় কিছু ইট ভরে আনে। লাশের পায়ে বেঁধে ডুবিয়ে রাখে খোঁটা পুঁতে।

—এমন কাজ আগেও করেছ।

—বাবু! সে সব বললে...

—যাক গে, বলো।

বড় ছেলে ওর বিশ্বাসভাজন। তাকে ঘটনাটি বলে বলরাম থানায় ফিরে আসে বিকেলে। সার্কেলবাবু বাসায় ছিলেন। তাঁকে ঘটনাটি বলে। সার্কেলবাবু ওকে বলে, রাত সাতটা নাগাদ সার্কেলবাবু যাবে, লাশ দেখবে এবং বলরামকে যথাবিধি নির্দেশ দেবে।

দশমীর সন্ধ্যাতেও মেঘ ছিল, বৃষ্টিও ছিল। শনিবারে ঠাকুর ভাসান দেবে না বলে অধিকাংশ ঠাকুরই ভাসান হয়নি। চাঁপাইবেড় বাঁকের দিকটা তো অন্ধকারই। তবু সার্কেলবাবু আর সেনবাবুর ছেলে আসে রাত দশটা নাগাদ। তখন বলরাম লাশ তোলে, একা পারেনি, বড় ছেলে ছিল।

না, সেনবাবুর ছেলে দেখেনি, সার্কেলবাবু যখন টর্চের আলো মারল লাশের মুখে। সে শুধু বলল, ঝটপট করুন যা করবার!

সার্কেলবাবু বলল, যা করবার সে তো আপনিই করলেন। তা জলে ফেললেন. মনে হয়নি যে পায়ে ভারি কিছু বেঁধে দেন?

সেনবাবুর ছেলে বলল, হটচটকা রাগ উঠে গেল, ঝটকা ধাক্কা দিয়ে রগে মারতে...কে জানত মরে যাবে! ওখানে আমি কি করে কি করব? বুদ্ধিও হরে গিয়েছিল।

সার্কেলবাবু বলরামকে বলে, লাশ নৌকোয় নিয়ে মসজিদডাঙায় পুঁতে দিতে হবে। জলে ফেলা ঠিক নয়, ও ঠিক পুরন্দপুর বা শেতলার বাঁকে আটকে যায়, হাঙ্গামা হয়। মসজিদডাঙায় পুঁতে দিলে পরে.....

বলরাম বলে, জমি আর ইটভাটার দখল নিয়ে মামলা চলছে, পাশেই পুরনো কবরখানা।

—সেখানে পুঁতে দিয়েছ?

—হ্যাঁ, বাবু।

—টাকা কে দিল?

সার্কেলবাবু বলরামকে দেয়। কিন্তু সার্কেলবাবুকে সেনবাবুর ছেলেই দিয়ে থাকবে।

—তারপর?

—আজ কাগজ দেখে বাবু.....

—ওঃ, বখশিশের টাকা!

—কেন নয় বাবু?

—হ্যাঁ.....কেন নয়!

—এখন কি কত্তব্য হয় বাবু?

—আর কেউ জানে না?

—আমি আর ছেলে। আর আপনি জানলে।

—একটু ভাবি।

কিছুক্ষণ ভাবেন মিলনবাবু। তারপর বলেন, বলরাম, ভাল কাজ করেছ। কিন্তু আমি লোকজন নিয়ে যাব, তারপর লাশ তুলবে।

—কখন যাবেন ?

—ধরো, ঘণ্টা দেড়েক বড়জোর ?

—আমি টাকা পাব তো ?

—পাবে, পাবে। কিন্তু বুঝতেই পারছ যে এ নিয়ে জল গড়াবে। তখন তোমাকে সত্যি কথা বলতেই হবে। আর লাশ আমরা টাউনে আনব একদিকে, অপরদিকে তোমরা বাপ-বেটা কিছুকাল সরে থাকবে। ওখানে থাকাটা ঠিক হবে না। সার্কেলবাবু.....

—আপনারা লাশের খবর জানলেন কি করে, এ সব কথা উঠবে !

—কলকাতা তো যাও ?

—তা যাই।

—পথঘাট চেনো ?

—খুব চিনি না, তবে ঠিকানা পেলে যেতে পারব। আমার শালারা তো বেলেঘাটা থাকে।

—ওখানে যেয়ে ঠিকানা দেব। সেখানে যেতে হবে, খবর দিতে...আচ্ছা, এখন এসো।

—একটা ছাতা পাব বাবু ?

—কেন, বিষ্টি তো নেই ?

—মাথায় দিয়ে হনহনিয়ে চলে যাব। কোনোমতে থানার কেউ.....

—এসো।

ছাতা নিয়ে বলরাম চলে যায়।

মিলনবাবু বুঝতে পারে যে শরীরের ভেতর অন্য কোনো সাড়া জাগছে।

একবারও মনে হচ্ছে না, বয়স সাতষট্টি, শরীর ভাল থাকে না, "রাজনীতি" শব্দটির অধঃপতন দেখে মন বড় অবসন্ন, বড় ক্লান্ত।

তাপস সেদিন যখন ঘটনাটি বলে, তখন থেকেই তো মনে হয়েছে, "নীলা সেন" নামটি কণ্ঠার কাছে আটকে রয়েছে। বারবার মনে হয়েছে একটা কিছু করা উচিত !

কি করবেন, তাই ভেবে পাচ্ছিলেন না।

বলরাম পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল।

যাক, সময়টা খারাপ নয়। অমিয় আর রবিকে ভাবতে হচ্ছে দলের ভাবমূর্তিকে তোলা যায় কি করে। দুর্নীতির জন্য ওরা কয়েকটি অঞ্চল-প্রধানকে অপসারিত করেছে। তারপর পৌরসভার কেশবেশ্বরকেও সরাল।

অমিয়র বউ মালবিকা, মেয়েদের সংগঠন নিয়ে নারীনির্যাতন, বধূহত্যা—এসব ক্ষেত্রে অনেক দিনই ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

অমিয়র অবস্থা এখন রবির চেয়ে ভাল। রবি ছেলে ও ভাইপোকে সারের ডীলারশিপ করে দিয়েছিল। এখন সে সব কথা উঠছে। সুনন্দনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রবিরই বেশি। যে জন্য মুখ বাঁচাবার জন্য রবিকে বলতেই হচ্ছে যে, "কুশল একটি

স্কাউন্ড্রেল। যদিও তার বাবা ভদ্রলোক। তবে নীলার কিছু ক্ষতি করে থাকলে তার বিচার হবে।"

মালবিকা বলছে, ওই কচি মেয়ে ফেলে সে যাবে কোথায়? কি চেনে ও রাজঘাটের? পথেও হাঁটেনি, কারো সঙ্গে মেশেওনি। কুশল সেনের কথা স্বতন্ত্র। তার নামোপাড়ায় ঝিনুক দাশের সঙ্গে.....

কুশলকে পথেঘাটে দেখাই যাচ্ছে না। একটাই ভাল যে তাপসের নামটা ওঠেনি।

মিলনবাবু স্নান করে সকালেই। বনানীকে বলে, আমাকে ভাত নয়, সামান্য কিছু খেতে দাও তো। বেরোতে হবে।

—না খেয়ে?

—খেলে চলতে পারব না বউমা। ভেব না, শরীর আমার খুব ভাল আছে। দরজা বন্ধ করে এঁটে বসে থাকো। আমার ফিরতে দেরি হবে।

—নীলার বাবা কত টাকা পুরস্কার দেবেন বলে কাগজে দিয়েছেন, দেখেছেন?

—দেখলাম তো।

শুকনো মুড়ি, দুটি মিষ্টি ও জল খেয়ে মিলনবাবু বেরোয়, রিকশা নেয়।

অমিয়বাবু বলে, সত্যি?

—দাঁড়ান, দীপক, সুশোভন, বিপ্রকে ডাকি। এ তো সাংঘাতিক খবর।

—রবিকেও ডাকো।

—রবিকে? কেন?

—কোনো ঝামেলা না পাকাতে পারে, সেজন্য। আর "ভারত স্টুডিও" থেকে বিরামকে নিতে হবে।

—কলকাতায় একটা খবর.....

—কাগজেই তো ঠিকানা, ফোন নম্বর আছে।

—টেলিফোন অফিসে নমিতা আছে, ওই ফোন করে জানাবে।

—নমিতা! রঞ্জন মারা যেতে চাকরিটা পেল তাহলে! বেঁচে গেল।

—হ্যাঁ.....দুবছরের মাথায়.....অনেক ঝামেলার পর.....সবচে ভাল, কেষ্টনগরেই দিয়েছে।

—অমিয়, গোরাবাবুকে নাও। এর পরের কাজ ওনার। মোট কথা, খুব ওয়াটারটাইট কেস করতে হবে। আর এই হলো সময়, সার্কেলবাবুকে সরাবার। ও থাকলে রাজঘাটের ইজ্জত থাকবে না।

—আপনি ভাববেন না দাদা। দাঁড়ান, ছেলেকে ডাকি, বাপি, এই বাপি!

—কি হলো?

—জামা গায়ে দে। ভ্যানটাকে বল্ ম্যাটাডোর চাই, নিয়ে আসতে। আর এনাদের খবর দে, বলবি খুব জরুরি।

—ম্যাটাডোর চাই?

—নিশ্চয়। ভ্যানটা আনবেও। টাকা দিলে ভ্যানটা সব করবে। বাপি, দেখবি, ঝটপট আসে যেন।

বাপি বেরিয়ে যায়। বিরক্ত মালবিকা মুখ ঢোকায়।

—অসময়ে ছেলেটাকে.....মিলনদা ?

—আসতে নেই ?

—কি যে বলেন !

—অমিয় আর আমি একটা কাজে বেরোচ্ছি। ভাল কথা, তোমার ছেলে বেশ কাজের হয়েছে মনে হলো।

মালবিকা ঈষৎ হেসে বলে, লেখাপড়া, কেরিয়ারের চিন্তা। ছাত্র-রাজনীতিও করে না ওরা। দু ভাই জবাবও করে না, আবার কিছু কাজও করে না।

মিলনবাবু সদুঃখে বলে, ওটাই হয়তো ওদের প্রতিবাদ বউমা, অথবা রাজনীতির ব্যর্থতা। রাজনীতিক বাপ-মায়ের ছেলেরা অরাজনীতিক। যা হোক, মানুষ হলেই হলো।

—ক'দিন আর থাকবে কাছে ? পড়া শেষ হলেই নাকি ঢুকে যাবে কোথাও।

অমিয় বলে, তুমি বাড়িতেই থেকো। আমরা ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে ঘুরে আসব।

কার্যকালে ঘণ্টার হিসেব রাখা যায় না।

রবি সাঁতরা বলে, থানাকে জানাবই না !

অমিয় বলে, বরাট হলে জানাতাম।

—যাচ্ছি কোথায় ?

—বললাম তো জরুরি ব্যাপারে।

চাঁপাইবেড় বাঁকি থেকে বলরাম ও তার ছেলেকে তুলে নিয়ে মসজিদ্‌ডাঙা। কবে মসজিদ ছিল, কেউ দেখেনি। মসজিদ নাকি ছিল কোনোদিন, কারো বাড়িও ছিল। তবে সে একদা। দেড়শো বছরের ইতিহাস পাওয়া যায়, স্থানটির নাম নেই।

বর্তমানে এ চার বিঘা ভূখণ্ড বিতর্কিত মালিকানা কারণে মামলাধীন। ইটভাটা পরিত্যক্ত। ঝোপ-জঙ্গলে, খানাখন্দে বোঝাই। পাশেই প্রাচীন ও অধুনা অব্যবহৃত গোরস্থান। জায়গাটি সর্পোদ্যান বা স্নেক গার্ডেন নামেও পরিচিত।

কৌতূহলী এক জনতাও জমে যায়। বলরাম ও তার ছেলে লাঠি দিয়ে ডালপালা সরিয়ে একটি কাঁচা কবর খোঁড়ে।

দীপক ও বিপ্র বুদ্ধি করে পলিথিনের চাদর এনেছিল। তার ওপর দুর্গন্ধ, কাদামাখা শবটি রাখা হয়।

মিলনবাবু বলে, জল আনো বলরাম।

ওর ডোবা থেকে জল আনে।

—সাবধানে ঢেলে যাও। ফটো তোলা হবে। সবাই সরে দাঁড়াও।

জলে ধুতে ধুতে এখন বিকটদর্শন, পূতিগন্ধময় শবটি দেখা যায়। ঘাড় বেঁকে আছে। অক্ষিকোটরে মাটি। নীল জরিদার সিল্কের নিচে পায়ে আলতার দাগ। নীলা, নীলা সেন, কোনো সন্দেহ নেই।

রবি সাঁতরা এখন অন্যদের চেয়েও মনোযোগী। সে বলে, কাগজে লিখেছে, ঘাড়ে জড়ুল ছিল।

অমিয়বাবু বলে, সে সব এখন.....

—তবু বাঁশ দিয়ে গড়িয়ে একটা ছবি তোলো।

বিরাম ছবি তুলতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে স্বগতোক্তি করে চলে, বৌভাতের ছবি তো এখনো আছে দোকানে। ওঃ, যেন স্বর্গের.....আপনারা সরে যান।

ছবি তোলা হয়।

মিলনবাবু বলে, সকলে একে চিনতে পারছ তো? ভাল করে দেখো!

—হ্যাঁ, চিনেছি।

—এখন কথা হলো, টাউনে নিয়ে একে মর্গে রাখা। আর, কাগজে তো ঠিকানা আছেই। একজন ছেলে চলে যাও কেষ্টনগর, নমিতাকে দিয়ে ফোন করাও। একজন যাও কলকাতা, ফোনের ভরসা কোর না। ওর বাবা-মা এসে সনাক্ত করা খুব দরকার। তারপর পোস্টমর্টেম। তারপর দাহ। মোট কথা, থানা চেষ্টা করবে লাশ জ্বালাতে, তা হতে দেব না।

—এখানে এল কি করে?

—সেই তো কথা। এল কি করে? অমিয়! অমিয়কে সরিয়ে নিয়ে যায় মিলনবাবু।

—বলরামের স্টেটমেন্টটা লিখে নিয়ে ওকে গা-ঢাকা দিতে বলি?

—হ্যাঁ, ছাড়বেন না এখনি।

—সার্কেলবাবু ওকে পেলে মেরে দেবে।

—ওরা সরে থাকুক না কেন!

—দরকারে পাওয়া চাই ওকে।

—পাব আমরা। ও তো পুরস্কারটা চায়। আমাদের সাহায্য না পেলে তা পাবে না। ওকে বুঝতে হবে যে ও নিজেও নির্দোষ নয়। লাশ ওই লুকোয়।

—আমার মনে হচ্ছে...ওকে নিয়ে যাই, গোরাবাবুর কাছে জবানবন্দীটা লিখে দিক।

—না, এখনি ওকে পুলিশের সামনে.....

—তাহলে কর্তব্য কি?

—মাথাফাথা ঢেকে চলুক টাউনে। আপনার কাছে বসেই লিখে দিক। বিপ্র আসছে, দাঁড়ান।

বিপ্র বলে, চলুন এবার। টাউনে ধুমধাড়াক্কা তুলে দিতে হবে। কুশল যাতে না পালায়।

বলরাম হাত-পা ধুয়ে ধুতির খোঁটে মাথা-মুখ ঢেকে ভ্যানটার পাশে বসার জন্যে তৈরি হয়।

খবর চলে যায় কলকাতা, চলে যায় কেষ্টনগরে। রবি সাঁতরা বলে, কেষ্টনগরের

ডি. এস. পি. এস. পি. এঁদেরও খবর পাঠাও। রাজঘাট থানাতে এখন এই সার্কেলবাবু, কতটা বিশ্বাস করা চলে?

চাঁপাইবেড় বাঁকির মধু দাশ বলে, আমি বলে দিচ্ছি, এর মধ্যে নামোপাড়ার গ্যাং আছে। ঝিনুক, সেই জুড়ন দাশের মেয়ে, আর তার ভাইদের সঙ্গে সেনবাবুর ছেলের খুব মাখামাখি।

মধু এ কথা বলতে পারে। নামোপাড়ার সঙ্গে গ্যাং ফাইটে ঝিনুকের দাদা তিনুর দায়ের কোপে ও ডান হাতের চারটি আঙুল হারিয়েছে। মধুর ঐকান্তিক ইচ্ছে, একটা কিছু হোক। তিনুরা মায়ের ভোগে যাক।

মধুর তৃতীয় পক্ষ মধুকে টেনে নিয়ে যায় ঘটনাস্থল থেকে।

—হাতের আঙুলগুলো তো দিয়ে এসেছ। এখন মাথাটা দিতে চাও? বাবুরা এসেছে, তারা বুঝবে!

বলরাম বলে, ঘর যা মধু। বউমা ঠিকই বলছে। সকল কথায় থাকিস কেন?

—তুমি তো বলবেই। লাখ টাকা পাচ্ছ!

বলরাম হাত তোলে। এ সময়ে স্থানীয় অঞ্চলপ্রধান এসে পড়ে।

—কি ব্যাপার.....রবিবাবু, অমিয়বাবু আপনারা?

অমিয় তেতে ওঠে।

—আর ব্যাপার! আপনার এখান থেকে লাশ উঠল, এই খবর!

—গজাড় বন হয়ে আছে যে.....

—বলে গেলাম, মামলায় যা হবে হোক, জায়গাটা সাফ করান ঝটপট।

—আমি সঙ্গে যাব?

—দেখে রাখুন। টাউনের সুনন্দন সেনের বেটার বউ। আমরা কেস ওঠাব আদালতে। তখন দরকারে আপনাকে ডাকব।

—বলবেন।

অঞ্চলপ্রধান দৌলত হোসেন সর্বাবস্থায় অবিচল মানুষ এবং জমি জরিপ ব্যাপারটি ভাল জানে বলে তার একটা স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। অঞ্চলে কার কত জমি, কি তার সীমানা, দৌলত হোসেন চোখ বুজে বলতে পারে।

ভ্যানটার ম্যাটাডোরে পলিথিন মোড়কে বাঁধাছাঁদা হয়ে নীলা সেন রাজঘাটে ফেরে।

ভ্যানটি থানার সামনে থামানো হয়। সন্তর্পণে লাশ নামানো হয় থানার সামনে বড় কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে প্রথমে, তারপর থানার বারান্দায়।

বলরাম ও তার ছেলে টাউনে ঢোকার আগেই নেমে পড়েছিল। তারা তাপসের বাড়ি চলে যায়। মিলনবাবু বলে, অমিয়, সকলই তোমার দায়িত্ব এখন। এ সময়ে চালে ভুল কোর না।

সুশোভন কথা কম বলে, শক্ত ছেলে এবং পার্টির সেই অংশ ওর সঙ্গে আছে যারা নেতৃত্বের সমালোচনায় কঠোর। অমিয়র সঙ্গে আছে এরা।

সুশোভন বলে, কোনো ভুল হবে না।

বিদ্যুৎগতিতে খবর ছড়িয়ে পড়ে টাউনে। মানুষ দলে দলে আসতে থাকে। টাউনের সবচেয়ে খাজা সংবাদপত্র "সৎ সংকল্প"-এর সম্পাদক তরুণবাবু, যে টাউনে ওষুধের মস্ত পরিবেশক, রাজনীতিক মতে ঘোর কংগ্রেসী এবং টাউনে প্রাচীনতম ভলান্টারি শববাহক দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, সে এসে পড়ে ভটভটিয়া চালিয়ে।

কপালের ঘাম মুছে বলে, আমাদের সাংবাদিক সংঘের সবাই আসছে। তোমাদের খবর দেয়া উচিত ছিল।

বিপ্র বলে, এই তো এলাম। সবাই আসছে?

—হ্যাঁ, "দীপশিখা", "রাজঘাট সমাচার", "আলোলিকা".....দেখি সরো তো, স্প্রে করি। বডি কিছুটা ইয়ে থাকবে। এ হে হে, এ যে.....

সার্কেলবাবু, বড়বাবু ও মেজবাবু নেমে আসে। সার্কেলবাবুর অভ্যস্ত হাসি এবং ঠোঁটের নির্মম টিপে থাকা দেখা যায় না।

—দেখি, এটা পুলিশ ম্যাটার.....

অমিয়বাবু বলে, এখন পাবলিক ম্যাটার। পাবলিককে আসতে দিন।

গোরাবাবু এগিয়ে আসে।

—প্রসিডিওর বলে, কুশল সেনকে আনতে হবে, আর ও বাড়িতে পুলিশ পোস্টিং করতে হবে, যাতে কেউ না বেরোয়।

—বডি মর্গে পাঠাতে হবে আগে।

—না। কার বডি ঠিক হোক আগে!

—আপনারা পুলিশের কাজে বাধা দিতে পারেন না।

সুশোভন হাসে।

—তাই নাকি?

তরুণবাবু স্প্রে শেষ করে।

—পাবলিক সব পারে।

রাজঘাটের পাবলিক এখন খুব ঐক্যবদ্ধ।

৫

বলরামের জবানবন্দী লেখা শেষ হয়েছে।

বলরাম সই করে দেয়। মিলনবাবু বলে, সার্কেলবাবু থানায় আটকা এখন। চলে যাও।

—দেখবেন বাবু।

—কলকাতা যাও, যেখানে যাও, চিঠি দেবে প্রেসের ঠিকানায়। ঠিকানা জানাবে। আমি লিখলে পরে তবে আসবে।

—আমি অনেক বিপদে ফেললাম নিজেকে। সার্কেলবাবু.....দেখবেন যেন টাকাটা পাই।

—পাবে বলরাম। তুমিও পাপ করেছ। পুলিশের কথায় লাশ লুকিয়েছ। কেস হলে পরে তোমাকেও বলতে হবে।

—তারপর.....সার্কেলবাবু.....

—সাহস রাখো। অন্তত সার্কেলবাবু এবারে কিছু করতে পারবে না বলে মনে করি।

ছেলে বলে, বাড়িতে একটা খবর দেবেন।

বলরাম বলে, আমি বলেছি, তবু.....চলি বাবু। এখন আপনার হাতে জীবনমরণ.....

ওরা বেরিয়ে যায়।

বনানী বলে, কি ভয়ানক কথা কাকাবাবু ! ওদের দেখে আমার এত ভয় করছিল।

—ওরা তো ওই রকমই। তবে মা, আসল অপরাধীরা ছাড়া থাকে, এরা মরে, জেল খাটে। ওই যে বলরাম, হাতের লেখা দেখো কি চমৎকার। খুব বুদ্ধি, নবম শ্রেণী অবধি পড়ল, কিন্তু চলে গেল অন্য দিকে। আমার দুঃখই হয়।

—যাক্, এত বড় অন্যায়টার শাস্তি হোক।

—আদালতে বধূহত্যার পর হত্যাকারী কে কবে শাস্তি পায় বলো ? ওরাও উকিল দেবে। পুলিশকে টাকা খাওয়াবে। তবে মেয়েটার বাবা হলো গে ধনী লোক, মেয়ের মামাও বড় ডাক্তার.....পুলিশের ওপরমহলে কথাবার্তা বলে যদি কিছু করতে পারে।

—মেরে ফেলে কেন ? কেন ডির্ভোস করে না ?

—বউ মারে, আবার বিয়ে করে.....যাক গে ! তাপসকে আনা দরকার একবার।

—সে আবার কোন.....

—ভাবনা কোর না। তাপস দেখবে, সনাক্ত করবে। তারপর তোমরা দুজনও নয় ক'দিন কলকাতায় থাকবে !

—দেখুন.....সেদিন তো যে অবস্থা হলো ওর ! মনের অস্থিরতাও খুব !

বাবুল টাউনে এসেছিল। সেই গিয়ে সারোগীর গেস্ট হাউসে খবর দেয়।

—খবর শুনেছ দাদা ? উরি ব্বাস্.....

—কি খবর ?

—কুশল সেনের বউয়ের লাশ অমিয়বাবুরা এনেছে থানায়। বাপ্ রে, কী ভিড় ! রথদোলের মেলা যেন !

—যাঃ !

—স্বচক্ষে দেখে আসছি।

তাপস বিদ্যুৎস্পৃষ্ট।

—থানার সামনে লাশ ?

—হ্যাঁ। মেয়ের বাবা আসছে দেখতে।

তাপস ঘড়ি দেখে। কৌতূহল, ভীষণ কৌতূহল ! সে ছাড়া কেউ দেখেনি ঘাতককে সে রাতে। হত্যা ? দুর্ঘটনা ? আজও সে ভিড়ের মধ্যে থেকেই দেখে নেবে আরেক

বার।

কুশল তাকে চিনবে? চিনবে না। চিনবে কি করে? অন্ধকারে যখন তুমি ব্রিজের নিচে, তোমার মুখে তীব্র টর্চের আলো পড়ল। কে ফেলল তাকে তুমি দেখতে পাওনি।

—ওই সার্কেলবাবুটা!

—সে তোর কি করল?

—খালি নিজে খায়। ভাগ দেয় না। বড়বাবু ওর বিপক্ষে, মেজবাবু কথা বলে না। সেপাইগুলো তো বেদম খাপ্পা ওর ওপর।

—যাক গে, ওসব কথা থাক।

দিলীপ বলে, মরল কি করে?

—সেই তো মিস্‌টি এখন। সব জানা হয়নি। কাল নাগাদ জেনে যাব। ওঃ, তরুণবাবুরা ঝপাঝপ ফটো তোলাচ্ছে। শুনলাম, ওদিকে মেয়ের শাউড়ি অজ্ঞান, ননদগুলো হইচাই করছে!

—স্বামী কি করছে?

—সব জানতে সময় পেলাম!

—গায়ে গয়না আছে?

—দেখলাম না।

—হয়তো কেউ গয়নার লোভে.....

—কাল জেনে যাব, বলব।

তাপস বলে, যে যার কাজে যা, আজ গেস্ট অনেক। কাজও বেশি।

—তুমি তো চলে যাবে।

—হ্যাঁ.....মাথাটা এখনো ঘোরে.....

—চলে যেও দাদা। ম্যানেজারবাবু খানিক বুঝুক। গায়ে বাতাস দিয়ে ঘুরলে হয়!

তাপস ঘড়ি দেখে। চারটে বাজলেই উঠবে। অন্ধকারে নামোপাড়া মোড় দিয়ে ফিরবে না। এখনো নয়। যাদের জন্য ভয়, তারা তো ধরা পড়ে না কোনোদিন।

নীলার বাবা ও মামা, এবং কেষ্টনগর থেকে ডি. এস. পি. প্রায় সম-সম সময়েই আসেন। মামা ও ডি. এস. পি. কথা বলেন। এস. ডি. পি. ও. বা মহকুমা পুলিশ অফিসার দূরে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে থাকেন।

সার্কেল অফিসার আরো পেছনে। বড়বাবু ও মেজবাবুর কাছে কতটা সহযোগিতা পাবেন তা বুঝতেই পারছেন। মুখ খুলছে না সে। এস. ডি. পি. ও. সমানে "ইয়েস সার" বলে যাচ্ছেন।

নীলার বাবা বেশ শক্ত পায়েই এগিয়ে আসেন। তারপর তাকান ভাল করে।

—হাঁ.....নীলা.....আমার মেয়ে.....

তিনি টলে যান। বিপ্র ওকে চেয়ারে বসায়। নীলার মামা শক্ত মুখে এগিয়ে আসেন।

—হ্যাঁ, আমার ভাগ্নী নীলা। এক্স্-রে একটা করলে সেটা ভালই প্রমাণ হবে। ওর ডান পা আর বাঁ হাতে কমপাউন্ড ফ্র্যাকচার হয়, সেটার প্লেট আছে, মেলানো যাবে।

ডি. এস পি. বলেন, সব করা হবে।

কুশলকে প্রায় টানতে টানতে আনা হয়। পাবলিক ছি-ছি করতে থাকে। কুশলকে টানছে দুই সেপাই। কুশলের চেহারা বিধ্বস্ত।

এস. ডি. পি. ও. বলেন, দেখুন ভাল করে।

—কেন আপনারা আমায় টানাটানি করছেন?

—ওয়াইফ মিসিং ফ্রম নবমী নাইট বলেছিলেন, এখন দেখুন!

—এ...এ....নীলা।

সুনন্দন সেন মাথা নিচু করে আসেন।

—বউমা, নীলা!

ডি.এস.পি. বলেন এস.ডি.পি.ও.কে, কেসটা খুব স্পেশাল। আই.জি. স্পেশাল ইনটারেস্ট নিচ্ছেন, ডি.জি.ও.—বুঝলেন কিছু?

—ইয়েস সার।

—এখন নাম্বার ওয়ান, লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠান। বরফে রাখবেন।

—ইয়েস সার।

—আজই এক্স-রে, পি এস হবে। কড়া পাহারা থাকবে। মিস্টার দত্তকে বডি দেবেন কালকে।

নীলার মামা এগিয়ে আসেন।

—এখনি যদি নিয়ে যাই, কলকাতায় সব করাতে পারব।

—সেটা....অ্যাজ পার রুল্স...

—এটুকু করে দিন।

ডি.জি.র নির্দেশ, ডু এভারিথিং তো হাতে আছে! অতএব ডি.এস.পি. বলেন, নেবেন কিসে?

—অ্যামবুলেন্স এনেছি। আর কেসটা আমরা সরাসরি হাইকোর্টে নিয়ে যাব। ডিস্ট্রিক্টে....জাস্টিস হবে না।

—কেস পুলিশ করবে! ওনলি ওয়ে টু সিকিওর সাম্ জাস্টিস।

—ওদের ভিজিলেন্সে রাখুন।

—হ্যাঁ....সে আমরা রাখি।

অমিয় বলে, এঁদের স্টেটমেন্টগুলো নিন।

—নেবে, থানা নেবে।

নীলার বাবা বলেন, আপনাদের কাছে আমার....নইলে নীলার কোনো খোঁজই পেতাম না। আর....হ্যাঁ....ওই পুরস্কারটা.....

—সব মিলনবাবু জানে।

—তিনি কি আছেন?

মিলনবাবু এগিয়ে আসে।

—আমি। সব ডিটেইল্স বলব। বক্তব্যের স্বপক্ষে সই করা স্টেটমেণ্ট দেব।

—অ্যাক্সিডেণ্টাল ডেথ হয়তো....

—সে তো পোস্টমর্টেম বলবে।

নীলার বাবাকে দেখে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। এগিয়ে গিয়ে বললে. দিতে পারবেন পুরস্কার। পরেও দিতে পারবেন। এখনকার ঝামেলা কাটুক।

ডি.এস.পি. বলেন, প্লীজ মিস্টার দত্ত, একটু শুনন। পি.এম. এখানে না হলে.....

—ওর মামাকে বলুন। আমি ভাবতে পারছি না।

—আর....প্লীজ ভেতরে চলুন। আপনাদের অভিযোগ রেকর্ড করবেন। তা ছাড়াও স্টেটমেণ্টস....

স্টেটমেণ্ট দেবার সময়ে মিলনববু বলে, কুকুর কবর খুঁড়ছিল দেখে কেউ এগিয়ে যায়। সেই দেখে লাশটি। কে, তা এখন বলা যাবে না। এদিকে তার কাছে অন্য খবর আছে, যা সে যথাসময়ে লিখিতভাবে দেবে। স্বভাবতই এ টাউনের গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকরা নারী-নির্যাতন, নারীহত্যা বিষয়ে খুব সচেতন। তাঁদের কাছেই যায় মিলনবাবু। তারপর যা হলো, সবই তো জানা।

মিলনবাবু বলে, নীলা সেনকে পাওয়া যাচ্ছে না তা ডায়েরি করেছিল তার স্বামী। রাজঘাট থানার এস.ডি.পি.ও. বা সার্কেল অফিসার সে বিষয়ে কোনো খোঁজই করেনি এ ক'দিনে।

তরুণ বলে, সাংবাদিক হিসেবে জিগ্যেস করেছি। সার্কেল অফিসারের জবাব খুব উদ্ধত।

—কি ঔদ্ধত্য করেছি?

—বলেছেন, সুন্দরী মেয়েছেলে, ভেগে যেতেই পারে। এটা কি সভ্য জবাব হলো? দেখুন, আপনারা চাকরি করতে আসেন। টাউনটা আমাদের। নামোপাড়া একটা পাপের বাসা। একটাও রেইড করেছেন? চুল্লু, সাট্টা, ডাকাতি—কি করে তুলেছেন পরিবেশ!

—নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তবে তো.....

—দূর মশাই, ঝিনুক দাশ আর তার ভাইদের নামে অভিযোগ আমিই করে গেছি। তিনবার ধরা হলো ভাইদের, আপনারা কেস প্রমাণ করেন না, বেরিয়ে আসে!

ডি.এস.পি.ও.-কে বলে, রাজঘাটে ল অ্যান্ড অর্ডার পরিস্থিতি এ রকম ছিল না। গত দেড় বছরে.....

—দেখছি, দেখছি।

এস.ডি.পি. ও.-কে আবার বলেন, এদিকের এন্ডটা আপনি দেখবেন, অ্যান্ড থানার কোঅপারেশনে। উই আর ফর সার্ভিং দি সিটিজেন্স।

স্টেটমেণ্ট নেওয়া হতে থাকে। কুশল স্থির ও অনড় বসে থাকে। সুনন্দন সেন বিধ্বস্ত, মাথা নিচু। তাঁকে এমন নীরব কেউ দেখেনি।

ডি.এস.পি. বলেন, নবমীর রাতে থানায় আপনারা কে কে ছিলেন?

বড়বাবু সালুট করেন।

—আমি আর সি.ও.।

—আপনি কুশল সেনের ডায়েরি লেখেন?

—না সার। কুশলবাবু সি.ও.-কেই চাইলেন। সি.ও. আমাকে বললেন, আপনি টাউনে একটু রাউণ্ড দিয়ে আসুন। ওঁরাই ছিলেন।

—খুলুন তো খাতাটা।....ও, "আমার স্ত্রী নীলা সেন স্বইচ্ছায় চলে গেছে.....গাড়ি থেকে নেমে......বাজারতলার কাছে..... !" বাজারতলা!

সি.ও. বলেন, হ্যাঁ সার, উনি তাই বললেন!

—আর পাঁচদিনে আপনি ওঁকে খোঁজার কি চেষ্টা করেছেন? কলকাতায় তো মিস্টার সেন গিয়েছিলেন। আর....বাকি পাতা ব্ল্যাংক কেন? লকাপে ক'জন আছে?

—তিনজন।

বড়বাবু, দু'জন।

—কবে থেকে?

—জাস্ট আজ....

বড়বাবু, চার দিন.....

—কোনো এণ্ট্রি নেই? আপনি জানেন না, চব্বিশ ঘণ্টায় কেস কোর্টে তুলতে হয়?

তরুণ ওঁকে জেলার সংবাদপত্রগুলির একটি ফাইল দেয়।

—রাজঘাট সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে সার। কয়েকটা কেস আছে। লকাপে সাত দিন থাকলেও নাম ওঠে না, কোর্টেও যায় না আসামী। তিনটে কেস আছে, নাম না তুলেই খালাস পেয়ে গেছে।

ডি. এস. পি. সার্কেল অফিসারের দিকে তাকান।

পিছন থেকে কেউ বলে, টাকার রফা না হলে সার্কেলবাবু খাতায় নাম তুলবে?

—সুনন্দন সেন আর কুশল সেনের বাড়িতে ভিজিলেন্স রাখুন রাউন্ড দি ক্লক। অবিশ্বাস্য!

বড়বাবু ঈষৎ করুণায় এই ডি.এস.পির দিকে তাকায়।

অবিশ্বাস্য নয়, এটাই বিশ্বাস্য। এ ভাবেই চলে পুলিশের কাজ। কিছু ব্যতিক্রম আছে যদিও।

সি.ও.-র দিকেও তাকায়। দিয়ে থুয়ে খাও না, তাই এখন মায়ের ভোগে যাচ্ছ। বড়বাবু, মেজবাবু, কনস্টেবল সকলকে দেবে, শান্তিতে কাজ করে যাবে।

এখন বোঝো। মেয়ের পার্টি তো বড় বড় মাথাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এসেছে।

লেখালেখি হয়ে যায়।

নিয়ম এধার-ওধার করে নীলা সেন রাজঘাট থেকে দ্রুত বিদায় নেয়। এটাই তার শেষ যাত্রা।

তাপস থাকে নীরব দর্শক।

ওই অ্যামবুলেন্‌সে যায় বড়বাবু, এবং সিটিজেনদের তরফে বিপ্র।

ডি. এস. পি. যাবার সময়ে সি. ও. কে বলে যান, ফার্দার অর্ডার না পাওয়া অবধি রাজঘাটের বাইরে যাবেন না।

এস.ডি.পি.ও.-কে বলেন, নামোপাড়ায় কুশল যায়। কোথায় যায়, রেইড ও অ্যারেস্ট করুন। আরে মশাই, সব রকম চেষ্টা চালান....মেয়ের মামা বসের মেয়ের ব্রেস্ট ক্যানসার অপারেশন করেছেন, মেয়ে সাত বছর দিব্যি বেঁচে আছে। বিগ ম্যান ! কাজ দেখান, প্রোমোশন হয়ে যাবে।

—ইয়েস সার।

—ভেরি ভেরি ব্যাড কেস।

ডি.এস.পি. চলে যান।

রিপোর্ট জেনে বিপ্র পরদিন ফেরে।

—এটা তো মার্ডার। কারাটে চপে ভার্টিব্রা ভেঙে দিয়েছে। তারপর জলে ফেলেছে। ওঃ, মেয়ের মা যা করছেন ! সে চোখে দেখা যায় না। মামাই দেখলাম বস্। আর বাবা-মাকে বলে যাচ্ছে, গুরুদেবের ছবি ভেঙে ফেলো, ড্যাস্টবিনে ফেলো। তাঁর কথায়....

—বড়বাবু কোথায় ?

—থানায়। এদিকের খবর কি ?

সুশোভন বলে, প্রথম চাল মিলনবাবুর হাতে। তবে ওরা প্রেসার রাখছে তো ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিপ্র বলে, ওরা সরাসরি ওপর থেকে চাপ দিয়ে কাজ করাচ্ছে। আজও থানায় অ্যাকশন হতে পারে, বা কাল। কুশল সেন কি করছে ?

—ভ্যানটা গিয়েছিল, ওর কি টাকা পাওনা আছে। পুলিশ তো ঢুকতে দেবে না, শেষে সঙ্গে গেল। সে এক ব্যাপার বটে ! ছেলে চেঁচাচ্ছে, সি.ও.-কে দেখে নেব। টাকা খেয়ে বেইমানি করল। বাপ আর বোনেরা চেঁচাচ্ছে, তুই চুপ কর। বাপ বলছে, আমরাও কেস লড়ব। ছেলে বলছে, আমার লাইফ তোমরা নষ্ট করলে। বলেছিলাম ঝিনুককে বউ বলে মেনে নাও।

অমিয়বাবু বলে, স্টপ টকিং। এখন আমরা একটা নাগরিক মিটিং ডাকছি। থানার সামনে মিটিং হবে। তারপর মালবিকারা মেয়েদের নিয়ে মিছিল করে আসছে।

—মিলনবাবু কোথায় ?

—ব্যস্ত আছে। বিরামের ছবিগুলো কয়েক কপি করে....., আমি যে কোথায় যাই !

সুশোভন বলে, মিটিং দেখুন। আমি মিলনবাবুর স্টেটমেণ্টগুলো জেরক্স করাব। একই সঙ্গে এক কপি এস. ডি. পি. ও-কে দেব, এক কপি এস.পি. এক কপি ডি.এস.পি. নীলার মাকে তিনটে সেট, আমরাও দুটো রাখব। এগুলো আমি দেখছি।

মিলনবাবু বলে, এই নাও।

বলরামের স্টেটমেন্ট।

কিন্তু তাপসের স্টেটমেন্ট খুব বিস্ফোরক।

—"আমি, তাপস রায়চৌধুরী, বেলেপাড়া, রাজঘাট, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এই জবানবন্দী দিচ্ছি। আমি সারোগী গেস্ট হাউসের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার। বিগত নবমী পূজায় রাত আটটা নাগাদ, জলঝড়ের মধ্যে সাইকেল হাঁটিয়ে চূর্ণী ব্রিজে উঠেছিলাম। আলো ছিল না এবং সে সময়ে কোনো লোকও ছিল না সেখানে।

ব্রিজের মুখে, বাঁ পাশে একটি মারুতি ভ্যান গাড়ি রাখা ছিল। আমি যখন ব্রিজে, তখন বাঁ পাশে নদীর পাড়ে কিছু নড়াচড়া লক্ষ্য করি। কিছু না ভেবেই টর্চ জ্বালি।

টর্চটি বড় এবং জোরালো আলো। আলো পড়ে কুশল সেনের মুখে। তিনি পাঁজাকোলা করে ধরেছিলেন এক মহিলাকে। মহিলার মুখ আমি দেখি, ঘাড় লটকে পিছনে খুব হেলানো এবং চিনতে পারি, ইনি কুশল সেনের স্ত্রী।

এর পরেই আমি ভয় পাই। কুশল সেন নামোপাড়ায় যান বলে শুনেছি। তাঁর কথায় নামোপাড়ার কিছু দুস্কৃতী অন্তত একবার সনৎ বারিককে খুব মেরেছিল। আমি টর্চ নিভিয়ে সাইকেলে চেপে কোনোমতে ব্রিজ পেরিয়ে পাশে ফরেস্টের সীমানায় ঢুকে যাই। তারপর অনেক রাতে বাড়ি ফিরি।

আমি কয়েকটি ফটো দেখলাম। এই ফটো যে মহিলার, তাঁকেই আমি সে রাতে দেখেছিলাম। ওই নীল কাপড়ই দেখেছিলাম।

স্বাঃ তাপস রায়চৌধুরী।"

সুশোভন গম্ভীর।

—কুশলই খুন করেছে।

মিলনবাবু বলে, দুয়ে দুয়ে যোগ করো। বলরামের জবানবন্দী দেখলে। দশমীর রাতে তার কাছে কুশল আর সি. ও. যায়। কুশল মারফৎ সি. ও. তাকে টাকা দেয়।

—বলরামও তো জড়িত।

—নিশ্চয়। কিন্তু সে এগিয়ে না এলে লাশ উদ্ধার হতো কি? পুরস্কার পাবার লোভেই এ ঝুঁকি নিয়েছে। পুরস্কার তার পাওয়াও উচিত।

—এটা আর দেরি করা চলে না।

—না, একদম দেরি নয়। কুশল আর সি. ও.-কে ফাঁসাবার জন্য এ দুটো ডকুমেন্ট, ওদের সাক্ষ্য, খুব দরকার।

—তাপস কি নিরাপদ এখানে?

—এখনকার মতো ওরাও সরে যেতে পারে।

—এগুলো কেষ্টনগর ও কলকাতায় আমিই পৌছাব। জেরকস করিয়ে আনি। তাপসদা....

—বলো ভাই।

—এই দিন সাতেক.... এরা ধরা পড়ুক।

মিলনবাবু বলে, ঝিনুক হেন-তেন, বিমলা অনেক জানবে। তার জবানবন্দীও দরকার।

আজ সুশোভন ফিরবে।

একটি থমথমে দিন। কাটতে চায় না।

এগারটা নাগাদ ঘড়ির কাঁটা চলতে শুরু করে। কেননা থানার সামনে জমতে থাকে মানুষ। মিলনবাবু বলে, তোমরাও চল। সুশোভন কলকাতা যাচ্ছে. ওদের দেবে সব। বাকি অ্যাকশান ওরাই করুক। ওদের ক্ষমতা আছে।

—আমার কি সরে যাওয়া খুব দরকার?

—যতক্ষণ সি. ও. আর কুশল ছাড়া থাকে....

বারোটা নাগাদ রাজঘাট মিটিং নগরী. মিছিল নগরী হয়ে যায়।

মালবিকারা "নীলা সেনের মৃত্যুর তদন্ত চাই! অপরাধীর শাস্তি চাই। পুলিশ ও বধূহত্যাকারী চক্রের আঁতাত বন্ধ হোক!" স্লোগান দিতে দিতে এগোয়।

থানার বারান্দায় সি. ও. দাঁড়িয়ে থাকে।

—বন্ধুগণ! আমরা এখানে মিটিং হয়ে গেলে থানায় মেমোরেন্ডাম দেব। তারপর যাব কুশল সেনের বাড়ি ধিক্কার জানাতে।

জনতার জয়োল্লাস, জনতার জয়োল্লাস!

সি.ও. দাঁত চিবিয়ে বলে, মার্ডারের প্রমাণ কোথায়?

কিন্তু এই সময়ে সাইরেন, সাইরেন, সাইরেন...

মিটিং বিশৃঙ্খল হয়ে যায়।

আসে পেছনে গাড়ি নিয়ে এস. পি., ঢোকে থানার সামনে। ইউনিফর্মে স্মার্ট, ভদ্রতায় নতশির এস. পি. বলেন, অমিয়বাবু, আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহযোগিতার জন্য। আপনারা কাজ করেছেন। এবং আমাদের কাজ করতে দিন।

—কাগজগুলো পেয়েছেন?

—এভরিথিং।

আর্মড ফোর্স নিয়ে এস.পি. উঠে আসেন থানার বারান্দায়।

—গীতেন্দ্র সমাদ্দার! আপনাকে সাসপেন্ড করছি, এবং আপনি হেডকোয়ার্টার্সে যাচ্ছেন, সাবজেক্ট টু ইওর কনাইভেন্স ইন দি সাসপেকটেড মার্ডার অফ....নীলা সেন অ্যান্ড সাবসিকোয়েন্ট কনসিলমেন্ট অফ হার বডি।

সি.ও. চেঁচিয়ে ওঠে, বলরাম! তোকে আমি...

—কুইক। বড়বাবু, গো অ্যান্ড অ্যারেস্ট· কুশল সেন অ্যান্ড হিজ ফাদার।

সী দ্যাট....আই রিপিট, সী দ্যাট....দে গেট নো বেইল ! ননবেইলেব্‌ল অফেন্‌স !

রাজঘাটের নাগরিকরা এত উল্লসিত কখনো হয়নি।

কুশল ও সুনন্দন রাজপথ দিয়ে হাতকড়া পরে হেঁটে আসছে।

জনতা ফেটে পড়ে।

—মার শালাকে...

—জ্বালিয়ে দে অফিস....

—শালা বউ খুন করে....

এস.পি. হাত তোলেন।

—অর্ডার, অর্ডার ! এস.ডি.পি. ও. অন্য সোর্সে খবর আছে, নামোপাড়ার এই পরিবারকে অ্যারেস্ট করবেন। প্রত্যেককে ননবেইলেব্‌ল অফেন্‌স দেবেন।

কুশল সি.ও.-র সামনে দাঁড়ায়।

ওর চোখ হিংস্র, ভয়ানক।

—সমাদ্দার ! শালা লাখ টাকা খেয়ে এই তোমার সার্ভিস ? বললে সব ঠিক হয়ে যাবে ?

এস.পি. চাপা গলায় বলেন, দ্যাট প্রুভ্‌স ইট !

সার সার গাড়ি বেরিয়ে যায়।

সুশোভন বলে, যাক, একটা অধ্যায় শেষ।

মিলনবাবু হাসে।

—শেষ নয়, শুরু। এখন আমাদের খুব সজাগ থাকতে হবে, নাগরিক ঐক্য বজায় রাখতে হবে।

তাপস আস্তে বলে, আমি যাব না কাকু। আমিও তো একজন নাগরিক।

—ভয় করবে না ?

—না। আপনি তো ভয় পাননি।

তরুণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে আসে।

—কুশলকে কি কি কেস দিল ? অত ইংরিজি আমি বুঝি না।

সুশোভন ঈষৎ হাসে।

—বউকে নিরুদ্দেশ করে দেয়া, তারপর খুন করা, তারপর লাশ গায়েব....চলুন, বুঝিয়ে দেব।

পেনশানার

সকাল থেকে এক পেয়ালা চায়ের সঙ্গে দুটি থিন এরোরুট বিস্কুটের জন্যে বড় উপবাসী ছিলেন রজনীবাবু। কিন্তু আজ রুমার খুব বেশি তাড়া। তাড়াতাড়ি কলকাতা যেতে হবে, ট্রেন ধরবে। তাই মানী চা নিয়ে এল।

—তুই আনলি, বউমা কোথায়?

—তার মিটিন্ আছে, বেরিয়ে গেল।

—ও, তাই বলে গেল না!

—টাইন পায়নি নিশ্চয়। এই নিন চা।

—শুধু চা দিলি?

—কাল বারবার পেট নামাচ্ছিল, তাতেই বিস্কুট দিতে মানা করেছে।

—বারবার কোথায়....মাত্র তো দু'বার....

—এখন চা, দশটায় এগ্ কাপ বাল্লিক, আর বারোটায় কাঁচকলা পেঁপের ঝোল আর ভাত। বলে গেল, চাইলেও বেশি ভাত দিবি না। পড়ে থাকলে তো আমাকেই দেখতে হবে। যার মামা সে দিব্যি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে কলকাতা কেটে পড়েছে। আমি আর পারি?

মানীর হাসিটি বেশ বাঁকা, আর রজনীবাবুকে দু'কথা শুনিয়ে ও বেশ আনন্দ পায়।

কেন পায় কে জানে!

রুমার বাবা মরে যেতে রুমা যখন কেঁদেকেটে মায়ের বাড়ি দৌড়ল, মানীই বলেছিল, ঢং দেখে মরে যাই! শয্যাগত পড়ে আছে পাঁচ বছর, মরলে মা বাঁচে, এমন তো সব সময়ে বলত!

মানী বোধহয় নিজেকে সত্যভাষণের অধিকারী বলে ঠাউরে নিয়েছে।

রজনীবাবু চা খান। উপায় কি? সারা জীবন মূর্খতা করে এসেছেন। এখন তার দাম দিতে হবে না?

রজনীবাবু আস্তে আস্তে ওঠেন। রুমা নেই, তাপস তো থাকেই না। এ বাড়িটা যে রজনীবাবুর যোগাড় করা, তাও রুমারা ভুলে গেছে। আজকের দিনে ভক্তিনগরে এমন জায়গায় বাড়ি কেনার কথা একদা ভাবা যেত, আজ ভাবা যায় না।

তখন এ বাড়ি সাত হাজার টাকায় পেয়েছিলেন।

স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই দাদারা দেশের ঘরবাড়ি বেচে এ-পারে চলে আসেন।

মা তখনও জীবিত। সম্পত্তি তাঁরই। এ টাকা রজনীবাবুর জন্যে তিনিই সরিয়ে রাখেন।

দাদারা বলেছিল, রজনীর জন্যে টাকা? সে কি করবে? সব বিলিয়ে দেবে।

মা বলেছিলেন, তারই তো দরকার।

—খাদির জামা, খাদির ধুতি, মোটা চটি, এই তো লাগে তার। বিয়েও করেনি, সংসারও নেই।

—সে জন্যই তার দরকার। সম্পত্তি আমার, আমার বাবা দিয়েছিলেন। তার কিছু থাকবে না, সব তোমরা ভোগ করবে, এ কেমন করে হয়?

দাদারা খুশি হয়নি। কিন্তু মায়ের কথার ওপর কথা বলার সাহস তাদের ছিল না।

মায়ের চেষ্টাতেই ওই টাকা রজনীবাবুর নামে থাকে। আর কৃষ্ণনগরের উকিল, মায়ের দূর-সম্পর্কের মামাত দাদা মাকে বুদ্ধি দেন, জবা, এ ছেলের বিষয়বুদ্ধি নেই। এখন ভক্তিনগর বড় হবে, কৃষ্ণনগরের কাছে এমন টাউনের সুযোগসুবিধা। রজনীকে তুমি এই বাড়ি কিনে দাও। এখানে প্রাইমারিতে মাস্টারি করছে, নিজ বাড়িতে থাকুক।

সে ভাবেই এই চার কামরা, বাইরে দালান, পিছনে রান্নার দালান, রান্নাঘর এবং টিউবওয়েল সম্বলিত বাড়িটি কেনা হয়।

মা কাছে থাকতেন।

আর থাকত অকালে বিধবা পিসতুত বোন হারাণী তার দুই ছেলে তরুণ আর তাপসকে নিয়ে।

আগেও মার কাছে থাকত, পরেও মার কাছে।

মাকে অন্য ছেলেরা নিতে চাইত। মা যাননি।

—ওকেই কাছে পাইনি। স্কুলে পড়তে পড়তেই রাজনীতি করতে গেল। কলেজে একটা পাশ দিতেই বিয়াল্লিশে জেলে গেল। কতকাল বাদে পেলাম, ওর কাছেই থাকি। তা ছাড়া তোমাদেরও তো স্থানাভাব।

—সে কি মা!

—তোমার জন্য সব, তোমার জায়গা নেই?

মায়ের জন্য যে সব, তাতে সন্দেহ কি! দাদারা তো অনেক টাকাই পায়। তারা কলকাতার থেকে সেদিন দূরে, আজকে কাছে, যে সব জমি কিনেছিল, বাড়ি কিনেছিল মুসলমানদের, সে সব এলাকা এখন কলকাতায় ঢুকে গেছে। তিন দাদা কলকাতাতেই চাকরি করত দেশভাগেরও আগে থেকেই।

মা বলেছিলেন, আমি তো একা নয়। হারাণী আর তার ছেলেদের জায়গা হবে?

দাদারা চুপ করে যায়।

—ওকে নিয়ে থাকতে পারি যার কাছে, তার কাছেই আছি।

—তোমার টাকাও রজনী পাবে?

—কি টাকা রেখে যাব ভাবছ? ওর সুদেই সংসার চলে। পাঁচটা প্রাণী খায়।

—মূর্খ, মূর্খ তোমার ছোট ছেলে।

—সে কি। সে মূর্খ, তোমরা বিদ্বান?

—মূর্খ না হলে প্রাইমারি মাস্টার হয়?

—বি. এ. পরীক্ষা দেবে, বড় স্কুলেই পড়াবে।

—মাস্টারি করে ক'পয়সা পাবে?

হ্যাঁ, মূর্খ রজনীবাবু।

তাঁর তিন হাজার, যা মায়ের দেওয়া আর মায়ের নিজস্ব দশ হাজার, সবই ব্যাঙ্কে জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্ট ছিল।

মূর্খ না হলে মায়ের মৃত্যুর পর তা থেকে হারাণীকে চিকিৎসা করান যক্ষ্মা হাসপাতালে?

মূর্খ না হলে তরুণ আর তাপসকে পড়ান হারানীর মৃত্যুর পর?

মূর্খ না হলে স্বাধীনতাসংগ্রামীর নাম লিখে নিচ্ছিল যখন, তখন পেনশান নিতে অস্বীকার করেন?

ততদিনে রজনীবাবু ভক্তিনগর বি. কে. এস. হাইস্কুলের মাস্টার হয়েছেন। সবাই তো অবাক হতো।

—শিক্ষকতা করেন কেন?

—শিক্ষক জাতি গঠন করে। একেকটা বিদ্যালয় দেশের জন্য ছেলেমেয়েদের গঠন করে দেয়। শিক্ষক চলে আদর্শ নিয়ে।

সবাই বলত, মানে সহকর্মীরা, আপনাকে নিয়ে আমাদের গর্ব কত যে, হ্যাঁ, একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামীও আছেন, এই বিজয়কৃষ্ণ স্কুলের গর্ব তিনি।

—আমরা সংগ্রাম করলাম বলে না স্বাধীনতা এল?

—সেও সত্যি। কিন্তু পেনশানটা তো বেতনের চেয়ে বেশি হতো।

—দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি, আমার একটা আদর্শবাদ আছে। সে জন্য পেনশান নেব কেন?

ঈষৎ হেসে প্রধান শিক্ষক বলেছিলেন, রজনীবাবু, যে স্বাধীনতার জন্য আপনারা লড়েছিলেন, এটা কি সেই স্বাধীনতা?

—না। উপবাস থেকে, অশিক্ষা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হতে হবে। দেখবেন, হবে ধীরে ধীরে।

মূর্খ, মূর্খ রজনীবাবু!

তরুণ বলেছিল, আমার কোনো আদর্শবাদ নেই মা। ইনসিওরেন্সে কাজ পেয়েছি, চলে যাচ্ছি। ছোটবেলা থেকে আপনার কথা শুনেছি, আপনার নেকড়া জামা-কাপড় কেচেছি, মা মাছ ছোঁবে না বলে নিরিমিষ খেয়েছি, আমি এই ভক্তিনগরে টিকে থাকব না।

—দূরে চলে যাবি?

—এমন চাকরিতে লাথি মারব, তেমন মূর্খ আমি নই। দূর কোথায়? বোম্বাই কি দূর হলো?

—এখানে তোর মা...আমার মা....

—স্মৃতি ধরে পড়ে থাকব কেন?

—কলেজে চাকরি তোর হয়ে যেত, কেষ্টনগরেই হতো।

—শিক্ষকতা আমি করব না মামা।

—তরুণ, তুই আমাকে মূর্খ মনে করিস?

—তোমাকে আমি বিচার করতে পারি? তবে...স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশান নিলে না...

রজনীবাবু বুঝেছিলেন, হারাণীর ছেলে তাঁকে মূর্খই মনে করে। সদুঃখে ঈষৎ হেসে বলেছিলেন, তোর মাকে, তোদের যা খাইয়েছি নিজে খেয়েছি। বিলাসিতা করতে দিইনি....

—মামা, আমি অকৃতজ্ঞ নই। তুমি না থাকলে আমরা ভেসে যেতাম। তা কি জানি না? অনেক, অনেক কষ্ট করেছ তুমি আমাদের জন্যে!

—এ কথা সত্যি যে এম.এ. পড়ার খরচ দিতে পারিনি। সেটা টিউশানি করেই করেছিস।

—অনেক কষ্ট করেছ। আমি, আমিও চাকরি করে তোমাকে দেখব মামা।

—এ বাড়িও তোদেরই। এই মনটা বেঁচে থাকুক। কোথায় কাজ পেলি?

—বোম্বেতে প্রথমটা, তারপর যেখানে দেয়।

—টাকা তো লাগবে, জামা-কাপড়—সবই লাগবে।

মূর্খ রজনীবাবু ব্যাঙ্কের অবশিষ্ট চার হাজার থেকে চারশো টাকা তুলে তরুণকে দেন।

তাপস ঠিকে-ঝি সদার মাকে বলেছিল, দাদা মামাকে ভোগা দিয়ে টাকাটা বের করে নিল। কাজটা করে দিচ্ছে কুণ্ডুবাবু, তার মেয়েকে বিয়ে করছে দাদা। বিয়ে করে তবে তো যাচ্ছে। কালো মেয়ে....কলকাতায় প্রেম হয়েছে....বাপের আদুরে মেয়ে, চুপেচাপে রেজেস্টারি করে এসেছে। কুণ্ডুবাবুর বাড়ি ভবানীপুরে। দোতলা বাড়ি, আমি দেখে এসেছি।

রজনীবাবু জানতেন না, ভক্তিনগরে আর সবাই জানত। তাঁর বড়দা সব শুনে বলেছিলেন, রজনী বোকা, বোকাই থেকে গেল। ভাগ্যে হারাণীদের বংশের কেউ খোঁজ রাখে না! নইলে বলত, তোমার দায়িত্বে ছিল, যশোরের বিশ্বাসদের ছেলে কুণ্ডুর মেয়ে বিয়ে করে কি করে?

রজনীবাবু খুব ঘা খেয়েছিলেন।

হায়! ত্যাগ তিতিক্ষার আদর্শে বড় হলো ছেলেরা। স্বাধীনতা দিবসে, গান্ধীজীর জন্মদিনে মামার সঙ্গে পতাকা হাতে তারাও গেছে উৎসবে। ছোটবেলা থেকে মহামানবদের জীবনী পড়েছে, সব কি ভুলে গেল তরুণ?

সদার মা বলল, এ জনাও থাকবে না বাবু!

—তোমরা থাকবে তো?

—তুমি থাকতে দিয়েছ, রান্নার দালানে মা-ব্যাটা পড়ে থাকি। সদা তোমার দয়াতে পড়তে পারছে।

—পড়াশোনাটাই করুক। তপশীলী সার্টিফিকেট আছে, চাকরি পেয়ে যাবে।

—অত বড় সপন দেখি না বাবু!

—যতদিন ছেলে না দাঁড়ায়, থেকো, তাহলেই যথেষ্ট হবে। আশা করতে নেই সদার মা! করতে নেই!

প্রচণ্ড, প্রচণ্ড ছিল সে আঘাত। তরুণ চলে গেল, তাঁকে বোকা বানিয়ে চলে গেল।

প্রধান শিক্ষক বলেছিলেন, তরুণকে দোষ দিয়ে কি হবে? আজকালকার ছেলেরা অন্যরকম! নইলে....আমার ছেলে...

প্রধান শিক্ষকের ছেলে কম্যুনিস্ট পার্টিতে ঢুকে গিয়েছিল। সে মিটিং মিছিল করে, স্লোগান দিয়ে বেড়ায়। পুলিশ দু'একবার তাকে ধরেছে। কি পরাধীন ভারতে, কি স্বাধীন ভারতে পুলিশের খাতায় নাম উঠলে ছেলেটির পরিবারের অবস্থা সুখবহ হয় না।

—তার তো কেরিয়ারের স্বপ্নও নেই তরুণের মতো। বিয়ে করেছিলি, বউ আর মেয়ের দায়িত্ব বাপের ঘাড়ে চাপিয়ে....

রজনীবাবু বলেছিলেন, থাক নবীনবাবু।

—ঘরে কোন অভাবটা ছিল? জমি থেকে টাকা আসে, খাওয়ার কষ্ট নেই, কিন্তু বোনগুলোর বিয়ে দিতে হবে, ভাইরা পড়ছে....কিছু ভেবে দেখল না?

প্রধান শিক্ষক দুঃখকষ্ট দেখে গেছেন, একমাত্র ছেলেকে বিপথগামী মনে করে চলে গেছেন।

দেখে যাননি, তাঁর ছেলের রাজনীতিতে যোগদান কত ফলদায়ী হয়েছে।

সে এখন বয়স্ক, প্রবীণ নেতা। অগাধ সম্পত্তি তার। কালী-মাজবাড়ি থেকে সে-ই আজও নির্বাচিত হয় বিধানসভার সদস্য হিসেবে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল কত লাখ টাকা খরচ করে। বাবার নামাঙ্কিত বাড়ি এখন বিশাল ও গর্বোদ্ধত। জামাতা ও ভগ্নীপতিকে সার ও শ্যালো বসাবার ব্যবসা করে দিয়েছে।

আর রজনীবাবু এখন নিজ বাসগৃহে পরবাসী।

তাপস কলকাতায় থাকে, সরকারী চাকরিই করে, কিন্তু ইতিমধ্যেই ভক্তিনগরে জমির পর জমি কিনেছে বেনামে।

রুমা রাণাঘাটে শিক্ষিকা। কলকাতা যায় ঘন ঘন। ইউনিয়ান করে।

এখন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে বেতনের অঙ্ক শুনে রজনীবাবুর মাথা ঘুরে যায়।

দুই ছেলেই নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ে। ছুটিতে যায় মামাবাড়ি।

ভক্তিনগরে এলে ওরা নাকি হাঁপিয়ে ওঠে।

সদা অথবা সদানন্দ ব্লক আপিসে কেরানী। ও কালী-মাজবাড়িতে বাড়ি করেছে।

সদার মা যতদিন বেঁচে ছিল, বাগানের ফলসবজি নিয়ে বাবুকে দেখে যেত।

তরুণ নাকি সল্ট লেকে বাড়ি করেছে।

রজনীবাবু উনিশশো একাশি সালের আগে অবসর নেন। ফলে অত্যল্প পেনশানের থেকে নিজের ওষুধ-তেল-সাবান-কাপড়-গামছা-চটি-চা-জলখাবারের টাকা কেটে হাতে যা থাকে সে কহতব্য নয়।

তাঁরই বাড়িতে রুমা ও তাপস থাকে। রুমা কিছুই করে না, সব কাজই মানী ও একটি ঠিকে লোক করে।

ত সত্ত্বেও রুমা সর্বদা বলে, আজ স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশানটা পেতেন, কিছু সুবিধে হতো। একজন লোকের খাইখরচও কম পড়ে কি?

নিজের বাড়িতে আজ তিনি একটি কোণার ঘরে নির্বাসিত। তাপস তাঁর কাছ থেকে ভাত-খরচটা নেয় না।

আর সব খরচাই তো তাঁর।

যদি শুয়ে থাকেন কোনো অসুখে, তবে কি হবে? রোজ ভাতের পাতে এক টুকরো মাছ দেখে বুক ফেটে চোখে জল আসে। যে মানী সর্বদা মুখ করে, সে বলে, ভাত পাতে বসে চোখে জল ফেলো না।

—না.....খাই।

—বউদিরও বলিহারি যাই। যার বাড়ি ভোগ করছ, তাকে একটু আত্তি তো করবে!

—না না, রুমা খুব খেয়াল রাখে আমার। আসলে মাছ তো খেতাম না, মায়ের দুঃখ ছিল খুব। ডাক্তার বলল বলে.....মায়ের কথা মনে পড়ে।

—শুনেছি কংরেস করতে?

—স্বদেশী দলে ছিলাম।

—জেলও খেটেছ!

—তা খেটেছি।

—তুমি বাবু বড্ড বোকা। কংরেস করে গোবর্ধনবাবু কি সম্পত্তিটা করেছে! আবার কত টাকা পেনশানও পায়। তাতেই তো বউদি বলে, কেমন দেশসেবা করেছিলেন কে জানে! বউদির কাকা জেলেও যায়নি, কিছুই করেনি। অথচ দেখ, নাম লিখিয়ে কেমন পেনশান তুলছে!

—হ্যাঁ মানী, আমি বড়ই বোকা।

এবং ভীতুও এখন।

পাঁচ বছর আগেও বলতেন, তাপস, তোমরা বাড়ি নিয়ে চলে যাও, তাতে ভাল থাকবে।

তাপস এমন বোকা নয় যে সে-কথা শুনবে!

—বাড়ি নিয়ে তো মরবে না মামা!

—নয় বুড়োদের থাকার মতো জায়গা করে যাব একটা।

—কার হাতে দেবে? যাকে ভার দেবে, সেই মেরে দেবে।

এখন আর রজনীবাবু সেসব কথা বলেন না। বয়স সত্তর, শরীর ভেঙে গেছে, ব্যাঙ্ক থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলে ছানি কাটিয়ে চশমা করাবার পরও ঝাপসা দেখেন। ওই নন্দী ডাক্তার নাকি এমন অসফল অপারেশন আগেও করেছে।

আগে মনে করতেন, দিব্যি একা থাকতে পারি।

এখন আর ভরসা পান না।

ভয় করে একাকীত্বকে। মনে হয় একা ঘরে ভয়ে সিঁটকে মরে পড়ে থাকবো।

পেনশান, পেনশানটা যদি বাড়ত ! তাহলে আগেকার টাকাগুলো পেতেন এক থোকে। কিচ্ছু ভাবতেন না রজনীবাবু। চলে যেতেন মিশনারীদের পরিচালিত বৃদ্ধাবাসে। দেখেও এসেছেন ফুলবাড়ি-মিশনের বৃদ্ধাবাস। পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, অসুখ হলে ওরা মিশনের হাসপাতালে রাখে। বাগান আছে, বৃদ্ধরা রেডিও শোনেন। এককালীন টাকা দিয়ে দিতেন। সুখ না হোক শান্তিতে আছেন।

আজ বিকেলে ভক্তিনগর শ্মশানসংলগ্ন পৌরসভার মাঠে যখন পেনশানাররা একত্র হবেন, তখন আবার তুলতে হবে কথাটা।

পৌরসভা নাকি ওখানে বিদ্যুৎচুল্লী করবে। অর্থাভাবে আর বিদ্যুৎপ্রাপ্তি ভরসার অভাবের জন্য প্রস্তাবটি পাশ হওয়া সত্ত্বেও কার্যকরী হয়নি। তা না হোক, চূর্ণী নদীর ধারে বুড়োদের বেড়াবার ওই একটা জায়গাই আছে এখনো।

যেন থাকে, রজনীবাবু জীবিত কালটায় যেন মাঠটা থাকে।

২

কালীচরণবাবু বাজার টেনে আনতে বড় কষ্টই পান। বয়স তাঁর রজনীবাবুর চেয়ে অনেক বেশি। তাঁর সমস্যা শূন্য নৈঃসঙ্গ্য নয়, তাঁর সমস্যা বাসগৃহে লোকাধিক্য।

রজনীবাবু পড়াতেন বাংলা, কালীচরণবাবু ছিলেন অঙ্ক-শিক্ষক। তিনি বহিরাগত নন। স্কুল যাঁর নামে তিনি সেই সমাদ্দার বংশেরই ছেলে। জমিদার বিজয়কৃষ্ণ সমাদ্দার স্কুলটি করে দেন। ভক্তিনগরকে তিনি চারটি প্রাথমিক স্কুল, একটি হাইস্কুল, একটি দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়, এবং একটি পাকা রাস্তা দান করে যান।

বিজয়কৃষ্ণ রায়সাহেব খেতাব পান। ইংরেজ শাসনের চিরস্থায়িত্বে আস্থা রেখেই প্রয়াগে তীর্থে গিয়ে কলেরায় মারা যান। সেই থেকে সমাদ্দার বাড়ির কেউ প্রয়াগে যেত না।

কিন্তু এখন তো মানুষ ও-সব বিশ্বাস মানে না। বিজয়কৃষ্ণের পৌত্র এলাহাবাদে সেটল করেছে। চারটি প্রাথমিক স্কুলের একটি টিকে আছে। জমিদারি অধিগ্রহণের পর দাতব্য চিকিৎসালয়ও বন্ধ। রাস্তা আছে, যার নতুন নাম মধুকিশোর আগরওয়াল রোড। নন্দকিশোর আগরওয়াল এক ধনী কণ্ট্রাক্টর। বড় সিনেমা হল, বড় ওষুধের দোকান, নার্সিংহোম, জেনারেটার ব্যবসা ইত্যাদি করে সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে আজকের ভক্তিনগরে নয়া জমানার প্রবর্তক। অতএব তার বাপের নামে রাস্তার নামকরণ হতেই পারে।

কালীচরণবাবুদের ধানজমি ইত্যাদি সরকারের কবলে। বাড়ি ভাগ ভাগ করে ছেলেরা ভাড়া দিয়েছে দোকানীদের। চার ছেলে, স্বামীপরিত্যক্তা মেয়ে, নাতি-নাতনী, চার বউ নিয়ে ছয়খানা ঘরেও আর কুলোয় না।

সস্ত্রীক কালীচরণ এককালীন চালের ঘরে জায়গা পেয়েছেন। স্ত্রী হাঁপানিতে বারোমাস ভোগেন। বড় ছেলে সিমেন্টের ডীলার। অন্য ছেলেরাও ইটভাটা, লোহার গ্রীল ইত্যাদি নানা ব্যবসায়ে আছে। ছোট ছেলে আগরওয়াল কোম্পানিতে ঢুকেছে। বড় ছেলের রোজগার বেশি। ফলে বড় বউয়ের হাতে সংসার।

বড় বউমা হলো ডিসিপ্লিনের পক্ষপাতী। রান্নার জন্য লোক আছে, কিন্তু ভাঁড়ার বের করবে কে, তরকারি কুটবে কে, চা করবে কে, বাড়ির বিদ্যুৎ মেরামতি করাবে কে, পৌর কর জমা দেবে কে—প্রতিজনের ডিউটি ভাগ করা আছে।

সেভাবে কালীচরণের ঘাড়ে পড়েছে বাজার। আজ মাছ, কাল তরকারি, রুটিন হয়ে গেছে।

তাঁর স্ত্রী অক্ষম। মাকে দেখে বিধবা মেয়ে। দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে এ সংসারের বোঝা হয়ে বসার পর তার লজ্জার সীমা নেই। বড়বউদি বলে, টাকা তো চাইছি না, গতরে খেটে সুসার করলেও অনেক হয়।

এই বিশাল সংসার, চার ছেলের চার সন্তান, মেয়ের দুটি, সকলের তো জায়গা হয় না। অত্যল্প পেনশান-প্রাপ্তিতে সদা কুণ্ঠিত থাকেন কালীচরণ।

কুণ্ঠিত থাকেন স্ত্রীর হাঁপানির জন্য। স্ত্রী শুধুই বলেন, সারাদিন হট্টগোল, রাতে ওরা সিনেমা দেখে, রেকর্ড চালায়। বড় ইচ্ছা করে তোমাকে আর খুকিকে নিয়ে নয় দেওঘরে গিয়েই থাকি। আশ্রম তো আছেই, থাকতে খেতে পয়সাও লাগে না। আর....আর....লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে হাঁপানির ওষুধ খেয়ে গোপগিরি থেকেই কত মানুষ সেরে আসছে!

মেয়েও বলে, তাই নিয়ে চল বাবা। ছেলেমেয়ে নিয়ে ওখানে পড়ে থাকব, যা হয় হবে।

কালীচরণ বলেন, যাব মা, তাই যাব। সরকার যদি পেনশানটা দিয়ে দিত, তাহলে তো কবেই চলে যেতে পারতাম। যেতে হলে চিরতরে যেতে হবে। আর ফেরা যাবে না, তা বুঝতে পারছ?

স্ত্রী চোখ বুজে বলেন, ফিরব বা কেন, ফিরব কার কাছে? আমরা থাকতেই বুনুর এই অবস্থা! আমরা না থাকলে ওর হাল কি হবে ভেবেছ?

তারপর আস্তে আস্তে বলেন, তখন সন্তাগণ্ডা ছিল, কোথাও নিয়ে যাওনি। এ সংসারে কেবলই হাঁড়ি ঠেলে গেছি। ঠাকুরের হাতেই খাব তো বউ আনা কেন, এই শুনেছি। তখনি কিছু হলো না, আজ হয়?

—থাক থাক, আশকেলে বাস্ কথার অন্ত নেই, যা হয়েছে ভুলে যাও।

স্ত্রী আস্তে বলেন, তুমি বেটাছেলে, বেরিয়ে গেলে, খানিক ঘুরে-চেরে এলে, সব কথা তো তোমার কানে যায় না। আমি আর বুনু এই বাজারে পড়ে থাকি,

নিয়ত চীৎকার-হল্লা-হইচই! তাতেই ভুলে থাকতে দেয় না।

কালীচরণ মাথায় হাত বোলান।

শব্দদূষণও তো দূষণ।

তাতে নাকি হার্টে অসুখ ধরে যায়।

বুনুর ওপর, স্ত্রীর ওপর বড্ড অবিচার করেছেন। বুনুর বর বিয়ের পাঁচ বছর বাদে যে কর্মস্থলে গিয়ে আরেকটা বিয়ে করবে, কে ভেবেছিল? বড় ছেলেকে নিয়ে খুব দৌড়োদৌড়ি করলেন কালীচরণ। বুনুর বর বলল, ও এখানে থাক, আমি ওখানে থাকি, অসুবিধে কি?

তেমন শর্তও মেনে নিয়েছিলেন কালীচরণবাবু।

হাজার হলেও বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন, মেয়ের কপালে দেখা যাচ্ছে সুখ ছিল না। চব্বিশ বছরের মেয়েকে বলেছিলেন, কপালের ওপর কথা নেই রে মা! এরা তো তাড়িয়ে দিচ্ছে না, ছেলেমেয়ের কথাও ভাব।

বুনু বলেছিল, নয় ক'দিনের জন্যেই নিয়ে চলো আমাকে।

বড় ছেলে বলেছিল, এখন নয় দিদি। তাহলে ছেলেমেয়ের দায়দায়িত্ব নেবে না এরা। হাত ধুয়ে ফেলে দেবে।

কালীচরণও বলেছিলেন, সেটাই বুদ্ধির কাজ মা। মেয়েছেলেকে ভাগ্য মেনে নিতেই হয়।

যেমন জেনে এসেছেন আজীবন, তেমন বলেছিলেন। বুনুও বাপের বাধ্য মেয়ে, ঘাড় হেলিয়ে "হ্যাঁ" বলেছিল। বুনুর শ্বশুর বলেছিলেন, ওটা কি বিয়ে হয়েছে? দুর্গাপুরে সে মেয়ে নার্স, হতকুচ্ছিত। তবে কি, বাপের ওই একটা বাড়ি পাচ্ছে, বাস পাচ্ছে দুটো। থাকবে, বড় বউমা থাকবে, ছেলেমেয়ে তো এ বংশের।

বুনু নিরুত্তরই ছিল।

কালীচরণ খুব দূরদর্শী ছিলেন না। স্থানীয় লোক, বাড়ি ও জমি আছে, স্কুলে কাজ করছেন, সে টাকার ওপর ভরসা করে বসে নেই। বুনুর মা কেঁদেছিলেন। কিন্তু মেয়েছেলের মন দেখলে তো জীবন চলে না।

কিন্তু বুনু তো ওখানে থাকতে পারল না। পিছনে লাগল এক দেওর। আর স্বামীও সাফ বলে দিল, অমন মেয়েছেলে নিয়ে থাকা চলে না। খাওয়া-পরা, কোনো অভাব রাখিনি। তবে মালদায় আমাদের সুনাম আছে। ঘরের মধ্যে কেলেঙ্কারি নিয়ে থাকতে পারব না।

—তুমি থাকো কোথায় এখানে? তুমি তো দুর্গাপুরে.....

—কে থাকবে? সেকেন্ ম্যারেজ মেনে নিয়ে তো দিব্যি ছিলে। শেষে ঘরের মধ্যে কেলেঙ্কার করলে?

শ্বশুর বলেন, এরপর আর.....

স্বামী স্বচ্ছন্দে বলে, ঝাড়সুদ্ধ বাঁশ বিদেয় করো। তারও ইয়ে হবে, জ্যোতিষ বলছে বেটাছেলেই হবে।

এ ভাবেই বুনু ফিরে আসে ভক্তিনগর।

ছেলেরা খুব খুশি হয়নি।

কালীচরণ বলেন, বাড়ি আমার. মেয়ে থাকবে।

কালীচরণ বাজার নামিয়ে দেন।

সময় থাকতে কাজ করেননি, আজ কেমন করে উইল পালটে মেয়েকে ভাগীদার করবেন ? তা ছাড়া, ভাইরা তেমন বোনকে দেখবে বা কেন. যার টাকার জোর নেই ?

এখন মেজ ছেলে তার ভগ্নীপতির ভূয়সী প্রশংসা করে। বলে, এক হাতে তালি বাজেনি। সে লোক দেখ, জাঁকিয়ে বিজনেস করছে। ছেলে ইংরিজে ইস্কুলে পড়ছে।

কালীচরণ শুনে যান।

বুনুর ছেলে ও মেয়ে যায় বটে স্কুলে, কিন্তু সংসারের বহু ফুটফরমাস খেটে।

না, পেনশান, পেনশান, পেনশানটা পেলে কালীচরণ চলে যাবেন দেওঘর। গোপগিরি যাবেন, মন্দিরে বসে থাকবেন। তাঁর বাবা ওই আশ্রম নির্মাণে সেই অতীতে জমি দেন, টাকা দেন। এখন সেখানে থাকার ব্যবস্থা তো আছে। গিয়ে পড়লে জায়গা কি হবে না ?

পেনশানটা পেলে কালীচরণ ওখানে থেকে টাকা দিয়ে বুনু আর তার ছেলেমেয়েরও কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন। বুনুর তো নিজস্ব বলতে গয়না ছাড়া কিছুই নেই।

পেনশান, বকেয়া পেনশান, পাবেন কি ?

৩

সুরঞ্জনবাবুও বকেয়া পেনশান পাবেন কি পাবেন না, সেদিকে তৃষিত চোখে চেয়ে আছেন। চিত্ত পিপাসিত রে, অবসরভাতার তরে....গুনগুন করে ভাঁজলেন।

সুরঞ্জনের স্ত্রী শিপ্রা বললেন, গান গাইছ কেন ?

—পেনশান, পেনশান, অবসরভাতা !

—হবে বলে মনে কর ?

—হতে হবে, হতেই হবে। সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি. বুঝলে ?

—কি ব্যবস্থা করলে ?

—একে একে অ্যাকশান। বুঝলে বকুর মা ?

—কখনো ভুলেও নমুর মা তো বলো না !

—দেখ নমু তোমার মেয়ে, আমার ফ্রেন্ড, ফিলসফার ও গাইড। তা ছাড়া নমু আর তোমাকে এখনো দুই বোন মনে হয়। তোমাকে নমুর মা বলব কেন ?

—আর আদিত্য, নমুর বরকে ?

—ওই তো করবে মির্‌্যাকল।

—সে জন্যেই ওদের ডেকেছ ?

—হ্যাঁ, কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে যাক না, দেখে যাক, আমরা গ্রামে কেমন পড়ে

আছি।

—ভালো কথা, নমু চেয়েছে ইলিশ খেতে।

—হয়ে যাবে। হয়ে যাবে। নমুর জন্যে আমি সব করব। কিন্তু বকুর জন্যে কদাপি নয়।

'—ওই কথা বলতে পারলে? তোমার ইংরিজির কোচিং চলত, যদি বকু না হাতে তুলে নিত?

—সে তো বটেই, সে তো বটেই।

বকু ঘরে ঢোকে। ছিপছিপে, শ্যামলা, সুন্দর স্বাস্থ্য, শুধু ডানদিকের গাল, গলার চামড়া কুঁচকে বিকৃত। ছোটবেলায় বাজির আগুনে পুড়ে এই বিকৃতি।

—যথেষ্ট বকেছ বাবা, বোস, চোখে ওষুধটা দিই।

—তোর মা দিতে পারে তো।

—পারে, কিন্তু আমিই তো দিই। বোস চেয়ারে।

—বেরোচ্ছিস?

—হ্যাঁ, উনিশ নম্বর পরীক্ষাটা দিয়ে আসি। জানি কাজ হবে না। তবু...ওই আর কি!

—কোচিং সেন্টার তো বেশ চলছে বকু।

—বাঃ, টাকা দরকার না? তোমাকে হায়দ্রাবাদে এল ভি প্রসাদ আই হসপিটালে নিয়ে যাব না?

সুরঞ্জন চুপ।

ছানি বা কেন আগে পড়ল, আর কলকাতার ডাক্তার এমন গোলমাল বা কেন করল, সবই কপাল।

সযত্নে ওষুধ দেয় বকু। বলে, মা, দুপুরে ওষুধটা দিয়ে দিও, কেমন?

বকু চলে যায়।

শিপ্রা বলেন, ভাগ্য, সবই ভাগ্য।

সুরঞ্জন ঈষৎ হাসেন।

—হ্যাঁ শিপ্রা, অপ্রাপ্তিটা দেখলে, প্রাপ্তিটা দেখলে না?

আজ রবিবার। শিপ্রাকে নার্সিংহোমে যেতে হবে না। তাই একটু বসার অবসর আছে স্বামীর কাছে।

—প্রাপ্তি আর কি, বলো?

—কি পাইনি তার হিসাব কেন মেলাব? কি পেয়েছি তা দেখ! অনেক পেয়েছি।

—কি পেলে?

—তোমাকে আর নমুকে পেলাম, এটা কম পাওনা? ছিলাম বি.কে.এস-এর ইংরিজি মাস্টার। জীবনেও ভাবিনি বিয়ে করব সংসার হবে।

—কেন, তোমার কি ছিল না?

—সেদিনের ভক্তিনগর, শিপ্রা! মা সমাদ্দারদের বাড়ি বাসন মাজত। নমঃশূদ্রের

ছেলে, কি ভাবে পড়া চালাই, জেদ ছিল এখানেই মাস্টার হয়ে ঢুকব....

—স্বচ্ছন্দে সেণ্ট্রাল গভরমেণ্টে কাজ পেতে পারতে।

—তাহলে মাকে নিয়ে হাসপাতালে বা ভর্তি করতাম কি করে, আর তোমাকে পেতাম কি করে?

—তখন তো ঝড় বয়ে গিয়েছিল।

—যাবেই। জাতের নামে বজ্জাতি তো এখনো টিকে আছে আত্মগোপন করে। কায়স্থের বিধবা....মেয়েকে নিয়ে বাঁচতে নার্সের কাজ করে....তাকে নমঃশূদ্র সুরঞ্জন দাস বিয়ে করবে, ঝড় উঠবে না?

—ছিলে রামহরি, সুরঞ্জন হলে পরে?

—কলেজে, বিশেষ কলকাতার কলেজে পড়তে গেলাম, বন্ধুদের নামের ছটা, এফিডেবিট করে....কিন্তু পেয়েই গেলাম, পেয়েই গেলাম। জমিয়ে কোচিং খুললাম....যাদের নিয়ে খুললাম তারা তো সরেও পড়েছে, যে-যার সেণ্টার খুলেছে। কোচিংয়ে যখন টাকা আসছে....

—চোখের ক্ষতি হয়ে গেল।

—বকু অবশ্য চালায়।

—হ্যাঁ, বকু না থাকলে....

—আমার পেনশান....তোমার পেনশান....বকুর কোচিং....আমরা তো দুঃখে নেই।

—তবে? তুমি আবারও কাজে ঢুকলে....

—যতদিন পারি....নমু যদি একটু বুঝত....

—দেখ শিপ্রা, নমু ভাল ছাত্রী, দেখতে ভাল, মেয়ে ভাল.....নিজে কাজ করছে ব্যাঙ্কে....স্বামী সাংবাদিক....দেখে খুশি হও। নমুর সাহায্য আমি নেবই বা কেন?

—বকুর কথাই ভাবি।

—বকুর কথা ভেব না। ওর মনে জোর আছে, বুকে সাহস আছে, ও ঠিক চালিয়ে নেবে।

—তুমি তো ভাবো।

—আমার গর্ব দু'জনকে নিয়েই। তবে বকুর টাকা নিয়ে আমি চোখের চিকিৎসা করাব না।

—ও দুঃখ পাবে।

—না না, আমার পেনশান যৎসামান্য। তোমার রোজগারেই খাই.....বকুর টাকা ওর থাকুক।

—বিয়ে তো হবে না।

—তাই কি বলা যায়? তবে নমুর ইচ্ছে, বকু কলকাতা যাক, ভালো কেরিয়ার করুক।

—যেতে তো চায় না।

—ভাবে বাবার চোখ এ রকম, মায়ের একলার ওপর সব চাপ পড়বে। সেই

জন্যেই তো.....

—কি ভাবছ ?

শিপ্রা সস্নেহে বলেন। কৃতজ্ঞতা কি তাঁরই কম ? বিয়ের পর ছোট টাউন যখন সমালোচনায় মুখর, সুরঞ্জনের স্কুলেও নানা কথা উঠেছে, সুরঞ্জন বলেছিলেন, জাতিভেদ প্রথা যে নিন্দনীয়, তা আমরা স্কুলে পড়াই, বিদ্যাসাগর যে বিধবাবিবাহ আইন করিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই, ছাত্রদের বলি। হ্যাঁ, আমি অন্য জাতে বিয়ে করেছি, একজন বিধবাকে বিয়ে করেছি। এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়, তা বুঝিয়ে না দিলে আমি ভীষণ চেঁচামেচি করব। মনে রাখবেন সেটা। এটাও জানবেন, অনেক ভাল কাজের প্রলোভন ছেড়ে আমি এ স্কুলে কাজ করতে এসেছি, অনেক কম টাকায়। কেননা এই বিদ্যালয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার প্রাক্তন শিক্ষকরা বিনাবেতনে প্রাইভেট পড়াতেন বলে আমার রেজাল্ট অত ভাল হয়।

সুরঞ্জন বলেন, তুমি কি ভাবছ ?

—তোমার কথা।

—তুমি-আমি পাস্‌ট টেন্‌স শিপ্রা। বকু প্রেজেন্ট টেন্‌স। তাই তো নমু আর আদিত্যের পরামর্শ চাই। বকুর ওপর আমরা মানসিক বোঝা হয়ে বেঁচে আছি। ওর মুক্তি দরকার। পেনশানের টাকাটা পেলে চোখ তো নিজেই দেখাতে পারব। তারপর বকুর মুক্তি।

শিপ্রার মন বলল, চোখ যদি ঠিক না হয় ?

সুরঞ্জন বললেন, ভাবছ চোখ ঠিক হবে কিনা। সে তো ডাক্তারই বলবে। হবে বলেই আশা করব। খানিকটা ঠিক হলেও বাঁচি। বাজারটাও যদি করতে পারতাম !

—যতদিন পেরেছ, করেছ। শোনো, আমি রান্নাঘরে যাই।

—আমি একটু বারান্দায় হাঁটি। আসলে জন্মান্ধ বা শৈশবে অন্ধ যে হয় সে অন্ধত্বে অভ্যস্ত। বেশি বয়সে চোখ গেলে মানুষ অসহায়।

—থাক, তুমি অন্ধ নও।

—ওই হলো।

—নমুর ননদ তো বিদেশে যায় স্বামীর সঙ্গে। সে যায়, বিদেশে অন্ধদের স্বাবলম্বী করার জন্য কত করছে। এ দেশে সুস্থ সক্ষমেরই ব্যবস্থা নেই, তায় অন্ধ !

—ভক্তিনগরে থাকতে হবে, ভ্যাঙ্কুভার বা ঘানার কথা ভেবে লাভ ? আজ কি রাঁধছ ?

—দেখি কি করি ! আর চা খাবে ?

—না, তিন কাপ হয়ে গেল। বকু কখন আসবে ?

—বিকেল তো হবেই।

—বাসে ফিরবে তো ?

—ওরা কয়েকজন একসঙ্গে ফিরবে, ভেব না।

—ভেবেই বা কি করতাম ? আমার কি ক্ষমতা রয়েছে যে বকুর বা তোমার

কিছু হলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব?

—বকু কেন এভাবে পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে....

—বকু আমাদের মুখ রেখেছে। বাপ তপশীলী বলে পড়ার সুযোগ, চাকরির সুযোগ নিয়েছে?

—ওকে তো তুমি নিতে দাওনি!

—ওর মা তো দত্তরায়। তা ছাড়া আমার মা ছিল শূদ্র, আমার ওটা দরকার ছিল। আমরা তো ওদের সাধ্যমত সব দিতে পেরেছি। জাতপাত বিভেদে ও নিজেও কতটা বিরোধী তা জান। তার মানে এই নয় যে উচ্চবর্ণ পরিচয় পেতে চায়। ও চায়, হঠাৎ বিশেষ সুবিধে নাই বা নিলাম। সম্ভাবনা ছিল মেয়েটার, চিন্তা করে স্বাধীনভাবে। কিন্তু আমি চিন্তা করে করে....না, ওকে আমি মুক্তি দেব।

—তাই দিও। বাবাঃ, বকতেও পারো!

—মাস্টার ছিলাম যে।

বুদ্ধি তো সুরঞ্জনেরও ছিল। বই পড়তেন, ছেলেদের জন্যে লেশ্‌ন-নোট তৈরি করতেন। বিয়ে করে খুব শান্তি পেয়েছিলেন। নমু বলেছিল, "তুমি আমার বাবা?"

—আমি তোমার বন্ধু।

নমু দেখতে ভালো, পড়াশোনায় ভালো, ছাত্রাবস্থায় চাকরি করল, এম.এ-ও পড়ল। চমৎকার পাত্র আদিত্যের সঙ্গে বিয়ে হয়ে একটা বৃহত্তর জগতে মুক্তি পেয়ে গেছে আনমিতা বা নমু। এঁদো শহরের বাইরে মুক্ত জীবন।

বকুর কি হবে? বল্লরী দাশের? বকু, বকু, বকু! কোনো সংগতিও ছিল না, ভাবতেও পারেননি যে সার্জারি করে বকুর মুখটা মেরামত করা যাবে।

বকু নিজেই তো নারাজ এখন। বলে, এই মুখ নিয়ে আমার মনে কোনো কম্‌প্লেক্‌স তো নেই। নমু বলে, তবুও প্লাস্টিক সার্জারিতে আপত্তি কেন বল্? কোনো যুক্তি আছে?

—কোনোদিন পারলে করাব।

—আমাকে করাতে দিবি না?

—তখন তো তুই সব ব্যবস্থা করে দিবি।

—বড্ড জেদ তোর।

—মোটেই না। আদিত্যদা তো বলে, বকু খুব ভালো। জিৎ কেমন আছে?

—এখন বেশ মানিয়ে নিয়েছে।

—বড় দূরে থাকে।

—ঋষিভ্যালির মতো স্কুল পাব কোথায়, বল? এখানে দুজনেই ব্যস্ত থাকি।

—একবার ওকে আনিস। বাবা খুব দেখতে চায়।

—বাপী আর মাকে কত বলি, এখানে এসে থাকো ক'দিন।

—আমাকে ছেড়ে আসতে চায় না।

—তুই সরকারী চাকরির চেষ্টাই করে যাবি?

—ওই একটা কাজেই তো মেয়ে ও পুরুষ সমানাধিকার পেয়েছে। এক মাইনে, এক বেনিফিট। হাসছিস?

—না, কথাটা ভাববার মতো। বকু....বাপীর চোখটা ভাল হবে তো?

—সে তো ডাক্তার বলবে।

—খুব, খুব ভাল লোক বাপী।

—হ্যাঁ, এমন মা-বাবা ক'জন পায়? চলি দিদি, নইলে ট্রেন ধরা যাবে না।

সবই জানেন সুরঞ্জন। বকু ওঁকে সব বলে। না, বকুকে মুক্তি দিতেই হবে।

পেনশানটা চাই, পেনশান। তিনিই সবচেয়ে বয়সে ছোট, বয়স বাষট্টি, শরীর এখনো সবল।

রজনীবাবু বা কালীচরণবাবুর চেয়ে তিনি অনেক ভাগ্যবান। তাঁর শিপ্রা আছে, বকু আছে।

তপনবাবুকে ডাকতে হবে। যখন বিজ্ঞানচেতনার ব্যাপারে এত চেতনা জাগেনি, তখন তপনবাবু ছাত্রদের মনে বিজ্ঞানচেতনা জাগাতেন, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়তেন। সেজন্য কতবার কত অপ্রিয় পরিস্থিতিতে পড়েছেন, এতটুকু ভাবেননি।

কোনো কম্যুনিস্ট ভাবে ভাবিত ছিলেন না, রাজনীতি এড়িয়ে চলতেন। অথচ বলতেন, ভগবান ভগবান করেই মানুষ ভাগ্যবাদী হয়ে যায়।

সুরঞ্জন আর শিপ্রার বিয়েতে অভিনন্দন জানাতে তিনিই এসেছিলেন। বলেছিলেন,খুব ভাল করেছ সুরঞ্জন। আমি খুব গর্বিত যে আমার তরুণ সহকর্মী একটা কাজের কাজ করেছে, গর্বের কথা।

যে সময়ের কথা, সে সময়ে সত্তরের আন্দোলনে ভক্তিনগর ও আশপাশ উত্তাল, উত্তাল।

তপনবাবুর বাড়িতে পুলিশের হানা লেগে থাকত।

তাঁর ছেলে শঙ্কু তো রাজনীতিতে নেমে পড়ে, আত্মগোপন করে। সে সময়েও তাঁর মাথা উঁচুই ছিল।

—আমি আমার ছেলেকে আটকাতে যাব কেন? সে তার স্বাধীন মতে কাজ করেছে যখন?

সেই তপনবাবু আজ বোবা হয়ে গেছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য, নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন একেবারে।

তপনবাবুই পেনশানারদের বক্তব্যটার খসড়া লিখবেন। রজনীবাবু বা কালীচরণবাবু পারবেন না।

পেনশানটা যদি পাওয়া যায়, তাহলে তপনবাবুরও তো সুবিধা।

৪

সেদিনের বিজ্ঞান-শিক্ষক তপনবাবুর মনটা একেবারে প্রতিবাদী নেই এখন। কোনো কিছু যেন স্পর্শ করে না তাঁকে। সব কিছুর মধ্যে থেকেও অনেক দূরে চলে গেছেন যেন।

একদা রিফিউজি কলোনি ছিল যা, তা এখন নেতাজী সুভাষ পল্লী। দরমার বেড়ার ঘর থেকে মাটির ঘর, তারপর পাকা ইঁটে প্রোমোশান পেয়েছে বাড়িগুলি।

কিছু বাড়ি তেতলা, অধিকাংশই একতলা বা দোতলা। দিনে দিনে সুভাষ পল্লীতেও কিছু লোক পয়সা করেছে। মাঠ ঢেকে, পুকুর বুজিয়ে, আম ও বাঁশবাগান কেটে ভক্তিনগর টাউন হাত পা ছড়াচ্ছে।

তপনবাবু একতলা বাড়ি করেছিলেন, দু'খানা ঘর। সেও হতো না। এক প্রাক্তন ছাত্র যখন সরকারী বাড়ি বানাবার ঠিকাদারী পায়, তার জোরাজোরিতেই বাড়িটা হয়।

স্ত্রীর বড্ড সাধ ছিল "নিজস্ব একখান বারি অইব"। তাই বাড়ির নাম দিয়েছিলেন "মাধবী আবাস"।

টিউশনি করে করে টিউবওয়েল বসান। স্ত্রী তাতেই খুশি ছিলেন। বেশ কুলিয়ে যেত, সৌম্য আর ধৌম্য দুই ছেলে, সঞ্চারী মেয়ে, সে দাদাদের চেয়ে অনেক ছোট।

সৌম্য বা শঙ্কু থাকলে তার বয়স হতো চল্লিশ।

সঞ্চারী বা সুনি থাকলে তার বয়স হতো তিরিশ।

মাধবী থাকলে তাঁর বয়স হতো উনষাট।

পাঁচজনের মধ্যে তিনজন নেই।

আছে ধিমু বা ধৌম্য, তার বউ অর্পিতা, ওদের ছেলে অনামিত্র। তপনবাবুকে নিয়ে চারজন লোক।

অথচ এ বাড়িতে আর কুলোয় না। আর এ বাড়ি করার সময়ে রাস্তার ওপর বাড়ি, পেছনে চার কাঠা জমি ফেলে রাখার নির্বোধিতা দেখে অর্পিতা অসহযোগই ঘোষণা করেছে বিয়ের আগেই।

ওখানে ওদের নতুন দোতলা বাড়ি উঠেছে। ধৌম্য তেমন বাড়ি করতে পারে। আজকের দিনে সরকারী কণ্ট্রাক্টর ও, একাধিক বাড়ি করতে পারে।

ওরা সেখানেই থাকে।

তপনবাবুর এই এঁদো একতলার ওপর কি আসক্তি, কেন আঁকড়ে আছেন, তা ধৌম্য বোঝে না।

ওই বাড়িটা ভেঙে ফেললে সুন্দর গ্যারেজ হয়, ভালো একটা ঢোকার পথ, তপনবাবু থাকতে তা হবার নয়।

তপনবাবু তো নতুন বাড়িতেও যাননি থাকতে।

ধৌম্য ছোটবেলায় যেমন নিরীহ ছিল, এখন তেমন দুর্দান্ত। বাপকে ও মানেই

না।

—করেছিলেন বাড়ি, সাধ্যমত বাড়ি করেছিলেন। এখন ও বাড়িতে থাকা কেমন করে সম্ভব?

—তোমাদের তো থাকতে বলি না।

—টাউনে আমার মুখ হাসাবার জন্যে এখানে পড়ে থাকবেন? যাতে লোকে বলে, আমি বাপকে বের করে দিয়েছি....

—কেন বলবে? জমি তো আমারই নামে।

—আমি তো আপনার উত্তরাধিকারী, না কি?

—ধিমু, ছেলেমানুষী করো না।

—তবে যাবেন না কেন? অর্পিতা স্বজাতের মেয়ে নয় বলে?

—তুমি জানো আমি জাত-পাত মানি না।

—আমার বিয়ের পরই চলে গেলেন পুরী!

—ইডিয়টের মতো কথা বলো না ধিমু!

পুরোনো দিনের তপন মাস্টার গর্জে উঠলেন।

—টিকিট আগেই করি। তোমার বিয়ের জন্য টিকিটের তারিখ পিছালাম। অতটি লোকের সঙ্গে দল বেঁধে না গেলে আমার যাওয়া হতো?

—এখন ও বাড়ি যাবেন না কেন?

—ও বাড়ি তোমরা মনের মতো সাজিয়েছ। সেই তো ভাল। আমি যাওয়া মানে এই সব জিনিসপত্র....তোমার মায়ের বিয়ের খাট, শঙ্কুর আর তোমার পড়ার টেবিল, সুনির চৌকি, ছোট আলমারি, এসব কি ফেলে যাব?

—রেখে কি হবে বাবা? মানুষ চলে গেল....

—তুমি বুঝবে না। শঙ্কু নাই, একটা খবর মাত্র। শিলিগুড়ি হাসপাতালে কাকে এনেছিল, সে শঙ্কু? চেনার অসাধ্য। আর সুনিকে তো আমি দেখতেও যাইনি। পুলিশই দেখিয়ে নিয়ে গেল। তোমার মা অবশ্য এখানেই...এই ঘরেই....এখানে সব পাস্ট হিসট্রি। যতদিন আছি, ওদের সান্নিধ্য পাই।

—লিখেটিখে দেবেন না যেন।

—কাকে লিখে দেব?

—আছে তো কিছু ছেলে। বলে দাদার নামে পাঠাগার করবে।

—না, তাহলে তো নানান ঝামেলা তোমার। জায়গাটা তোমার দরকার। পেনশানের টাকাটা পেয়ে নিই, তবে সব ছেড়ে চলে যাব।

—এই বয়সে?

—বয়স মনে করলে বয়স ধিমু! ছেষট্টি এখন বয়সই নয়।

—অর্থাৎ আমার কাছে থাকবেন না!

—দূরেই বা ভাবছ কেন? যেখানেই থাকি, দরকারে তো আসবই।

—জানি না, বুঝতে পারি না। অর্পিতার বাবা কেমন নাতি-নাতনী নিয়ে আনন্দ

করে থাকেন, আপনি পারেন না?

—ভয় করে, খুব ভয় পাই তো নিজেকে। শঙ্কু পাশে দাঁড়াবে, বড় আশা ছিল মনে....

—সে সময়ে দাদাকে তো নিষেধও করেননি।

—তোমাকে বা কবে কিসে নিষেধ করেছি? সে তো বাড়ি ছেড়েই চলে গেল!

—তাহলে?

—শঙ্কু, শঙ্কু, হয়ে গেল শঙ্কু। তারপর, এ কথা সত্য যে তোমার মায়ের অনুনয়েই তোমার মেসো তোমায় কানপুর নিয়ে যায়, ঋণীও হয়ে আছি। টাকা তো তেমন পাঠাতে পারতাম না! তারপর পড়লাম সুনিকে নিয়ে। সুনি তো...যাক গে! ভয় পাই, তোমাদের মধ্যে গিয়ে অত্যধিক জড়িয়ে পড়ব, সেটা ভাল হবে না।

—খেতেও কি নিষেধ? লোকজন কি ভাবে বলুন?

—দিবাকরটাকে কোথায় ফেলি বল? ওর মা কাজ করত, ওর তো লেখাপড়া হলো না, মাথাই নেই। এ বাজারে কিছু করতেও পারল না দোকানপাট, ব্যবসাপাতি। সুনির খবর পেয়ে নিজেই এসেছিল, থেকে গেল।

—থাকবে না? তোফা থাকার জায়গা! খাওয়াদাওয়া জুটছে!

—ওর চালটা ওই কেনে ধিমু, সরসিজের আড়তে মাল নামায়, মাল তোলে। টিউবওয়েলও বসাচ্ছে, মানে কাজটা জানত। মাসে দেড়শো দু'শো আনে। আর...আমি...বউমা মাছ-মাংস নিয়ে আসেন, খাই তো!

—কি আর বলব! অন্তত অসুখে-বিসুখে খবর দেবেন।

—দেব, নিশ্চয় দেব।

ধৌম্য চলে যায়। তপন জানেন, এখানে তাঁর এ-বাড়ি, ছেলেমেয়ে ও মাধবীর স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকবার কোনো মূল্য নেই ধৌম্যর কাছে।

ধৌম্য, সৌম্য নয়। সে অন্য প্রজন্মের মানুষ, মূল্যবোধ অন্যরকম। অতীত, পারিবারিক জীবন তার কাছে অর্থহীন।

নইলে অর্পিতাকে বিয়ে করে?

অর্পিতার বাবার ছিল এ এলাকার নবতম ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি। কি ভাবে টাকা করে তিনি এ শহরে অনেক টাকা নিয়ে ঢোকেন সে বিষয়ে পুরোনো লোকদের মনে নানা সংশয় আছে, তবে সবাই বোঝে সাদা টাকার এমন ক্ষমতা নেই যে কৃষ্ণনগর থেকে শিলিগুড়ি কয়েকটি লাকসারি বাস, এবং ভক্তিনগর থেকে পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ এতগুলো দিকে এতগুলি বাস রুট, এর পারমিট বের করে আনা, অতবড় বাড়ি তোলা চারটিখানি কথা নয়। ব্রজ সাহা এখানে থাকে, কিন্তু ও হাত বাড়ালে কলকাতা ও দিল্লী ছুঁতে পারে।

তারই ড্রাইভার ও হেল্‌পার সকলেই বাইরে থেকে আনীত। সকলে এ রাজ্যেরও নয়।

সুনি ওই বাসেই আসত-যেত কৃষ্ণনগর কলেজে।

সুন্দরী, ব্যক্তিত্বশালিনী, গম্ভীর মেয়ে সুনি।

বিয়ের কথা গৌতমের সঙ্গে। গৌতম কাজ পেয়েছিল রবীন্দ্রভারতীতে।

পরীক্ষার পর গৌতমের সঙ্গে দেখা করতেই ও কৃষ্ণনগর যায়। সকালে গেছে, বিকেলে ফিরবে। কিন্তু সুনি আর ফেরেনি। শোনা গেল ও শেষ বাসে এসেছে। ও বাসটা বাজারের মুখে লাস্ট স্টপে দাঁড়ায়, ডিপোয় চলে যায়।

সেই যে ফেরেনি, আর তো ফিরল না। ভক্তিনগর থেকে অনেক দূরে মাজবাড়ি ফিশারি প্রকল্প বিলের পাশে ওর দেহ পাওয়া যায় পরদিন। ধর্ষিত, উলঙ্গ, নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন, কপালের সামনে কোনো ভারি জিনিসের গভীর ক্ষত।

পুলিশই সব করেছিল।

কিছু যাত্রী, টাউনের কিছু লোক, "বিদ্রোহী কলম" নামে স্থানীয় কাগজের সম্পাদক, এঁদের চাপে পুলিশ সামান্য নড়ে। ওই বাসের ড্রাইভার, হেল্‌পারকে ধরে।

কিন্তু ব্রজ সাহা ওদের ছাড়িয়ে আনে। ওদের শহর থেকেই সরিয়ে দেয়।

সেই ব্রজ সাহার মেয়ে অর্পিতা আজ ধৌম্যের বউ!

কেমন করে, কেমন করে তপনবাবু তা সহ্য করে বেঁচে আছেন?

ব্রজ সাহা প্রথমটা, "এখন আমরা বৈবাহিক হতে যাচ্ছি, মধুর সম্পর্ক, তা বিয়েতে আপনার কিছু ইচ্ছে থাকলে বলুন। হতে পারে চার মেয়ের পর শেষ মেয়ে। কিন্তু প্রথম ইচ্ছে ছিল, কাছেপিঠে থাকবে, দেখতে পাব। সে ইচ্ছে ঠাকুরের ইচ্ছেয় পূর্ণ হয়েছে। এখন বলুন, বেশ খোলামনেই বলুন। কারো কোনো ইচ্ছে আমি অপূর্ণ রাখব না।"

ব্রজ সাহা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ধর্ষণ হয়েছে মাস্টারের মেয়ে।

—প্রমাণ কি যে ওরাই করেছে?

—আজকালকার মেয়ে....কোথায় গিছল, কে দায়িক...

তপনবাবুর মন বলে, সুনির খুনেদের আমার সামনে এনে দিন।

মুখে বলেন, আমার কিছু দরকার নেই।

—বৌভাত, খরচাখরচি বলে....

—আমার ছেলেই জানে।

না, কিছুই মনে রাখেনি ধৌম্য। যাক গে, ধৌম্য সুখী হয়েছে। ও এখানে কেন, যে কোনো জায়গায় বাড়ি করতে পারত। কিন্তু যে পাড়ায় এতকাল, এত বছর সাধারণস্য সাধারণ হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে, সেখানেই ঠাটঠমকে বাড়ি তৈরি করে ও কিছু একটা প্রমাণ করতে চায়। কার সঙ্গে ওর প্রতিযোগিতা, তা জানেন না তপনবাবু।

ও অন্য ভাষায় কথা বলে, ওর আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্যরকম, ওর বাড়িতে কোনো ছোট কাগজের সম্পাদক, রাজনীতি করা লোকজন, মাস্টার, ছাত্র—এমন লোক আসে না। আসে সরকারী আপিসের লোক, ঠিকাদার, ব্যবসায়ী।

অর্পিতার কাছে আসে ওর বন্ধুর দল।

অর্থাৎ ধৌম্য এ পাড়ায় টাউনের উচ্চবিত্ত অংশকে টেনে এনেছে। কাঁপিয়ে দিচ্ছে সুভাষ পল্লীকে।

রাজনীতিক দলের পাণ্ডাদের ও আপিস থেকেই চাঁদা দেয়।

তাই তপনবাবু পালাতে চান। মাধবীর তীর্থভ্রমণের, দেশ দেখার বড় সাধ ছিল। তপনবাবুর ছিল না। না হয় কোনো দূর দুর্গমে চলে যাবেন। যেখানে হয় থাকবেন। নিয়ে যাবেন দিবাকরকে।

দিবাকরের বড় সাধ বিয়ে করে, একটা রিকশা কেনে ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে।

ওকেও দেবেন কিছু।

বকেয়া পেনশানটা তো দরকার।

৫

আদিত্য যেদিন এল সেদিন সুরঞ্জন রজনীবাবু, কালীচরণবাবু, তপনবাবুকে ডেকেছিলেন। সকাল দশটা নাগাদ আসবেন, কথা বলবেন।

বকু ওদের জন্যে সন্দেশ, বিস্কুট আর ছানার জিলিপী এনেছিল। নমুকে বলল, কলকাতায় তো রান্নঘরে ঢুকিস না। যা, মাকে সাহায্য কর।

—আমি রাঁধব না।

—রাঁধতে বলছি না। আদিত্যদা খাবে, মা নিজেই রাঁধবে। তুই গল্পও কর, সাহায্যও কর গে। যে দাম ইলিশ আর কই মাছের। মা না রাঁধলে....

—তোর শাড়ি দে একটা।

—আলনা থেকে নিয়ে নে।

সুরঞ্জন বলেন, নমু, চা কিন্তু তুমি করবে। এরা কেউ তোমার মতো চা করতে পারে না।

—নিশ্চয় করব।

এখানে কয়েকদিন থাকার কথাও ভাবতে পারে না নমু এখন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা ভালোই লাগে।

আদিত্য খুব আসতে চায়নি। নমুই জোরাজোরি করেছে।

—দু'বছরে একটা দিন, তাও যাবে না? বাপী বেশ বিপন্ন, নইলে জোর করতাম?

—সত্যি নমু, তুমি গ্রেট! স্টেপ ফাদারের জন্যে....

—সত্যি বলতে কি, নিজের বাবাকে দু'বছর বাদে হারিয়েছি। একটা ফোটো, বাবা ও মার বিয়ের সময়কার, সেটাকেই বাবা বলে জানতাম। এঁকে "বাপী" বলেছি। ইনি "বাবা" বলার জন্য জোরও করেননি। কিন্তু বাপী না থাকলে আমি জনৈকা বিধবা নার্সের মেয়ে হিসেবেই বড় হতাম। বাপী, মা, দুজনেই গ্রেট। আমার বা বকুর মধ্যে কোনো ছোট শহর-মার্কা সংকীর্ণতা নেই, মূলত ওঁদের জন্যে, বিশেষ বাপীর।

—বেশ, চলো।

—শুধু যাবে না, সহযোগিতা করবে। থাকতে তো যাচ্ছ না, কয়েক ঘণ্টা মাত্র থাকবে।

—গাড়ি তো নেব না!

—না না, ট্রেনে যাব, চমৎকার বাস আছে এখন।

—চলো যাই।

অতএব আদিত্য খুব মন দিয়ে শুনছিল।

—সমস্যাটা কি?

—একটু সিমপ্যাথেটিক লেখার।

—বিষয়?

সুরঞ্জন ঈষৎ হেসে বলেন, এ ট্রু হিউম্যান স্টোরি, বলবেন তপনবাবু, কেননা উনি সবচেয়ে ভাল বলেন। তপনবাবু, আপনি বলুন!

শীর্ণ, অথচ বলিষ্ঠ কাঠামোর দীর্ঘদেহী মানুষটি নড়েচড়ে বসেন, এদিকে তাকান। নমু ওঁকে দেখেই পালিয়ে গেছে। সুনিকে ও পড়াত। সুনিদের বাড়ি গেছে কয়েকবার। সুনির বাবার চোখে চোখে সেদিনও তাকাতে পারেনি, আজও পারে না।

—বকু কি নোট নিচ্ছ?

—হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই। নোট নিয়ে গুছিয়ে লিখে দেব, আদিত্যের সুবিধে হবে লিখতে।

আদিত্য হঠাৎ বলে, আপনি এখানে সায়েন্স পড়াতেন?

—হ্যাঁ।

—আমার বাবা....আপনার সঙ্গে পড়েছেন। হিরণ বসু।

—হ্যাঁ, পরে রিসার্চ করল। ডক্টরেট পেল। বলি তাহলে আদিত্যবাবু?

—বলুন।

তপনবাবু আস্তে আস্তে স্পষ্ট করে বলে যান।

—আমরা চারজনই ১৯৬১-র আগে রিটায়ার করি। বয়সটা এ থেকে বুঝবেন। রজনীবাবু সবচেয়ে বয়স্ক, তারপর কালীচরণবাবু, তারপর আমি, তারপর সুরঞ্জন। সে সময়ে যারা ১৯৬১-র আগেকার পেনশানার, তেমন প্রায় সাত হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলাম। শিক্ষাকর্মী কত তা বলতে পারব না। তা কয়েক হাজারই হবে। পেনশানের হার অতি কম, বলতে লজ্জাই পাই।

—এ সরকার তো শিক্ষকদের বেতন হার যথেষ্ট বাড়িয়েছে!

—সত্যি কথা। আগে প্রাইমারি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের মাস্টারদের বেতন খুব কম ছিল। তবে এই সরকার বার বার পে-রিভিশান করে বেতন-হারও বাড়ান, পেনশান-হারও বাড়ান। আমরা কিন্তু যে বঞ্চিত সে বঞ্চিতই থাকলাম। ওই যে সাত হাজার বললাম, এ ধরুন ১৯৮৯ সালে!

—আরো ছিলেন?

—নিশ্চয়। এখানে আমরা চারজন, একই স্কুলের, যোগাযোগ রেখেছি।

আমাদেরই যোগেনবাবু, গোপেনবাবু মারা গেছেন। এমন কতজন....এখন তো দিনকাল অন্যরকম। পুরোনো পারিবারিক কাঠামো নেই। যাঁরা ঘরদোর করতে পারেননি, শুধুই পেনশানের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁদের কথা ভাবতেও ভয় পাই। অবশ্য....আমি বলছি বেসরকারী বিদ্যালয়ের কথা। সরকারী বিদ্যালয়ের পেনশানাররা আমাদের দলে পড়েন না।

—বকু, নোট নিচ্ছ?

—নিশ্চয়। তবে এ নোট আমি মেমারি থেকেই দিতে পারি আদিত্যদা!

—পে-কমিশন হয়েছিল না?

তপনবাবু নিশ্বাস ফেললেন।

—হ্যাঁ, ১৯৮৭ সালে। ১৯৮১-র পয়লা এপ্রিল থেকে বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতনহার রাজ্যসরকার কর্মীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে সমান।

—হ্যাঁ, তাই তো হয়েছে এখন।

—একাশির পয়লা এপ্রিলের পর যাঁরা পেনশান নিলেন, তাঁদের পেনশান মূল বেতনের পঞ্চাশ পার্সেন্ট।

—আর আমরা? আমাদের পেনশান বাড়ল মাসে চল্লিশ টাকা করে, অর্থাৎ এক কিলো সরষের তেল দিল সরকার। আমরা রিটায়ার করলাম একাশির পয়লা এপ্রিলের আগে। আর সরষের তেল মঞ্জুর করল তিরাশির সেপ্টেম্বর থেকে। অর্থাৎ মাথাপিছু বারোশো টাকা বাঁচল।

—রিয়ালি, এ অসম্ভব!

—ট্রু হিউম্যান স্টোরি তো খোঁজেন? আমাদের কথাই লিখুন না। কেউ লেখে না, কেউ লেখে না। অবশেষে দু'বছর আগে...যাক গে!

—বলুন না। আপনাদের কথা শুনতেই তো এসেছি। আমিও পড়েছি বেসরকারী স্কুলে। শিক্ষকরা তো একাশির আগেই রিটায়ার্ড। তাঁরাও এ রকম অবিচারই সহ্য করেছেন।

তপনবাবু ঈষৎ হেসে বলেন, অধিকাংশ জনই হয় মৃত, নয় মৃতপ্রায় হয়ে ধুঁকছেন। তিক্ত ভাবতে পারেন, এ ভাবেই কাগজ থেকে কাগজে দৌড়ে ১৯৮৯ আর ১৯৯০ বিভিন্ন কাগজে লেখালেখি হবার পর, অর্থাৎ রায় বেরোবার ১২/১৩ বছর বাদে, আমরা ওই চল্লিশ টাকা পাই। কি বলবেন?

—না, আমি লিখব।

—আমাদের চারজনকেই দেখুন। রজনীবাবু একদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামী। কিন্তু সেজন্য পেনশান নেননি। বলেছিলেন, আদর্শের জন্য লড়েছি, ব্রিটিশকে তাড়াবার জন্য লড়েছি, সেজন্য পেনশান নেব কেন? কি স্পিরিট ছিল! বিয়েও করেননি....আজ যা অবস্থা। এঁর শেষ স্বপ্ন, বকেয়া পেনশান পেলে ইনি একটা মিশনের বৃদ্ধাবাসে যাবেন।

—বকু, নোট করো। এতে হিউম্যান অ্যাংগল আসে।

—এই সুরঞ্জন, আপনার শ্বশুর। ছাত্র হিসেবে এমনই রেজাল্ট, পরীক্ষায় বসলে ব্যাঙ্কে অফিসার হতো, ডবলিউ, বি.সি. এসে অফিসার হয়ে যেত। কিন্তু যে স্কুল ওকে তৈরি করেছে....তাকে সেবা করবে বলে....ব্যক্তিজীবনেই কি কম সাহস দেখিয়েছে? সমাজের সঙ্গে কম লড়েছে? আজ বকেয়া পেনশান পেলে ও অন্ধ্রে গিয়ে চোখের চিকিৎসা করাবে।

—বকেয়া পেনশান মানে? সে তো পেলেনই!

—সেই তো কথা! এই সেদিন রাজ্য সরকার কর্মীদের পেনশান বেড়ে সেণ্ট্রাল গভরমেণ্টের স্টাফের সমান হলো। আরেকটা পে-কমিশান। ১৯১৬-র ছিয়াশির পয়লা জানুয়ারি থেকে এঁরা সে পেনশান পেয়ে গেলেন মার্চের মধ্যে। ওই তারিখ থেকে এঁরা পাঁচ-ছয়টা অতিরিক্ত রিলিফ ভাতাও পাচ্ছেন।

—ওগুলো কার্যকরী হয়েছে?

—অবশ্যই। ১৯১৬-র পয়লা জানুয়ারী থেকে কমপক্ষে মাসে তিনশো পঁচাত্তর পেনশান পেলে আমরাও ওগুলো পেতাম। এতেই বুঝছেন আমরা মাসে তিনশো পঁচাত্তরও পাই না। খুব ছুটেছিলাম, খুব দৌড়েছিলাম, জানেন? শেষে অন্তত দেড়শো টাকা ডাকখরচ করে জানলাম, আমরা সংশোধিত পেনশানে অধিকারী নই।

—মাসে তিনশো পঁচাত্তর পান না বলে?

—ঠিক তাই! কিন্তু আমাদের পেনশানেবল গ্রেডে তোলার দায়িত্ব কার? রাজ্য সরকারের নয়? আর ওই দু'দফায় পনের আর চল্লিশ পেয়েছি বটে, কিন্তু পূজা অনুদান? নো, স্যার। ফ্যামিলি পেনশান? নো, স্যার।

—কালীচরণবাবুর বিশেষ সমস্যা কি?

—বিশাল যৌথ পরিবার। স্ত্রী ক'বছর হাঁপানিতে চিররুগ্‌ণ। মেয়ে স্বামী পরিত্যক্তা, দুটো সন্তান নিয়ে পরিবারে গলগ্রহ।

কালীচরণ বলেন, আমরা, বাতিল পাঁচটা মানুষ, বড় লজ্জায়, বড় মনোকষ্টে দিন কাটাই। টাকাটা পেলে দেওঘরে একটা আশ্রমে থাকব। টাকাপয়সা পেলে দিয়ে যাব মেয়ের নাম করে। ছেলেমেয়ে ওখানে পড়বে, ও কাজ করবে, থাকবে। আর...আমরা পালিয়ে বাঁচব। এখন তো তামাশার পাত্র আমরা।

—বকেয়া পেনশান বলছেন কেন?

—আমরা যেমন চারজন আছি একুশ জনের মধ্যে তেমনি অন্যত্রও তো আছেন। সংখ্যা? হাজারের বেশি হব না!

—কোনো সংগঠন নেই আপনাদের?

—কোথায় আর? গঙ্গা হৃদি বঙ্গভূমি, কোথায় কে ছড়িয়ে আছে কে জানে? একবার চেষ্টা করি সংবাদপত্রে লিখে, তেমন সাড়া পাইনি। বর্ধমানের কেশব পাল থাকলে হয়ে যেত। সে তো অকালেই.....ক্যানসারে...

—সরকার তো কথা রেখেছে।

—রাখেনি। রাখেনি। তাহলে আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করি?

—বলুন তবে!

—১৯৯১, এ বছর ফেব্রুয়ারীতে গভর্নমেন্ট মেমো বের করেছে। আমরা ১৯৮১-র পয়লা এপ্রিল থেকে সংশোধিত হারে, অর্থাৎ রিভাইজড্ স্কেলে পেনশান পাব। ১৯৮৯ আর ১৯৯০-এর বাড়তি টাকাও পাব। গ্রাচুইটিও পাব।

রজনীবাবু বলেন, তেমনি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড যা দিয়েছিল তা কেটে নেবে।

কালীচরণ বলেন, নিক, তাই নিক। তবু তো পাই।

—অ্যাকশান নিয়েছেন?

—আমাদের বুদ্ধিমত। আমাদের চারজনের কাগজপত্র জমা দিয়েছি প্রপার অর্থরিটিকে জুন মাসে। রেজিস্টার্ড উইথ এ. ডি. করে।

—এত দেরি করলেন?

—যেতে তো আমরা দু'জন। আমি ব্যক্তিগত কারণে জড়িয়ে পড়ি. বড়ই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর সুরঞ্জন তো...

—জবাব পেয়েছেন?

—নো, স্যার। আশ্চর্য নীরবতা।

বকু বলে, আমি বরং ওঁদের কাগজের কপি নিয়ে বারবার দৌড়ই।

ঈষৎ হেসে বলল, একটা অদৃশ্য কাচের দেয়াল আদিত্যদা। কিছু কানে গেল না, কিছু প্রতিক্রিয়া দেখলাম না। প্রতিবারই বলেন, সময় হলে জানানো হবে।

রজনীবাবু বলেন, সময় তো হতে হবে...আমরা হাঁ করে চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি।

—তপনবাবু, আপনি কি করতে চান?

—আমি? আমি লড়ছি নীতির ভিত্তিতে। আমাকে ভারমুক্ত করে স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে চলে গেছে। ছোট ছেলে সরকারী কন্ট্রাকটর। আমার দায় একটি অনাত্মীয়, বুদ্ধিতে মাটো মানুষের দায়। ওকে দেব, নিজে একটু বেরিয়ে যাব এই টাউন থেকে। আমার কথা ছেড়ে দিন।

বকু বলল, এখন স্কুল কেন, প্রাইমারির কাজও বিক্রি হয়, খবর রাখেন আদিত্যদা?

—ক্যাশ!

—ক্যাশই চলে বেশি।

—আমি নোট নিয়েছি, তুমি রিপোর্টটা দাঁড় করিয়ে দাও।

—অবশ্যই। বাবা তো এ টাকা না পেলে...

তপনবাবু বলেন, চলুন উঠি। রজনীবাবু ছাতা এনেছেন?

—একটা রিকশায় আমি আর কালীচরণ...

—আমি হেঁটেই যাব। নমস্কার মশাই। দেখুন অনেকের আশীর্বাদ পাবেন। আসি সুরঞ্জন। দিবাকর বরং আমার ফাইলটা দিয়ে যেতে পারে। তার দরকার হবে না।

সবই বলে গেলাম।

—এ তো আপনারা চারজন মাত্র।

—চারজনের হলে টেস্ট কেস হবে। তার ভিত্তিতে অন্যগুলোও হবে। সরকার তো সময় নিচ্ছে ইচ্ছে করেই। কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বুড়ো বয়সে, রোগে, দারিদ্র্যে মরে যাক, যত কম জনকে দিতে হয় ততই ভাল। আমাদের পাওনা দিলে যেন সরকারী এক্সচেকার শূন্য হয়ে যাবে। বকু আগে যেত, খবর পেতাম।

—কি করে যাব? ধিমুদা এখন কতগুলো হিংস্র কুকুর রেখেছে!

—বাঃ, সম্পত্তি থাকলে পাহারাদার চাই না?

—হ্যাঁ, ভক্তিনগরেও কুকুর রাখা বাড়ছে।

—মানুষের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য বোধহয়। বুঝি না।

তপনবাবু চলে গেলে আদিত্য বলে, কি পার্সোনালিটি!

সুরঞ্জন অন্যমনস্ক।

—আপনি চুপচাপ কেন?

—না...তপনবাবু! যখন সায়েন্স ক্লাব অন্তত এসব জায়গায় হয়নি, তপনবাবু স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে কলকাতায় প্ল্যানেটোরিয়াম, জগদীশ বসুর লেবরেটরি দেখিয়ে বেড়াতেন। ওঁর কাছেই জানি, শিবপুরে বটানিকাল গার্ডেন্স হয়, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধকল্পে খাদ্যদায়ী গাছপালা চাষ করবার জন্য।

—আশ্চর্য তো!

—বড় ছেলেটা ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র, নকশাল হয়ে গেল, মারাও গেল পুলিশের গুলিতে। আর মেয়েটা! কলঙ্ক, কলঙ্ক আমাদের। সুনিকে এক বাস কোম্পানির ড্রাইভার আর হেল্পার ধর্ষণ করে মেরে ফেলে।

—ইশ্!

—ধরা পড়ল। ছাড়িয়ে আনল বাস-মালিক। এ শহরের এক জাঁদরেল ব্যবসায়ী।

—রেপ কেসে কিছু হয় না।

—ওঁর ছোটছেলে সেই লোকটির মেয়েকেই বিয়ে করেছে। নো ওয়াণ্ডার, তপনবাবু বেঁধে মার খাচ্ছেন।

আদিত্য চুপ।

—সরকারের কাছে উই ডু নট এক্জিস্ট। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১, অপেক্ষা করে করে কত টীচার মারা গেছে তার হিসাব কি!

—সরকারী খাতায় হিসেব থাকবে।

—কে দেখবে? কার ইনটারেস্ট আছে? যাদের পেনশান তিনশো পঁচাত্তর টাকাও নয়, তাদের বিষয়ে?

—অদ্ভুত!

—সৈয়দ মুজতবা আলির গল্প ছিল, স্কুলে মাস্টারের বেতন পঁচিশ টাকা, ম্যাজিস্ট্রেটের কুকুর খায় মাসে একশো টাকার মাংস। একজন স্কুল টীচার ইজ ইকোয়েল

টু ওয়ান ঠ্যাং অফ সাহেবের কুকুর। আমাদের অবস্থা তার চেয়ে ভাল কিসে?

—আপনি কেন এখানে পড়ে থাকলেন যে...

—কেন থাকব না? এখানে আমার মা বাসন মেজেছেন, আর আমি ওই স্কুলে পড়েছি। তপশীলী জাতি। কম্পিট করে ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস থার্ড হই। এখানেই কাজ করব, যাতে আমার মতো অন্যরাও প্রেরণা পায়।

—বোঝা গেল।

—শিপ্রার চাকরিও এখানেই। এমন বিয়ে করে বহু যন্ত্রণা সয়েছি। ময়দান ছাড়িনি। চোখ ঠিক থাকলে কোচিংও ভালো চলত, বেছে ছাত্রছাত্রী নিতাম, সবাই ভাল রেজাল্ট করত। কিন্তু ডাক্তার গণ্ডগোল করল। যাক গে, আর নয়। বকু সবটা লিখে ফেলুক। তুমি একটু রিল্যাক্স করো। দেখা যাক রান্নাবান্নার কতদূর!

—বকু মনে হয় টাইপ করছে?

—সে তো করেই। বকু—বকুকেও মুক্তি দেওয়া উচিত। বয়স আছে, কেরিয়ার করুক। বাবার কথা মনে করে এখানে আটকে পড়ে আছে।

—ওর মুখটা...

—হ্যান্ডিক্যাপটা নিয়েই বড় হয়েছে, এটা অপরকে যত, ওকে তত বেঁধে না। প্লাস্টিক সার্জারি..। আমার সংগতি ছিল না, হয়নি। দেখি আমার চোখ আর ওর মুখ সারানো যায় কিনা। ভালো টাকাই পাব। ওর জন্যে ভাবি বেশি...মেয়েদের নিয়ে যা চলে। শহরটার বারোটা বেজে গেছে। কিন্তু সে তো সর্বত্রই। এসব আর নয় আদিত্য, চলো, একটু গড়িয়ে নেবে।

—কি যে বলেন! নমু কি করছে?

—চলো দেখি।

নমু একটা লাউ কাটার চেষ্টায় বিধ্বস্ত হচ্ছে।

—এরপর লাউ?

—বাড়িতে এমন লাউ হয়েছে, দেখে আমি...

সুরঞ্জন বলেন, নিয়ে যাও।

—কলকাতায় এসব হয়ে ওঠে না বাপী। ভীষণ কাজ, ভীষণ ব্যস্ততা, তা ছাড়া...ও বলে, খাওয়ার জন্যে বাঁচে বলেই বাঙালী জাতটা গেল। যত মেয়েদের পাতা, মেয়েদের ম্যাগাজিন...

—হ্যাঁ...সে তো বটেই...হাজারটা রান্নার রেসিপি...

শিপ্রা বলেন, খেতে তো ভালবাসিস দুজনেই।

আদিত্য বলে, কখনো-সখনো ভালো খেলে বা খাওয়ালে আমিই রাঁধি, নমু নয়।

সুরঞ্জন বলেন, ভেরি গুড। শিখলে কোথায়?

—দিল্লীতে তিন বছর ছিলাম। ওখানে থাকলে রান্না শিখে নিলেই ভাল, বহুজন রাঁধে। ওখানকার কাজের পরিবেশটা আলাদা।

—নমু সব ভুলেই গেল?

—বাপী, আমি কবে কি রেঁধেছি?

—না না, চা, টোস্ট, ওমলেট—এগুলো তো ভালই করতে।

—ওগুলো কি রান্না হলো?

আদিত্য বলে, আপনাদের বাড়িটা সুন্দর। জায়গাও অনেকটাই, ঘর তিনটেই বড় বড়।

সুরঞ্জন সগৌরবে বলেন, মেয়েদের প্রথম সমবায় হাউসিং। সেই দিনে, নার্স—টীচার—এসব একলা মহিলারা শ্রীমতী শিপ্রা দত্তরায়ের উদ্যোগে এই খাস জমি বের করেন। ষোলজনের কোঅপারেটিভ। ধীরে ধীরে বাড়ি হয়, চার বিঘা জমিতে।

শিপ্রা সনিশ্বাসে বলেন, অনেকে বেচে দিল, বাইরের লোক ঢুকে গেছে...জমির দামও অনেক। পুরনো দিনের তিন ঘর এখনো আছি।

—বেচলে ভাল দাম।

—বেচব কেন?

—কলকাতায় ফ্ল্যাট...এখন অবশ্য হয় না।

—না না, চার কাঠা জমি কি কম জমি? ভেতরে এই বাগানটা...

—জিৎকে একবার নিয়ে আসব।

—এসো।

নমু বলে, মা, লাউচিংড়ি হবে?

—হবে, সব হবে। তোরা স্নান কর না একে একে।

—স্নান...?

আদিত্য বলে, হোয়াই নট?

বকু বলে, সাঁতার কাটতে যাবেন?

—না না। এত সুন্দর বাথরুম থাকতে...

—আপনাকে দেখলেই আর কেউ না হোক, ব্যায়ামবীর মিহিরদা আসবে ক্যামেরামান নিয়ে।

—কেন?

—বড় কাগজে লেখেন, তায় ইংরিজিতে!

নমু বলে, মিহিরদার জীবনের স্বপ্ন, যে কোনো বিখ্যাত লোকের সঙ্গে ছবি তোলানো।

—আমি তো বিখ্যাত লোক নই!

—কলকাতাবাসী, তায় সাংবাদিক, মিহিরদার কাছে ওটাই নাকি যথেষ্ট।

সুরঞ্জন হাসেন।

—মিহিরের সঙ্গে কার ছবি নেই? রাজনীতিক নেতা, মন্ত্রী, খেলোয়াড়, চিত্রতারকা, সংগীতশিল্পী, মঞ্চাভিনেতা, বড় ব্যবসায়ী—ও ঠিক ম্যানেজ করে ছবি তুলিয়ে নেয়।

বকু বলে, ঘরের দেয়াল দেখলেই বুঝবেন।

—আচ্ছা বাতিক তো!

—কেন করবেন না? বাপ বাড়ির পর বাড়ি রেখে গেছে। ভাড়ার টাকা আসছে। সরকারী অপিস কি কম ভাড়া দেয়? ওই ব্যায়াম আখড়া করেছে আর ছবির পর ছবি ঝুলিয়ে যাচ্ছে!

—না বকু, নো মিহিরদা, নাথিং। স্নান করব।

একে একে স্নান করে আসে সবাই। টেবিলেই খাওয়া হয়। সুরঞ্জনের চোখের কারণে মাটিতে বসা ও ওঠা, এ ধরনের নড়াচড়া বারণ।

লাউচিংড়ি, ইলিশের পাতলা ঝোল, কই-সরষে, টকডাল, উচ্ছেভাজা, অম্বল।

—বেশ তো খেতে পারিস দিদি, কলকাতায় এত কম খাস কেন?

আদিত্য বলে, ক্যালোরির মাপ আছে, ওজনও ঠিক রাখতে হয়, সে তুমি বুঝবে না বকু।

—ঠাট্টা কোরো না। আজ তো খেয়ে নিই।

শিপ্রা বলেন, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো একটু।

—খারাপ প্রস্তাব নয়।

বকু গভীর চিন্তায় বলে, জিৎ মাছ খেতেই চায় না।

শিপ্রা বলেন, এখন অনেক বাচ্চাই চায় না।

সুরঞ্জন বলেন, ভালই করে। মাছ তো থাকবেও না, কেনাও যাবে না, মাছের ছবি দেখিয়ে ভাত খাওয়াতে হবে।

শিপ্রা কাজের মেয়েটিকে ডেকে বলেন, মীনা, টেবিল সেরে নে—তুইও খেয়ে নে। পান এনেছিলি?

—এনেছি মাসিমা।

নমু বলে, মা, রূপচাঁদের মা কোথায় গেল?

শিপ্রা বলেন, রূপচাঁদ লেখাপড়া শিখল, আমি ব্লকে চাকরি করে দিলাম, মাকে নিয়ে চলে গেল।

—একে নিয়ে ক'জন এল আর গেল?

—বেশি নয়, চারজন!

—সেই যে আমাদের পাউডার, সাবান মাখত?

—ঝুমা! তাকে ভুলিসনি?

—ভুলব কখনো? আমার জন্মদিনের শাড়িটা মেরে দিল!

—যাক গে, বিয়ে করেছে, চলে গেছে।

—সেই ছেলেকেই?

বকু বলল, নিশ্চয়ই। সেই বিহারী প্যাডলারকে।

—আর অন্যরা?

—মালতীকে তো তার দাদারা বাংলাদেশে বিয়ে দেবে বলে নিয়ে চলেই গেল।

আর সুজিত...

বকু বলে, স্বাধীন ব্যবসা করবে বলে বাবার কাছ থেকে চারশো টাকা নিয়ে গেল, ব্রজ সাহার গ্যারেজে ঢুকেছে।

—সত্যি বাপী। তুমি না...

—আহা। চেষ্টা তো করে যেতে হবে...

শিপ্রা তাড়াতাড়ি বলেন, মীনা আমাদের আয়ার মেয়ে। খুবই ভালো আর বিশ্বাসী।

নিচু গলায় বলেন, স্বামী ছেড়ে দিয়ে মার কাছে পাঠিয়ে দিল। একটা বাচ্চা। ওই বিকেল অবধি থেকে রাতের খাবারটা নিয়ে চলে যায়। আমরা যখন হায়দ্রাবাদ যাব, ওর মা আর মাসিই তো থাকবে।

—হ্যাঁ...হায়দ্রাবাদ...এল. ভি. প্রসাদ হাসপাতাল...সুরঞ্জন বলেন, নিশ্চয় হয়ে যাবে, কি বলো?

—দেখি, খবরের কাগজকে অবশ্য ওরা গুরুত্ব দেয়।

বকু বলে, টাইপটা সেরে ফেলি।

—খেয়ে উঠেই? পারবি?

—পারব না মানে? পারতেই হবে।

একটু দুষ্টু হাসি হাসে বকু। বলে, বাবা বলে, আমি লিখে নিই, টাইপ করি লেশন-নোট।

আদিত্য বলে, কেন?

—বাঃ, বাবার কোচিং-এর কত নাম জানেন?

—কত কাজ করো বকু।

—টাকা জমাতে হবে না?

সুরঞ্জন বলেন, বকু, সব কথা ফাঁস করে দিবি?

—না। তোমার চ্যারিটির কথা বলিনি এখনো।

—আমি? চ্যারিটি করি?

—অবৈতনিক সার্ভিস, এবং অযোগ্য লোকদের। জানিস দিদি, ছেলেমেয়েরা তো শুদ্ধ ইংরিজিতে দরখাস্তও লিখতে পারে না কাজের জন্য। বাবার কাছে আসে, বাবা শুনে নেয়, কারেক্ট ইংরিজি বলে দেয়, ওরা ভুল বানানে লিখে নেয়।

—আহা, ওটুকুতে যদি কাজ হয়।

—হলো তো তিনজনের, কাজ পেয়ে দেখা করেছিল? এসব ফালতু কাজ একেবারে করবে না।

—তাই হবে, তাই হবে। আদিত্য, একটু শোও। চারটের বাস ধরলে লোকালটা পেয়ে যাবে।

—শুই একটু।

আদিত্য শুয়ে পড়ে সুরঞ্জনদের ঘরে, এবং ঘুমিয়ে পড়ে।

কি তাড়াতাড়ি সাড়ে তিনটে বাজে!

কি তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হয়!

চা খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হয় ওদের। বকু এগিয়ে দিতে যায়।

সুরঞ্জন আর শিপ্রা দাঁড়িয়ে থাকেন।

ভারি সুন্দর একটা দিন হঠাৎ ফুরিয়ে যায়।

সুরঞ্জন বলেন, শিপ্রা, মন খারাপ লাগছে?

—একটু। তবে নমু যে ভাল আছে...আদিত্য সত্যিই ভাল ছেলে...নমু লাকি!

—আদিত্যও কম লাকি নয়। নমুর মতো মেয়ে ও পেত কোথায়? এ রকম চেহারা, বুদ্ধি, কাজে তুখোড় মেয়ে?

—বকুর যে কি হবে!

—বিবাহ পরমা গতি নয় শিপ্রা। বকু নিজের জীবন নিজে তৈরি করে নেবে, আমার চিন্তা থেকে মুক্তি পাক আগে।

—হ্যাঁ...তোমার পেনশান...

—পেনশানটা তো ভিক্ষা নয়। গভরমেন্ট কথা দিয়েছে, কথা রাখুক। এ চারজনে পেলেও যথেষ্ট। সেটা হলে অন্যরাও পাবে। আমরা অনেকে শিক্ষকতা করেছি সেদিন, ওটাকে আমি অন্তত নিছক চাকরি হিসেবে দেখিনি। জানি না ভাল শিক্ষক ছিলাম কিনা, কিন্তু যে-যেমন শিক্ষকই হোক, তার প্রাপ্য তাকে দেবে না কেন?

—দেবে, দেবে। উত্তেজিত হয়ো না।

—তুমি যে আবারও কাজে ঢুকলে...

—যতদিন পারব, কাজ করেই যাব। কাজ জানি, ক্ষমতা আছে শরীরে, বসে যাব না।

—ঠিক বলেছ। আমি একা পুরুষ, তিনটি স্বাধীনচেতা রমণী, আমি চুপ করলাম। কেন আমাদের কেসটা হচ্ছে না বোঝ তো?

—কেন বুঝব না? কিছু বয়স্ক বৃদ্ধ, ক্ষমতাহীন লোক, তোমাদের ব্যাপারে কোনো রাজনীতিক দল, কোনো শিক্ষক সংগঠন, কারো আগ্রহ নেই।

—যাক, কাজটা হলেই ভাল।

—আমিও তো তাই চাই।

—রজনীবাবু, তপনবাবু, কালীচরণবাবু, অবস্থা কি—একেকজনের!

—ভাবতেই পারি না। বোস, আমি কাগজটা আনি, পড়ে শোনাই।

—শোনাও, তাই শোনাও।

৬

আদিত্যের কাছে সংবাদটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও প্রথমটা সে অন্যদের এর গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হয় না। আদিত্যকে অনেকে ঈর্ষা করে।

সে নাকি প্রাপ্যের অতিরিক্ত পেয়ে যাচ্ছে।

অনেকে সমীহ করে।

হাজার হলেও দিল্লীতে সর্বভারতীয় কাগজটি ধরে থাকলে এতদিনে ও অনেক ঝকঝকে কেরিয়ার করতে পারত।

অনেকের কাছে ও দুর্বোধ্য।

কেন ওর মদ কেন—বিয়ারেও রুচি নেই?

কেন ও ধুতিপাঞ্জাবি পরে, শীতকালটা বাদ দিয়ে?

তবে আদিত্য যে ভাল ইংরিজি লেখে, সত্যিই ভাল রিপোর্টার, অনেকগুলো বিষয় ওর জানাচেনা এবং লেখার জন্য খাটে, এ কথা কেউ অস্বীকার করে না।

বেশ কয়েকটি রিপোর্ট ওর ভাল নাম করেছে। ট্রু হিউম্যান স্টোরি প্রত্যেকটি। ও যাঁকে 'দাদা' বলে, যে প্রবীণ সাংবাদিক ওকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কলকাতায় এনেছিলেন, বলেছিলেন, দেখ কলকাতার মতো জায়গা নেই, পশ্চিমবঙ্গেও তো ভাল, তরুণ, পরিশ্রমী সাংবাদিক দরকার—

যিনি আদিত্যকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে আরেকটা দিল্লী দেখিয়েছিলেন, যে দিল্লী ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া, অতীব উন্নীত দিল্লীর ঔদ্ধত্যের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে, তাঁর কাছেই যায় আদিত্য।

—এস হে বিভাবসু!

বিভাবসু মানে সূর্য। আদিত্যকে উনি কেন যে 'আদিত্য' নামে ডাকেন না তা এখন আদিত্য জানে।

ওঁর একতম সন্তান আদিত্য আই. এ. এস. পরীক্ষা দিয়েছিল, খারাপ রেজাল্ট হয়নি, কর্ণাটকে গিয়ে জয়েন করবে ট্রেনিংয়ের পর ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই ছেলে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায়।

সেই সঙ্গে অবশ্য সকলেই মারা যায়, যতজন ছিল।

কিন্তু বীরুবাবুর তাতে সান্ত্বনা কি?

যান্ত্রিক গোলযোগই এজন্য দায়ী।

তাতেই বা তাঁর সান্ত্বনা কি?

সবাই ভেবেছিল উনি আর কাজ করবেন না।

কিন্তু একটু শীর্ণ, একটু অন্যরকম হয়ে উনি কাজেই ফিরে এলেন। বললেন, বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়।

কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, তবু বললেন, ওর মার ঠাকুর আছে, মঠ আছে, আমার কি আছে?

সেইজন্যে দিল্লীতে আদিত্যকে নাম নয়, পদবী ধরে সম্বোধন করতেন।

আদিত্য সহকর্মী হলে ওকে 'বিভাবসু' বলেন।

—এসো হে বিভাবসু, খবর কি?

—একটা হিউম্যান স্টোরি লিখতে চাই।

—সবজেক্ট?

বিষয়টা শুনে উনি বলেন, ইয়েস, হোয়াই নট? এটা অবশ্য এমন কিছু নয়, যেখানে কোটি কোটি লোক, বা কয়েক লক্ষ বা নিদেন দু-চার লাখ মানুষ অবিচারের শিকার!

—তবু হিউম্যান স্টোরি তো?

—তুমি কি সরকারকে আক্রমণাত্মক লেখা লিখতে চাও? সেটা অবশ্য করা যায়।

—একেবারেই নয়। সমস্যাটা তুলে ধরতে চাই, যাতে ওঁরা বেঁচে থাকতে থাকতে বেনিফিটটা পান। পেনশান দেবে বলে ডিক্লেয়ার করেছে, দিচ্ছে না!

—আন্দোলন না করলে...

—কারা আন্দোলন করবে দাদা? একাশির আগে যারা রিটায়ার করেছে? বয়সটা ভাবুন।

—কোনো রাজনীতি করেননি?

—মনে হয়নি। সাম্ রজনীবাবু, ব্যাচেলর, স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, কিন্তু পেনশান নেননি। বলেন, দেশে স্বাধীনতা আনার জন্য যা পেরেছি, করেছি। পেনশান নেব কেন? ইনি আন্দোলন করবেন? আমার শ্বশুর তো করেননি। তিনি ইংরিজিতে ফার্স্ট ক্লাস থার্ড, ম্যারেড এ উইডো উইথ এ ডটার। হ্যাঁ, আনমিতার বাপী। খুব ফাইটার লোক। ইনি রাজনীতি করতেন না, আমি জানি।

—ইয়েস...ইয়েস বিভাবসু।

—আমার শ্বশুর ইংরিজিতে ফার্স্ট ক্লাস থার্ড হয়ে পড়াতে যান—ওই বি. কে. এস. ভক্তিনগর স্কুলেই জয়েন করেন। এঁদের কিছু আদর্শবাদ—কি হলো?

—ভক্তিনগর? কৃষ্ণনগরের কাছে? রজনীকান্ত ঘোষদস্তিদার?

—তাই হবেন?

—গড। তোমার সঙ্গে গাঁইগুঁই করেছে চিরঞ্জিত?

—ঠিক গাঁইগুঁই নয়!

—দাঁড়াও, ওকে ফোন করি। চিরঞ্জিত ঘোষদস্তিদার...ইয়েস, চিরঞ্জিত, আমি বলছি।

আঙুল তুলে আদিত্যকে চুপ করে থাকতে বলেন।

—হ্যাঁ ভালো আছে...না, এখন আমার দিদি থাকেন। থেকে গেলেন আর কি! ছেলেরা বিদেশে, দিদি গিয়ে থাকতে নারাজ, ঘুরে এসেই খুশি, থাকতে কেউ চায় না। আর তোমার বউদিকে তো উনিই চাইছিলেন। যাক গে...আদিত্য এসেছে...

—আছে, হিউম্যান অ্যাংগল আছে ভাই। লেট...

—না না, সংক্ষেপে বলছি। তোমার যে কাকার কথা অত গর্বের সঙ্গে বলো, সেই রজনীকান্ত ঘোষদস্তিদারও এঁদের মধ্যে আছেন। আদিত্য দেখে এসেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশান চাননি, স্কুল মাস্টার হিসেবে প্রাপ্য পেনশান চান।

—তাহ'লে তাই বলি। ফোন নামিয়ে রাখেন।

—রজনীকান্ত ঘোষদস্তিদার নামটা আমিও জানি। আমার মা বোধহয় ওঁদের গ্রামের লোক। বলতেন, উনি আমাদের গৌরব।

—দেখলেই বুঝবেন, কি অবস্থায় আছেন। চোখের চাহনিটা এমন দীনহীন যে...

—লেখ লেখ, আমি খুব খুশি হব। ইস্, সে সব দিন কবে চলে গেছে। স্বাধীনতার ফলে লাভ হয়েছে দেশের, লোকসানও কম নয়।

—আনমিতা খুব নিশ্চিন্ত হবে।

নমু বলে, খুশি হব না? বি. কে. এস. কি সামান্য স্কুল ছিল? টীচাররা একেকজন এমন রত্ন! তপনবাবুরা বিজ্ঞান আলোচনা করতেন, কত কি করতেন।

—রজনীবাবুই রজনীকান্ত ঘোষদস্তিদার, শুনে ওঁরা বললেন, খুব নামকরা লোক ছিলেন এক সময়।

—এখন ভাগনে আর ভাগনে-বউয়ের লাথি খাচ্ছেন।

—লিখে ফেলব আজই।

—বকু তো রিপোর্ট দিয়েছে।

—রিয়েলি, বকু একটা দারুণ মেয়ে।

—দারুণ মেয়ের দারুণ জেদ। যাক গে, জিৎকে বাংলায় চিঠি লিখবে তো? নইলে ও বাংলা লেখা ভুলে যাবে।

—লিখব, লিখব।

—এবার ওকে নিয়ে ভক্তিনগরে যাব। শীতকালে ভালই লাগবে। নিজের লোকজনকে দেখুক একটু।

—তুমিই তো ঠিক করো সব, গেলেই হয়।

—যাক গে, লেখো।

—হ্যাঁ, একটা সত্যি হিউম্যান স্টোরি।

ভক্তিনগরে বাংলা কাগজ যত লোক পড়ে, আদিত্যদের ইংরিজি কাগজ তত লোকে পড়ে না।

তবু খবরটি কিছু লোক পড়ে, সংবাদ প্রচার হয়। ফলে ভক্তিনগরে নানারকম প্রতিক্রিয়া হয়।

বকুর অনুরোধ ছিলই, আদিত্যদা, যেদিন খবরটা বেরোবে, সেদিনের কাগজ আমার জন্যে অন্তত ছ'টা কিনে রাখবেন, নিয়ে আসব।

—তুমিও খেয়াল রেখো।

—তা তো রাখবই।

খবরটা বেরোনোর পর বকু কিনে আনে কাগজ।

—বাবা, বেরিয়েছে আদিত্যদার লেখা! আমি হয়তো কৃষ্ণনগরে পেয়ে যাব, নইলে চলে যাব।

—রয়েসয়ে যা না।

—না না, তপন জেঠু হয়তো খেয়াল রাখবেন। রজনী জেঠু বা কালীচরণ জেঠু কিছুই করতে পারবেন না। রজনী জেঠুকে তো কেউ এনেই দেবে না কাগজ।

—ওঁকে হাইলাইট করেছে, তপনদা'কেও। দরকার ছিল।

রজনী জেঠুর দাদাদের ছেলেরা অনেকেই মনে হয় দাঁড়িয়ে গেছে ভালো মতো।

—তা হবে। উনিই খবর রাখেন না, আমরা কি জানব?

—তারা যদি দেখত!

—রজনীবাবু তো অভিমানী, আত্মসম্মানী লোক। তারা অন্যরকম, ইনি অন্যরকম। এক মা ছাড়া ওঁর পিছনে কেউ ছিলেন না। যে পিসতুত বিধবা বোনকে আশ্রয় দেন, তাঁরই ছেলে ওই তাপস। এখন ওঁকে টিপে মারছে।

—ভাইপোরা যদি নিয়ে যেতে চায়, যাবেন?

—আগে তো বলতেন, এবারও বললেন, দয়া চাই না ভাই, পেনশানটা পেলেই সব পাওয়া হবে। তুই অতগুলো কাগজ আনবি কেন? তার চেয়ে অনেক কম খরচে জেরক্স হবে।

—না, কাল আসব। একটু কথাও বলব ওঁদের সঙ্গে। ট্রেনে যাব আসব, তোমরা ঠিক থেকো।

শিপ্রা বলেন, কিন্তু কেন?

—ব্যাপারটা বেরোল কাগজে, এ সময়ে যদি একটু দৌড়োদৌড়ি করা যায়, হয়তো কাজ হতে পারে।

—কোথায় দৌড়বি তুই? কি হবে?

সুরঞ্জন বলেন, এ বছর পনেরই জুন আমরা রেজিস্টার্ড ডাকে যেসব কাগজপত্র পাঠালাম, তার প্রাপ্তিস্বীকার করলেও মনে করব, অচলায়তন একটু নড়ল।

—কিন্তু ও একা যাবে?

—মা! বাবা আর পারে না, তপন জেঠুও অপারগ। কাউকে তো দৌড়তে হবেই।

তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে, সৌতি সঙ্গে যাবে, ভেব না।

—সৌতি, সৌতি...সৌতি!

বকু বলে, হ্যাঁ, গৌতমদার ভাই।

গৌতম আর সুনির বিয়ে হবার কথা ছিল। সুনি আর গৌতম...

—গৌতম বিয়ে করেছে, তাই না?

—হ্যাঁ মা। কি করত বলো?

—না, ঠিক করেছে।

—প্রথমে কি রকম হয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন...এখন দেখলে চিনবে না, চুলটুল পেকে...গম্ভীর...হাসে না।

—তোর সঙ্গে দেখা হয়?

—তা হয়। কেষ্টনগর গেলে ওদের ওখানে যাই তো।

—সবাই ভাল আছে?

—আছে এক রকম।

—সৌতি কি করে?

—কেষ্টনগর থেকে কলকাতা। অবশ্য কেষ্টনগরেই ওদের সেণ্টার। একটা ভলাণ্টারি অর্গানাইজেশনে কাজ করে, মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

—ওঁর সঙ্গে যাবি, নিশ্চিন্ত হলাম। কলকাতা বড় বিপজ্জনক।

—কোন্ জায়গা নিরাপদ, বাবা? ও তো বলছে, আমাদের এখানে কাজ কর্ না, প্রজেক্ট তো আসছেই। আমি ওসবে নেই। যাক, নিশ্চিন্ত হলে তো?

—খুব।

—অনেক কথা আগবাড়িয়ে ভেবো না। সৌতি আমার বন্ধু। আমার বন্ধু তো অনেক।

—আজই যাবি?

—ব্যাপারটা বাবাদের কাছে জরুরি মা। আজ আদিত্যদা'র নাইট ডিউটি, বাড়িতে পেয়ে যাব।

—খেয়ে বেরোস বাপু। আমি কাজে বেরোব। মীনা খেতে দেবে।

—তুমি নার্সিহোম থেকে সোজা আসছ তো?

—হ্যাঁ, তাই আসব।

—বাবাকে একলা রেখো না। তুমিও বড্ড হাঁপাহাঁপি কর। একটু সামলে মা! বয়স তো হচ্ছে!

বকু স্নান করতে দৌড়য়। সুরঞ্জন আর শিপ্রা এ-ওর দিকে তাকান। শিপ্রা হাসেন।

—ও যেন ভাবতেই পারে না, ওর গার্জেনশিপ ছাড়া আমরা বাঁচব।

সুরঞ্জন মনে মনে বলেন, তার কারণ আমি, আমার এই অক্ষমতা। আমি প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছি, এই ভয় আমার যত, ওরও তত। ওর জন্যেই আমাকে চোখটা সারাতে হবে।

হঠাৎ মনে কোথায় আশঙ্কা জাগে। পেনশানের টাকা পাবেন, তবে যাবেন? অনেক দেরি হয়ে যায় যদি? যদি তখন অপারেশনে কাজ না হয়? একবার কলকাতা যাবেন?

বকু খেতে বসেছে, ওকে বলেন, বকু, কলকাতায় একটা খোঁজ নিতে বলবি নমুকে?

—কি খোঁজ?

—বিপ্লবী চক্ষু নিকেতন, পার্কসার্কাস অঞ্চলে। ডাক্তার রণবীর মুখার্জি বসেন। একবার দেখিয়ে নেব।

—হায়দ্রাবাদ যাবে না?

—যাব না কেন? চোখটা কি স্টেজে আছে, দেখিয়ে নিই একবার। অতবড়

ডাক্তার! আধুনিক সব ব্যবস্থা! আগে তো যাইনি। মানে...দেরি না হয়ে যায়।

—দেরি হবে না বাবা। সরকারের কানে জল ঢুকতে কতদিন লাগবে জানি না। তোমার বেলা আমি দেরি করব না। ডাক্তার মুখার্জিকে দেখিয়ে আনব চোখ।

—যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।

—সে খোঁজ সৌতিই এনে দেবে। ভাবনা কি?

—সৌতি মেডিক্যালে পড়াটা শেষ করল না!

—তার চেয়ে বড় কাজ করেছে বাবা। ছত্তিশগড়ে গিয়ে শংকর গুহনিয়োগীর হাসপাতালে কাজ করেছে, এখনো যায় বছরে তিনবার।

—এরাও এই প্রজন্মই। তপনবাবুর ছেলে ধৌম্য, রজনীবাবুর ভাগ্নে তাপস, কালীচরণবাবুর একপাল ছেলে, এদের দেখে দেখে...

—হ্যাঁ, আমাদের প্রজন্মটা বেটার। কম রোমান্টিক, বেশি অ্যাকটিভ।

—রাজনীতি করিস না তো?

—করলে তুমি জানতে না? এখন খেতে দাও।

খেয়েদেয়ে একটা ছাপাশাড়ি পরে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বকু বেরিয়ে যায়। বলে, মা যদি হেঁটে নার্সিংহোমে যায়, ভাল হয়। এখন তো বলছে, যত পার হাঁটো, হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কম থাকবে। ডাকপিওনদের, রাস্তার হকারদের চান্স খুব কম।

—সেজন্যই বারান্দায় হাঁটি।

—বুঝেছি। চলি।

ইংরিজি কাগজের সৌজন্যে উল্লেখ করে ভক্তিনগরের 'দৃষ্টিপাত' কাগজ সংবাদটি দুই কিস্তিতে ছেপে দেয়। সম্পাদক যখন ক্ষিতি, যে কাগজটাকে প্রায় স্বয়ম্ভর করে ফেলেছে এবং যার 'অরুণ প্রেস' টাউনে বৃহত্তম প্রেস, সে এমন খবর ব্যবহার করবেই। ক্ষিতির ভাই অহী বলে, ভক্তিনগরের খবর দেবে কলকাতা? এটা তো ইনসাল্ট!

—তা তোমরা যদি ভ্যারেণ্ডা ভাজো!

—কিসের ভ্যারেণ্ডা?

—শান্তিপুর, দিগনগর, নবদ্বীপ, ফুলে—খবর তো এসে যাচ্ছে। ভক্তিনগরের খবরগুলো আনবে কে? এরা ছাপল বলে আমরা ছাপতে পারছি। আসলে কোনো কাজের কাজ করো না তোমরা, ছি ছি ছি!

—দুই কিস্তিতে ছাপবে যে, কি বাদ যাচ্ছে জান?

—জানি, "মধুকণ্ঠী মধুরতা গায়িকা থেকে যাত্রাতারকা।"

—খবরটা...

—এ খবরের গুরুত্ব বেশি।

ক্ষিতি বলে, মধুরতা তো নয়, ও হলো মাজবাড়ির ময়না দাস। এরা খোদ ভক্তিনগরের নাগরিক।

—তবে তাই হোক।

—আমি ভাবছি আরো বড় কথা।

—কি ভাবছ?

—রজনীবাবুকে আর তপনবাবুকে "দৃষ্টিপাত" কাগজের তরফ থেকে নাগরিক সংবর্ধনা জানাব। টাউনের বি.কে. হল নেব, টাকা ওঠাব, হইহই করে সংবর্ধনা দেব। আগেই এ কাজ করা উচিত ছিল। তবে এ টাউনকে তো জানো। চিরকাল বলেছে, লোকটা স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশান প্রত্যাখ্যান করে, তার মানে অ্যান্টি-কংরেস! সাসপেক্ট মানুষ!

—শঙ্কু তো নকশাল হয়ে যায়।

—শঙ্কু নকশাল হয়েছিল, তপনবাবু তো হয়নি। তাতে আরোই সাসপেক্ট হয়ে গেল।

—সুনির ব্যাপারটাও...

—কি হয়েছিল সবাই জানে। যাক গে, ইউথ ক্লাব আর বিজিতরা যে এত এত বিজ্ঞানপ্রদর্শনী করছে, ওই লোকটা সেই দিনে বিজ্ঞানচেতনা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল সেও ভুলে গিয়েছিলাম।

—বকুটা তো আমাদেরকেও খবরটা দিতে পারত।

—ফালতু বোকো না, অহী। এ কাগজ কতজন পড়বে? ও কাগজের গুরুত্ব অন্যরকম। আগেও ওনাদের খবর বেরিয়েছিল। যাক, বকুদের বাড়ি একবার যেতে হবে।

—কেন? ওর বাবাকে তো...

—তোমার হবে অহী, মাথায় কিছু নেই যার, উন্নতি হইবে তার। এতকাল টাউন থেকে কেউ যায়নি। দেখেনি ওনারা বেঁচে আছেন, কি মরে গেছেন। এখন সরাসরি গিয়ে বলব যে, সার, অমুক কাগজে খবরটা পড়ে এসেছি। এখন আপনাকে সংবর্ধনা দেব। সুরঞ্জন 'সার ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।

—তার বড় জামাই তো লিখেছে। ঈশ! বড় একটা সাংবাদিক এল আর চলে গেল। একবার আমাদের আপিসে ডাকতাম তাঁকে, ফটো তোলা থাকত।

—সে তো মিহিরও বলছে। দুজনের দেখছি উন্নতি হবেই। মাথা খাটিয়ে কিছু ভাবতে পার না, কত সুখী।

সুরঞ্জন বলেন, বের হোক খবরটা...

—'দৃষ্টিপাত' কাগজেরও একটা প্রভাব আছে জেলায়। এ.বি.টি.এ. এ নিয়ে কিছু করবে না।

—কেন করবে? আমরা কতজন বা আছি! আর এখনকার লোকজনের মানসিকতা খুব অশিক্ষিত। টিকিট এঁটে দেয়। রজনীবাবু স্বাধীনতা সংগ্রাম করেন, তারপর কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা হয় স্বাধীনতার পর। সো, বামপন্থীদের কাছে উনি এখন কংগ্রেসী। কংগ্রেসীরা সমান খাপ্পা, কেননা উনি স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশান

নেননি। রজনীবাবুদের জন্যে কারা লড়বে?

—সত্যি!

—তপনবাবুও ব্রান্ডেড। আর একাশির আগে রিটায়ার করেছে, এমন লোকদের জন্যে কে কি করবে?

—বুঝলাম।

—একটা কাজ করতে পারো।

—কি, বলুন?

—কাগজ মাধ্যমেই চেষ্টা করো না, সরকারী সার্কুলারগুলো জানিয়ে দিয়ে যে একাশির আগে রিটায়ার করা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা অমুক জায়গায় দরখাস্ত করুন।

—করব। ওঁদের সংবর্ধনা।

—তোমার অ্যাপ্রোচের ওপর নির্ভর করবে ক্ষিতি। এঁরা ভীষণ অভিমানী, আত্মসম্মানী, কি ভাবে নেবেন, কেমন করে বলব? অনেকেরই শিক্ষক আমরা। ছাত্ররা এত বছরে তাঁদের স্মরণও করেনি, আমাদের জন্যে নয়, তোমাদের জন্য দুঃখ হয় আমার। কিংবা এটাই এখন নিয়ম, আমরাই ভুল করছি। আচ্ছা এসো, আমি চোখে ওষুধ দেব, শুয়ে থাকব।

—আপনার সাহায্য পাব না?

—আমি? আমি বড়জোর ঝাপসা-দর্শক এবং উৎসাহী শ্রোতা হতে পারি।

—বকু কোথায়?

—কিছু করছে হয় তো, ব্যস্ত থাকে।

—যা জেদী মেয়ে! বললাম, এম.এল.এ. সার্টিফিকেট করে দিচ্ছি, অজিতকে বলে দিচ্ছি, সরকারী কাজ তোর হয়ে যাবে ফুড-সাপ্লাইয়ে। বলে, না, আমি কোনো বিশেষ সুবিধা নেব না।

—আমাদের কথাই শোনে না।

ক্ষিতি চলে যায়।

আর বকু যায় তপনবাবুর কাছে।

—এস মা!

—জেঠু, কাগজপত্রগুলো দিন, জেরক্স করাব।

—কত করবে মা!

—আপনি পারেন না, বাবা পারে না, কাউকে তো দৌড়তে হবে!

—কালীচরণ আর রজনীবাবুর কাগজপত্র এনে রেখেছি। তিনজনের তিনটে ফাইল। আমার ফাইলে সাতাত্তর সালের পে-কমিশন থেকে আমাদের প্রসঙ্গে যেটুকু তা তোলা আছে আলাদা কাগজে। একানব্বই সালের গভরমেন্ট অর্ডারের কপি আছে। আমরা চারজন যে চারটে রেজেস্ট্রি পাঠাই তার রসিদ আছে, জেরক্স অবশ্য। কাগজপত্র আমিই রাখতাম। তোমার বাবার চোখটা অমন হবার পর...

চোখ তুলে বলেন, বকু ! সুরঞ্জনের চোখ, আমার মনে আরেকটা আঘাত রেখে গেল।

—জানি। কিন্তু বাবার এ চোখটা অবশ্য বাঁচবে, দেখবেন। আগে তো কলকাতায় একবার দেখিয়ে নেব ডাক্তার রণবীর মুখার্জির কাছে। আসলে ছানি অপারেশনের মতো সহজ জিনিসের জন্য কে কলকাতা যায় বলুন ? তা যে এমন গোলমাল হবে...

—তবু তার তুমি আছ।

—জেঠু, আমি আপনাদের সকলের জন্য আছি।

—ইয়েস। এসো, তোমার কাজ আছে।

—ওটা কি করছেন ?

—সায়েন্স ক্রসওয়ার্ড। সেদিন তোমাদের বাড়ি গেলাম, তার ক'দিন আগে থেকেই।

—বাংলায় ?

—হ্যাঁ, বাংলায়। খুবই চ্যালেঞ্জিং কাজ। দেখি...সময় তো কাটে। বাংলা বিজ্ঞান-অভিধান...দাম এত ! বই অনেক এখন।

—আসি জেঠু।

সৌম্য, সুনি ও মাধবীর ছবির সামনে থেকে পালিয়ে আসে বকু। সুনি, গৌতম আর বালক সৌতি একসঙ্গে ছবি তুলেছিল একদা। গৌতমের কপিটা সৌতি রেখে দিয়েছে। ছেলে গেল, মেয়ে গেল, স্ত্রী গেলেন, ছোটছেলেটা একেবারে অন্যরকম।

তবু তপন জেঠু বিজ্ঞানের ক্রসওয়ার্ড করছেন !

সৌতিকে বলতে হবে।

ভদ্রতার ও কর্তব্যের খাতিরে বকু কালীচরণের বাড়িতেও যায়। জেঠু বলেন, ঘরেই এস বকু। এ বাড়িতে তোমাকে বসাবার জায়গা তো নেই।

বড় বউয়ের ঝনঝনে গলা শোনা যায়, এখনো বাবা এরিয়ার পেনশান পাননি, এখনো তোমরা চলে যাওনি। এখানেই আছ। বললাম লাউঘণ্ট হবে আর আলুটা ডুমো ডুমো করবে, চিংড়িমাছ দিয়ে হবে।

বুনুর ক্ষীণ কণ্ঠ, মেজ বউ যে বলল...

—লাউগুলো ডুমো ডুমো, আলু সরু সরু ?

জেঠু বলেন, শুনো না রে মা ! বহু পাপ না করলে নরকবাস ঘটে না। আমি নরকবাসই করছি।

কালীচরণের স্ত্রী বিছানায় হেলাম দিয়ে অনেকগুলো বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। পাশে বুনুদির মেয়ে বসে দিদিমার বুকে হাত বোলাচ্ছে।

—ও স্কুলে যায় না ?

—যায়, যায় না। ওদেরও তো মুক্তি দরকার।

—বসব না জেঠু। আপনাদের কাগজপত্র নিয়ে আমি কলকাতা যাব, তাই বলতে এলাম।

—তুমি তো অনেক করলে মা। আমার কাগজ সবই তপনের কাছে।

—দিয়েছেন সব।

—ওকেই দিও। এখানে তো...

—কতদিন লাগবে জানি না।

—আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। সবই ছেলেদের, তবে বাগানের জমিটা স্ত্রীর নামে রেখেছিলাম। জীবৎকালে ওঁর, মরে গেলে ছেলেদের। চল, বাইরে যাই।

বেরিয়ে আসেন উনি। বকুরও দমবন্ধ ভাবটা কেটে যায়।

—তা আমি থাকতেই যদি এই হাল হয়...আমার অবর্তমানে...বুনু আর তার সন্তানরা...তাই ঠিক করেছি একটা প্ল্যান...জীবৎকালেই যা পারি করি। পেনশানের টাকা পেলাম তো বাঁচলাম। কিন্তু পাওয়া অবধি বাঁচা দুষ্কর না!

—কি বলব বলুন!

—বুনুর জন্য ব্যবস্থা করিনি, এটাই...

—ওঁর স্বামীর সঙ্গে কেস করলে বুনুদি মাসোহারা পেত।

—এ বংশের মেয়ে আদালতে যাবে? আর ভাইরা তারপর ঢুকতে দিত?

বকুর মন বলে, আপনি বা কম দায়ী কিসে?

মুখ বলে, আসি জেঠু।

রজনীবাবু বকুকে দেখে চমকে যায়। আজ রুমা বাড়ি আছে, এমন দিনে এল?

রুমাই দৌড়ে আসে।

—তুমিই তো বকু। কত নাম শুনেছি, নাম শুনেছি...

—বৌভাতে এসেছিলাম।

—দিদির বিয়ে তো কলকাতায় সারলে তোমরা!

—ওরা নিজেরাই তাই করল। কোনো ঘটাপটা হয়নি। রেজেস্ট্রি, চা-জলখাবার।

—বৌভাত?

—আদিত্যদার মা-বাবা বড় ছেলের কাছে আমেরিকায় থাকেন। আদিত্যদা যা এখানে। আর সবাই বিদেশে।

—বাব্বা! তা গরিবের বাড়ি পদার্পণ?

—বউদি, এক কাপ চা খাব। জেঠুর সঙ্গে কথা বলব। ওঁদের পেনশানের ব্যাপারে আমিই দৌড়চ্ছি এখন!

রুমা পাকা অভিনেত্রী নয়।

—তা তোমাদের অবস্থা তো ভালো। মা পেনশান পান, সার্ভিসও করছেন। পেনশান না পেলে বা! অতবড় বাড়ি!

—তোমরা যে সার্ভিস কর, সার্ভিস বেনিফিট নেবে না রিটায়ার করলে?

—নিশ্চয়। সেটা আমাদের হক।

—এটাও বাবাদের হক।

রুমাক প্লাক করা ভুরু, অত্যন্ত বেঁটে জামা ও নাভির মধ্যে থলথলে চর্বি, নাইলনের শাড়ি, কায়দায় সামনে ছাঁটা চুল, পুরু ঠোঁটে মাংসল হাসি। দেখতে দেখতে মনে মনে জ্বলে যায় বকু। রজনী জেঠুকে ছেঁচে ছেঁচে শেষ করেছে এই মেয়েটি।

এদের কাজের মেয়ে মানী, বকুদের কাজের মেয়ে মীনা বাজারে কথা বলে। তাতেই বকু জানে, রজনী জেঠুকে ওরা খেতে দেয় না পেটভরে।

মুখে বলে, জেঠুর বয়স হয়েছে। উনি না থাকলে পেনশানটা নেবে কে ? কয়েক হাজার টাকা ! যে জন্য মাকে বলি, বাপীকে খাইয়েদাইয়ে ভাল রাখো। বাবার টাকাটা পেলেই...

—কি করবে ?

—অনেক প্ল্যান !

—শুধু চা খাবে, 'টা' নয় ?

—না বউদি, আরেকদিন আসব।

—মুখটা প্ল্যাস্টিক সার্জারি করালে না কেন ভাই ?

বকু বোঝে, একে গলাতেই হবে। নিশ্বাস ফেলে বলে, অনেক টাকাও লাগে...আর...আর...করালেও কি তোমার মতো বা দিদির মতো সুন্দরী হব ?

রুমা গলে যায়।

—তবুও...মেয়েছেলে তো...তাই বলছি।

—তুমিই ভাল আছ। কাজও করছ, সংসারও দেখছ।

—সব যে আমার ঘাড়ে। মামাকে আমি ছাড়া কে দেখবে বল ? যাই, চা পাঠিয়ে দিই।

মুখ বাড়িয়ে বলে, মামা, চা খাবেন ?

রজনীবাবু সবই শুনছিলেন।

বলেন, দাও একটু।

বকু রজনীবাবুর হাত ধরে বসায় চেয়ারে।

—আমি আপনাদের কাগজপত্র জেরক্স করে নিয়ে কলকাতা যাচ্ছি।

—তাই করো বকু।

বকু নিচু গলায় বলে, শরীর খারাপ ?

রজনীবাবু মাথা নাড়েন।

—কাগজ দেখে...রুমা খুব চটে গেছে...ওদের নাকি অপমান করা হয়েছে...এ কি অবস্থা আমার।

—ছেড়ে দিন। এই আপনার ফাইল...তপন জেঠুর কাছ থেকে আনলাম...জেরক্স করে...

—তপনকেই দিও। ওই সব সামলে রেখেছে বরাবর...

মানী চা নিয়ে আসে। সঙ্গে বিস্কুট আর একটি করে সন্দেশ।

—বউদি এনেছিল। খেয়ে নাও দাদু, আজ তো চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। নাও, আদা দিয়ে এনেছি।

রজনীবাবু নীরবে ক্ষুধার্তের মতো বিস্কুট ও সন্দেশ খান। বকু নিজের সন্দেশটাও তুলে দেয়।

—তুমি?

—খান।

চা খাওয়া হয়। বকুর খুব কষ্ট হয়, খুব। ঠিক এই স্তরের নিষ্ঠুরতা ও চোখে দেখেনি।

তারপর মানী চায়ের পেয়ালা নিয়ে চলে যায়। রুমা এসে ঢোকে। শাড়ি বদলেছে, কাঁধে ব্যাগ।

—বেরোচ্ছ বউদি?

—আজ তো ভাই অজিতদার মেয়ের সাধ, ওখানেই...

—এত বড় হয়ে গেল! কোন মেয়ে?

—যমজ মেয়ে তো। দিয়া তো ডাক্তারণী, ডাক্তারকে বিয়ে করে ব্যাঙ্গালোর চলে গেছে। এটা রিয়া। এজন্যেই ছুটি নিয়েছি।

—বেশ করেছ, চলো উঠি। আমার কাজের কথাও হয়ে গেছে। ভালো থাকুন জেঠু। পেনশান বেরোবেই।

—সাতাত্তর আর একানব্বইয়ের সরকারী কাগজ...

—সব নিয়েছি। চলো বউদি।

—চলো। টাইমে খেয়ে নেবেন মামা।

বেরিয়ে এসে ও রিকশা নেয়।

—চলো তোমায় নামিয়ে দিই।

—চলুন।

—পেনশানটা পেলে অবশ্য...এই রিকশা!

রিকশায় ওঠে ওরা। বকু বলে, পেলে মনে শান্তি পাবেন। ক'দিন বাঁচবেন!

—কত টাকা হবে?

—কম হবে না। সরকারী কর্মীদের সমান স্কেলে পাবেন তো! কম হবে কেন?

—অজিতদার কাছে গেছলে?

—এই তো যাব। কলকাতার কোন স্টেজে আছে দেখে এসে জানাব। কাজের মানুষ তো!

—হ্যাঁ, পারলে উনি পারবেন। আসছে বার এম. এল. এ হবেন। ওঃ, কি উন্নতি করেছেন! মেয়ের বিয়ে দিলেন পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে। মন্ত্রী রে, নেতা রে—সে কি ব্যাপার!

—এসে গেলাম বউদি। তুমিও একদিন এসো।

—আসব বই কি।

—বকু বাড়ি ঢুকে সুরঞ্জনকে বলে, বাপ রে বাপ! কি বজ্জাত ওই তাপসদার বউ! এই মীনা, এদিকে এস।

—কি ছোড়দি ?

—মানী যা বলবে, সব আমায় বলে যাবে। কিন্তু এখানে যা শুনবে মানীকে বলবে না। বললে মানীর বউদি ওই বুড়ো মানুষটাকে শিলে ছেঁচবে, বুঝেছ ?

—বুঝেছি। মানী তো তবু একটু খেতে দেয়।

সুরঞ্জন বলেন, থাক, আমি শুনতে চাই না।

—আমি বলতেও চাই না।

—তুই কি বলবি ? তপনদা—সন্তান থেকেও একাকী হয়ে গেছে।

—বেঁচে গেছে।

—কালীচরণবাবু একপাল কুসন্তানের জন্ম দিয়ে, মেয়ের ওপর অবিচার করে এখন পস্তাচ্ছে।

—উনি নিজেই তো সংস্কারের ডিপো।

—রজনীবাবু নিঃস্বার্থ হয়েছিলেন বলে বেঁধে মার খাচ্ছেন।

—ওঁকে খেতে দেওয়া হয় না।

—আর, আর তুই আরেকটা পরীক্ষায় বসার চিঠি পেয়েছিস।

বকু দৌড়ে চলে যায়। চেঁচিয়ে বলে, কলকাতা ! জেরক্স ! ডিরেক্টর অফ সোশ্যাল এডুকেশান ! পেনশান সেকশান ! কে বলে আমি কর্মহীন, বেকার ? শোনো !

—কি বলছিস ?

—ক্ষিতিদাকে বলবে, সংবর্ধনা দিক। তপন জেঠু আর রজনী জেঠুকে শাল দিক একটা, মানপত্র, আর তপন জেঠুর জন্যে বাংলায় বিজ্ঞান অভিধান কয়েকটা। উনি বাংলায় বিজ্ঞানের ক্রসওয়ার্ড করছেন। রজনী জেঠুকে, বাংলা পড়াতেন, বিবেকানন্দের রচনাবলী এক সেট। রজনী জেঠুর আত্মকথা ওরা 'দৃষ্টিপাত'-এ ছাপুক। উনি লিখতে না পারেন, ক্ষিতিদারা লিখে নিক। দুজনেই বাঁচার একটা ফিলিপ পাবেন।

—ফিলিপ ?

—প্রেরণা, প্রেরণা। তোমার সেকেলে ইংরিজিতে চলবে না বাবা।

—বকু ! বকু ! তুই না থাকলে...

—একদম সেন্টিমেন্ট দেখাবে না বাবা। আমি এ যুগের যুক্তিবাদী...যাকে বলে...নতুন প্রজন্ম।

—বুঝেছি। তা আজ যাবি, না কাল ?

—অবশ্যই কাল।

৭

জেরক্স করানো হয়ে যায়।

সুরঞ্জনকে দেখাবার অ্যাপয়েন্টমেন্টও ঠিক হয়ে যায়।

রজনীবাবুকে অত্যন্ত অবাক করে এক বাক্স সন্দেশ ও ফুল নিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে আসে চিরঞ্জিত ঘোষদস্তিদার, সঙ্গে আদিত্য, বকু ও সুরঞ্জন।

এরকম হোমরাচোমরা গাড়ি আর হোমরাচোমরা মানুষ নামতে রজনীবাবুর মনে হয় স্বপ্ন দেখছেন। অতি ক্ষীণ গলায় বলেন, কে?

—আপনি আমার ছোটকাকা। আমার বাবা রমণীকান্ত ঘোষদস্তিদার। কোনো যোগাযোগ তো আমরা দেখিনি, শেষে আদিত্য আমাদের কাগজেই লেখে। বলব কাকে? আপনার কথা আমার মার কাছে শুনেছি, নাম নিয়ে গর্ব করি। কিন্তু...

—তুমি মেজদার ছেলে! দাদা, মেজদা, সেজদা, তাঁদের স্ত্রীরা...

—কেউই নেই।

—আমার মায়ের মৃত্যুতে শেষ দেখা। সেও...

—কেমন আছেন বলুন?

—এই তো দেখছ...ইনিও লিখলেন...আর এই মেয়ের এত চেষ্টা...পেনশানটা দরকার।

—ছোটকাকা, আমি তো নিঃসন্তান। স্ত্রী আছে। যা অতীত তা অতীত। যদি কিছু করতে পারি...

—তোমার নাম কি?

—চিরঞ্জিত।

—চিরঞ্জিত, বললে যে এটাই যথেষ্ট। অর্থ আমি চাই না বাবা। পেনশান, যা আমার প্রাপ্য, সেটুকু পেলেই যথেষ্ট হবে এ বয়সে।

—নিশ্চয় পাবেন। আদিত্য, রাজ্যসরকার এঁদের সঙ্গে সব রাজ্যকর্মচারীকে আরেকটা ডি. এ. ডিক্লেয়ার করছে শীঘ্রই। সেটা লিখো, সেই সঙ্গে এগুলো আবার মেনশান করো।

—করব।

—কাকা, ইশ্! সাচ এ লস্ট চাইল্ডহুড...আমার একজন কাকা আছেন...

—জীবিত কি মৃত, জানতে না। তোমার দোষ কি বাবা! আমিও তো কোনো সম্পর্ক রাখিনি। অতীত ভুলে যাও।

—এখানে কে থাকেন?

—যে বিধবা পিসতুত বোনের ভার নিই, তার দুই ছেলেকে লেখাপড়া শেখালাম, এক ছেলে থাকে বউ নিয়ে।

মানী মুখ বাড়িয়ে বলে, চা করব সবার জন্যে, অ দাদু?

চিরঞ্জিত বলে, না না, অ্যাকচুয়েলি আমরা কেষ্টনগর যাব। বসবও না এখন। কাকা, আবার আসব, কার্ড রেখে গেলাম! যে কোনো দরকারে...ডাক্তার দেখাতে...

বকু বলে, আমি নিয়ে যাব, ভাববেন না।

—মা বলেছিল...আপনার খুব চেহারা ছিল...

—বার্ধক্য বাবা! তোমার মা খুব নরম মানুষ ছিল...আমার জন্য তো পুলিশের উৎপাত...

—আসি কাকা।

—এসো বাবা। ভাল থাকো। বউমাকে এনো।

বকু মানীকে বলে আসে, মানীদি, সন্দেশ তুমিও খেও অবিশ্যি। দাদুকেও দিও। তুমি ছাড়া...

মানী বলে, ভেবো না দিদি। এখনি খাইয়ে দেব চারটে। ভাত কত ক'টা খেল বউদি তো খোঁজ নেয় না। তুমি ভেবো না। বাপ রে, অত বড় অফিসার দাদুর ভাইপো? তোমরা এসো।

ওই গাড়ি চেপে হোমরাচোমরা ভাইপো এসেছিল, খবরে টাউনও চমকিত, রুমাও।

রুমা কার্ড দেখে বলে, বাপ রে!

মানীকে বলে, তুই বাপু ওঁর খাওয়াদাওয়ার যত্ন করিস। শুনছি আবার আসবে। দেখে যেন...

—আমি হলাম ঝি! তুমি "হ্যাঁ" বললেই করতে পারি। আর...দাদু খেতেও তো পারে।

রজনীবাবুর ভাগ্য কিছু প্রসন্ন হয়। টাউন থেকেও লোকজন আসে, স্কুলের বর্তমান শিক্ষকরা দু'একজন।

ক্ষিতি সংবর্ধনা নিতে ওঁদের রাজী করায়। সংবর্ধনার আয়োজন হতে থাকে।

বকু ভীষণ খুশি, ভীষণ খুশি।

সৌতিকে বলে, বাবাকে চোখটা দেখিয়ে আনব, তারপর সংবর্ধনা হবে।

—আমিও খুশি।

—আর এরপর আপাতত পেনশান পারস্যু করা ছাড়া আমার কিছু করার নেই।

—আছে।

—কি?

—আমাদের রেজেস্ট্রিটা করতে হবে। নইলে...

—নইলে কি?

ট্রেনেই সৌতি বেশ জোরে বলে, আমি আত্মহত্যা করব।

—চুপ কর। কেষ্টনগর এসে গেছে।

নেমে পড়ে ওরা। বকু বলে, তুই সিরিয়াসলি বলছিস না সৌতি!

—আমি ডেড সিরিয়াস।

—কিন্তু...

—আকাশ থেকে পড়িস না। দু'বছর জপ করে যাচ্ছি।

—তা করেছিস...কিন্তু মুখ দেখেছিস?

—মুখটা ওরকমই থাকবে! তোরই কোনো কমপ্লেক্স নেই, আমার বয়ে গেল।

—এখনি?

—তুই কি বিবাহবিরোধী?

—না তো।

—তাহলে তো...

—বেশ তো। সংবর্ধনাটা হয়ে যেতে দে।

—মেসোমশাই তো যাবেন আর আসবেন।

—হ্যাঁ, তারপর সংবর্ধনা...

সুরঞ্জনের চোখ দেখে ডাক্তার মুখার্জি ভরসা দেন, তিনিই পারবেন। ব্যাপারটা তেমন জটিল নয়। হায়দ্রাবাদ যাওয়া বা না-যাওয়া সুরঞ্জনের বিবেচনাধীন।

সুরঞ্জন বলেন, এখানেই হোক।

নমু বলে, বাবাঃ, মস্ত মাথাব্যথা গেল।

আদিত্য বলল, ডাক্তার মুখার্জি এতই ভালো, উনি যখন বলছেন...

—ইয়েস আদিত্য, এখানেই হবে।

বকু বলে, সেজন্যে দেরি করা যাবে না বাবা। পেনশানের জেদ ধরে বসে থেকো না।

—হ্যাঁ, উনিই তো বলছেন দেরি, করা যাবে না।

—আর বাবা!

—কি, বকু?

বকু শক্ত হয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে বলে, সৌতি বলছে এখন আমাকে বিয়ে করবে।

—তুই...তুই কি বলেছিস?

—আমিও হ্যাঁ বলেছি। ভীষণ, ভীষণ জেদী। দু'বছর ধরে একই কথা বলছে।

নমু ও আদিত্য এ-ওর দিকে তাকায়।

সুরঞ্জন বলেন, বাট দিস ইজ গ্রেট নিউজ!

—বাবা!

—তুই কাঁদছিস?

চোখ মোছে বকু। বলে, টেনশান।

—নমু আদিত্য, সৌতি হলো...

—দিদিরা জানে। ওকে দেখেছে।

—আমি তো আজ দেখলাম।

নমু বলে, মা সংবর্ধনার দিন দেখবে।

—হ্যাঁ, সংবর্ধনাটা তো চারদিন বাদেই।

সংবর্ধনা খুব ভালভাবে হয়ে যায়।

রজনীবাবু আবেগভরে বলেন, বহুদিন কর্মহীন হয়ে আছি, তা স্মৃতিকথা লিখেছি কিছু কিছু। এখন থাকা...

তপনবাবুর বক্তব্যও চমৎকার হয়। বলেন, আমি একটা স্বপ্ন দেখতাম, বিজ্ঞান চেতনা ছড়াবে। সে এবারের প্রজন্ম সফল করেছে। দূর পল্লীতেও যখন বিজ্ঞান চেতনা

ছড়াবে, তখন সমাজ-সংস্কার-দূষণ কমবে।

আমন্ত্রিত বক্তা অজিতবাবু সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন, বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের পেনশান সরকারী কর্মীদের সমান করে মহৎ দৃষ্টান্ত রেখেছেন—এ কথা বলেন এবং এঁরা সম্মানজনক পেনশান পাচ্ছেন না, তাতে দুঃখপ্রকাশ করেন।

আরো বক্তব্য, আরো বক্তব্য।

ক্ষিতির বুক দশ হাত হয়। 'দৃষ্টিপাত' একটা সম্মানজনক কাজ করেছে, এতে সে উৎফুল্ল।

বিলি হয় মিষ্টান্নের প্যাকেট।

সংবর্ধনা শেষ হয়।

সুরঞ্জন সৌতি ও বকুকে নিয়ে এগিয়ে যান।

—তপনদা! এ সৌতি, গৌতমের ভাই। বকুকে বিয়ে করছে। আপনি ওদের আশীর্বাদ করুন।

তপনবাবু শাল বই ও ফুল একজনের হাতে দেন। ওরা প্রণাম করছে ওঁকে।

—সৌতি বকুকে বিয়ে করছে...গৌতমের ভাই...সুরঞ্জন, আমি যে কি আনন্দ পেলাম...কি আনন্দ পেলাম...বকু।

ওদের মাথায় হাত রাখেন।

—সুখী হও, সুখী হও। সুখী হও।

বকু ওঁর কানে কানে বলে, চোখ মুছুন জেঠু। পেনশান-সংগ্রাম কিন্তু চলবে।

—তোমরা আমার বাড়ি এসো মা।

—এবার বিজ্ঞান শব্দছক লিখুন। ছাপা হবে।

—নিশ্চয়।

বড় আনন্দে সন্ধ্যা শেষ হয়। কালীচরণবাবু নিঃশব্দে ঢুকেছিলেন, নিঃশব্দেই বেরিয়ে যান।

আজ তাপস, রুমা ও মানী সগর্বে রজনীবাবুকে নিয়ে বেরোয়। মানী রজনীবাবুর পাশে বসে বলে, ওরাও বুঝেছে। এখন থেকে আর ট্যাঁ-ফোঁ করবে না।

—শালটা বেশ গরম রে!

—গায়ে দেবে, গায়ে দেবে। ভোগ করে নাও দাদু।

—এখন তো কাজও হলো একটা।

—বই লিখবে?

—নিশ্চয়। কালই ক্ষিতি আসবে।

আর শিপ্রা সৌতিকে দেখে বারবার নিশ্বাস ফেলেন। সাধারণ উচ্চতা, রোগাটে, শক্ত শরীর। মুখে-চোখে দায়িত্ববোধ ও অভিজ্ঞতার ছাপ।

—খুব, খুব দুশ্চিন্তা ছিল বকুকে নিয়ে।

—বলেছিলাম না, চিন্তা করো না।

—আমাকে বলিসনি।

—তুই তো জানতিস।

—দাদা খুব খুশি হবে।

নমু বলে, আমরাও খুশি সৌতি। আমি চাইনিজ ফুড এনেছি, আজ থাকছি, তুমি খেয়ে যাবে।

—রাত হয়ে যাবে।

—থেকে যাও। রাত করে ফিরো না।

—আপনি মেসোমশাইদের নিয়ে যাবেন?

—তাই তো গাড়ি এনেছি। অপারেশান হবে, ইনট্রা-অকিউলার লেন্‌স বসাবেন, নির্ঝঞ্ঝাট।

সুরঞ্জন বলেন, খরচ হবে!

বকু ধমক দেয়, হোক।

—তোর বিয়ে?

—রেজেস্ট্রি। মাংস-ভাত, ব্যস।

শিপ্রা বলেন, সবাই বলবে নিখরচায় দু'টো মেয়ে পার করল!

—বলুক। আমি কোনো রংতামাশায় নেই।

নমু বলে, কে পথ দেখাল, বল্?

—তুই, আবার কে?

সবাই হাসেন। বড় আনন্দময় সন্ধ্যা।

অপারেশান খুবই সফল।

সুরঞ্জন নমুর বাড়ি অন্য ঘরে।

সৌতি ঢোকে, সঙ্গে ক্ষিতি।

—বকু, বাইরে আয়।

শিপ্রা বলেন, কি হলো?

—কিচ্ছু না। কলকাতা এসেছিলাম, বকুকে একটা কথা বলে যাব।

ওরা বেরিয়ে আসে।

ক্ষিতি বলে, আজ সকালে জানা গেল, কাল কালীচরণবাবু বউ-মেয়ে-নাতি-নাতনী সকলকে বিষ দিয়েছেন রসগোল্লার সঙ্গে, নিজেও খেয়েছেন।

—সে কি! তারপর?

—সবাই মারা গেছেন।

—কিন্তু কেন?

—উনি কি জমি বেচতে গিছলেন, স্ত্রীর জমি, টাকা পেলে ওদের নিয়ে চলে যাবেন। জানতে পেরে ছেলেরা আর বউরা অকথ্য গালাগালি করে, বুনুকে বুঝি ঘের করে দেবে বলে। তার ফলে এই অবস্থা। চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন, পকেটে

ছিল, পাওয়া গেছে।

—ভাবতে পারছি না।

—সারকে বলিস না। ওঁর অপারেশান হয়েছে।

—না, বলব না।

—আমি [illegible]। খবরের কাগজে বেরোবে, সাবধান।

বকু তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে।

—সেদিন বলতে গিয়েও বললেন না জেঠু। কি হবে সৌতি?

—কি হবে! তিনটে ফাইলের দায়িত্ব নিয়েছি আমরা, যদি সফল হই, কত শিক্ষক বেঁচে যাবেন সেটা ভাব!

—হ্যাঁ। কিন্তু সৌতি, পেনশানটা ওরা দিত যদি, দিত যদি, তাহলে...

—দেয় না রে বকু, আদায় করতে হয়।

—পেনশান পেলে তো জেঠু মরত না!

—কাঁদিস না।

তবু বকু কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, এবার দেখি তো, কেমন করে না দেয়! আমি...

কি করবে সেটা বলে না।

—ওরাই তো ওঁকে খুন করল। আমি...

—চুপ। ঘরে চল্।

ওরা ঘরে ঢুকে যায়। সৌতি বলে, তপন জেঠুকে বলেছিলি, সংগ্রামটা চলবে। বলিসনি?

—হ্যাঁ, চলবে।